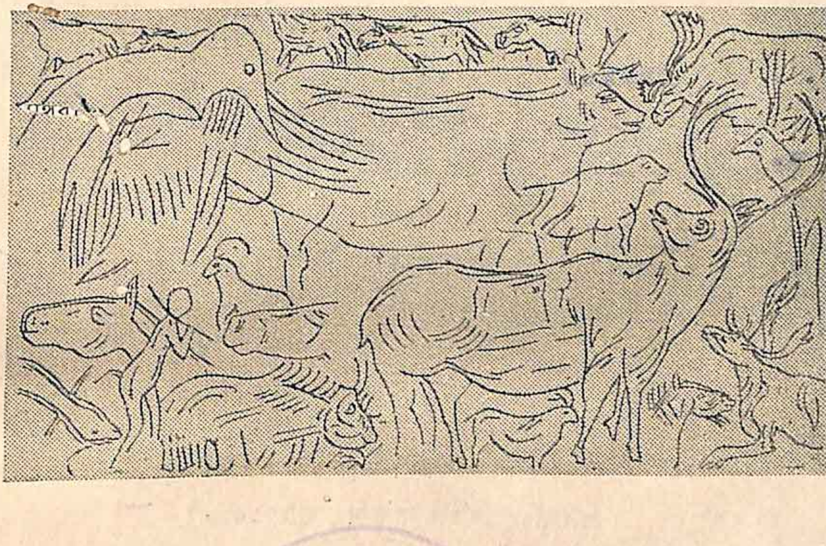
পৃথিবীর ঠিকানা

পৃথিবীর ঠিকানা

অমল দাশগুপ্ত



নতুন সাহিত্য ভবন কলিকাতা-২০

প্রকাশক
স্থশীলকুমার সিংহ
নতুন সাহিত্য ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-২০
মুদ্রক
দ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস
দি ইণ্ডিয়ান ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং (প্রাইভেট্) লিঃ
২৮ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

নক্‌শা
অমূল্য দাস
বেণু লাহিড়ী
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৩
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৯

দাম পাঁচ টাকা

—এই লেখকের—

মহাকাশের ঠিকানা
মানুষের ঠিকানা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সুহৃদ্বরেষু

সূচীপত্র

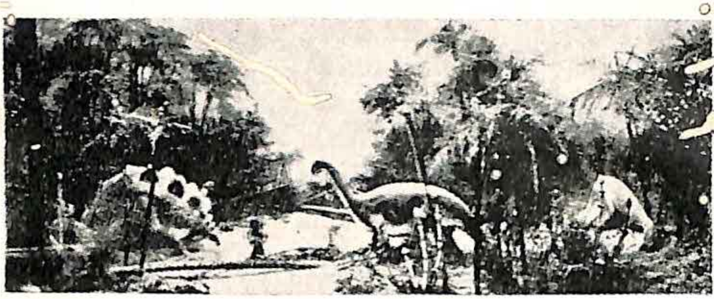
[পরিচ্ছেদের শীর্ষে উদ্ধৃত সমস্ত কবিতা রবীন্দ্রনাথের]

গ্রন্থপঞ্জী

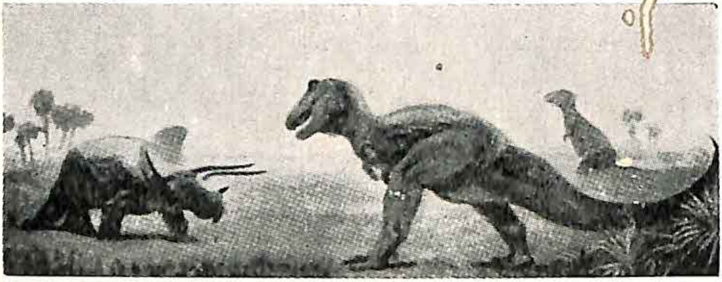
1. The Creation of the Universe—George Gamow.
2. The Universe—A. Oparin and V. Fesenkov.
3. A Theory of Earth's Origin—O. Schmidt.
4. The Origin of the Earth and Planets—Boris Levin.
5. The Modern Universe—Raymond A. Lyttleton.
6. Biography of the Earth—George Gamow.
7. The Crust of the Earth—Edited by Samuel Rappo and Helen Wright.
8. The Origin of the Earth—W. M. Smart.
9. Fundamentals of Geology—V. Obruchev.
10. The Origin of Life—A. I. Oparin.
11. Man in Search of his Ancestors—Andre Senet.

ভ্রম-সংশোধন

মুদ্রণপ্রমাদবশত পুস্তকের ১ থেকে ৩৮ পর্যন্ত পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠাসংখ্যা মুদ্রিত হয়েছে যথাক্রমে ৯ থেকে ৫৬। সূচীপত্রে ৫৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পুস্তকে মুদ্রিত সংখ্যাই নির্দিষ্ট হয়েছে।



মধ্যজীবীয় যুগের অরণ্যচারী তিনটি সরীসৃপ। বাঁ-দিকে স্টেগোসরাস (শিরদাঁড়া বরাবর মজবুত বর্মসাজ), মধ্যে ব্রণ্টোসরাস (ওজনে ৫০ টন, লম্বায় ১০০ ফিট), ডান-দিকে ডিপ্লোডোকাস।



মধ্যজীবীয় যুগের দুটি হিংস্র সরীসৃপ। বাঁ-দিকে ধারালো শিংযুক্ত ট্রাইসেরাটপ্‌স ; ডান-দিকে মধ্যজীবীয় যুগের আতঙ্ক টাইরানোসরাস।



মধ্যজীবীয় যুগের জলাশ্রয়ী সরীসৃপ। বাঁ-দিকে রাজহাঁসের মত লম্বা গলা-ওলা প্লেসিওসরাস ; ডান-দিকে জল থেকে লাফিয়ে-ওঠা অবস্থায় কিম্ভূত মাছের মত ইক্‌থিওসরাস।



সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যুষে

স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্যনবীনা
অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞহুতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যাগণনার-অতীত প্রত্যুষে,—
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থলুপ্ত অবশেষ,—
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্জিত সৃষ্টি

বিপুল মহাবিশ্বে আমাদের এই পৃথিবী নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের গ্রহ, আমাদের এই সূর্য নিতান্তই একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্র আর চন্দ্র এই পৃথিবীর একটি উপগ্রহ মাত্র। কিন্তু তবুও এই পৃথিবী এই সূর্য আর এই চন্দ্র মানুষের কাছে চিরকালের বিস্ময়। তবে এই বিস্ময় মানুষকে যেমন অভিভূত করেছে, তেমনি অনুসন্ধিৎসু। সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জানতে চেষ্টা করেছে—কি ভাবে পৃথিবীর জন্ম আর কি-কি রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর এই বর্তমান রূপ। আর পৃথিবীকে জানতে গিয়ে মানুষের এই উপলব্ধিও হয়েছে যে মহাকাশে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। পৃথিবীকে জানতে হলে সৌরজগতকে জানা চাই, সৌরজগতকে জানতে হলে নক্ষত্রজগতকে। আর তাই মানুষ একদিকে যেমন কোটি কোটি যোজন দূরের নক্ষত্রকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনি খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছে এই পৃথিবীর

খবর। অবশ্য এখনো পর্যন্ত বিশ্বরহস্যের সবটুকুই জানা হয়ে যায়নি। তবু যে-মানুষ মহাকাশ জয় করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে তার কাছে বিশ্বরহস্যও যে অজানা থাকবে না তা নিশ্চয়তার সঙ্গেই বলা চলে।

সূর্য বা নক্ষত্র তো অনেক দূরের বস্তু। ভাবলে অবাক হতে হয়, আমাদের এই অতি-কাছের পৃথিবীও আমাদের কাছে এখনো কতখানি অজানা! আজো পর্যন্ত আমরা জোর করে বলতে পারি না যে পৃথিবীর সবযুগের ইতিহাস আমরা পুরোপুরি জানতে পেরেছি, না পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, মাটি-পাথর, আকাশ-বাতাসের কোনো খবরই আমাদের জানতে বাকি নেই।

ভাবলে অবাক হতে হয়, আমাদের পায়ের তলার মাটি কী ভাবে ইতিহাসকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছে, আমাদের মাথার ওপরকার বায়ুমণ্ডল মায়ের আঁচলের মতো আমাদের সকলকে কী স্নেহ ও মমতার আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের চোখের সামনেকার সমুদ্র-মহাদেশ কী বিপুল ভাঙাগড়ার সাক্ষ্য বহন করছে! যে বিচিত্র জীবজগৎ পৃথিবীর মাটি-জল-বাতাস থেকে খাদ্য আহরণ করে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, তাদের খবরই বা আমরা কতটুকু রাখি!

পৃথিবীর ঠিকানা জানতে হলে সবচেয়ে প্রথমেই যে জিনিসটি সম্পর্কে ধারণা করতে হবে তা হচ্ছে সময়ের বিপুলতা। মাটি আর পাথরের স্তরে স্তরে এই পৃথিবীর ইতিহাস লেখা হতে সময় লেগেছে অবিশ্বাস্য রকমের দীর্ঘ। আমাদের নিজেদের জীবন, আমাদের চলাফেরা সে তুলনায় নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী।

কতটুকু আমাদের জীবনের পরিধি? মনে আছে যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন শেষ পিরিয়ডের আধঘণ্টা সময় যেন আর কিছুতেই কাটতে চাইত না। এখনো ছুটির দিনে কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগ ঘটলে ট্রেন ছাড়বার আধঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছে বাকি সময়টুকুকে কী দীর্ঘ মনে হয়! আমাদের কাছে গোটা

জীবনটাই কতগুলো ঘণ্টা আর মিনিটের সমষ্টি মাত্র—তার চেয়ে বড়ো করে আমরা ভাবি না, ভাবার কোনো দরকারও নেই। আমাদের এই নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর জীবনের মাপের সঙ্গে ঘণ্টা আর মিনিট, মিটার আর গ্রাম বেশ খাপ খেয়ে গেছে। আমাদের রোজকার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম এই ছোট ছোট মাপ দিয়েই বেশ চালিয়ে নেওয়া যায়। এমন কি একটা গোটা দেশের ইতিহাসকেও আমরা এই মাপ দিয়েই বুঝে নিতে চেষ্টা করি।

আর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের জীবনটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো মাপ। আর তাই একশো বছর সম্পর্কে একটা ধারণা করাও আমাদের অনেকের পক্ষেই বেশ শক্ত। আর যে-ছ-সাত হাজার বছরের ইতিহাস মানুষ লিখে রেখেছে—তার কথা যদি ভাবতে বসি? মনে হয় যেন সেই কত কত যুগ আগেকার কথা! যে যুগে মিশরের পিরামিড তৈরি হয়েছিল, তৈরি হয়েছিল মাহেনজোদারোর ও হরপ্পার আশ্চর্য সুন্দর শহর—আমাদের কাছে তা এক সুদূর অতীতের ব্যাপার। তার আগের কোনো কথা ভাবতে বসলে আমরা থই পাই না।

কিন্তু কোটি কোটি বছরের কথা যদি আমাদের ভাবতে হয়—তাহলে? ছ-সাত হাজার বছরের কথা ভাবতে যাওয়াটাই যেখানে আমাদের কাছে কষ্ট-কল্পনা সেখানে কোটি কোটি বছর সম্পর্কে কোনো রকম ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি?

পৃথিবীর ঠিকানা জানতে হলে সবচেয়ে বড়ো বাধা আসে এই সময় সম্পর্কে ধারণা করা নিয়ে। এক বা দু-বছর নয়, একশো বা হাজার বছর নয়—কোটি কোটি বছর! একশো সংখ্যাটি দশ বার ঘুরে এলে পাওয়া যায় হাজার, হাজার একশো বার ঘুরলে লক্ষ, লক্ষ একশো বার ঘুরলে কোটি—এমনি কোটি কোটি বছর! সাধারণ জীবনে এমন কোনো ঘটনা নেই যার সঙ্গে এই বিপুল পরিমাণ সময়ের তুলনা দেওয়া চলে। সুতরাং শুধু কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবুও একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে করা যাক, একজন মানুষ

এত ছোট যে এক ইঞ্চি দূরত্ব পার হতে তাকে ষোলবার পা ফেলতে হয়। আর মনে করা যাক, প্রতি বছরে সে এক-পা করে এগিয়েছে। তাইলে এই মানুষটির পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বোম্বাই পৌঁছতে কয়েক-শো কোটি বছর সময় লাগবে।

এই দৃষ্টান্ত থেকে আর একটি ব্যাপারও স্পষ্ট হচ্ছে। যে-মানুষ সারা বছরে এক ইঞ্চির ষোল ভাগের একভাগ মাত্র অতিক্রম করে—অর্থাৎ আমরা সাদা চোখে যেটাকে চলা বলেই মনে করি না—সেই মানুষের পক্ষেও পায়ে হেঁটে কলকাতা থেকে বোম্বাই যাওয়া সম্ভব। অবশ্য কয়েক-শো কোটি বছর সময় লাগছে; তা লাগুক, কিন্তু ঘটনাটি যে ঘটছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

পৃথিবীর ঠিকানা জানতে হলে এই দুটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। প্রথম, সময়ের বিপুল পরিধি। দ্বিতীয়, অবিশ্বাস্য রকমের ধীরে ধীরে হলেও বিপুল এক পরিবর্তন। আমাদের সেই ক্ষুদে মানুষটির চলার বেগ নিয়ে হিমালয় যদি ওঠানামা করতে শুরু করে —তা হলে কয়েক-শো কোটি বছরের মধ্যে হিমালয়ের মতো পর্বতও অন্তত দেড়শো বার সমুদ্রের তলায় ডুবে যাবে, দেড়শো বার আকাশে মাথা তুলবে!

অবশ্য পৃথিবীর জন্মের পর থেকে ঠিক এই হিমালয়ই যে দেড়শো বার মাথা তুলেছে আর দেড়শো বার ডুব দিয়েছে—ব্যাপারটা তা হয়নি। তবে একথা জেনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর বয়সের তুলনায় আমাদের এই হিমালয় নিতান্তই অর্বাচীন। হিমালয়ের সৃষ্টি পৃথিবীর ইতিহাসে একেবারেই সাম্প্রতিক ঘটনা। এবং এই হিমালয়ও একদিন রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমনি ধরনের ঘটনা একবার দু-বার নয়—বহু-বারই ঘটেছে। এই পৃথিবী কখনো হয়ে উঠেছে একেবারেই সমতল, কখনো পর্বতে-উপত্যকায় উঁচুনিচু। উপমা দিয়ে বলা চলে, কখনো বিধবার মতো নিরাভরণা, কখনো নববধূর মতো সালংকারা। কয়েক-শো কোটি বছরের ইতিহাসে এই পৃথিবীর জমি অধিকাংশ

সময়েই ছিল সমতল, পৃথিবীর সমুদ্র ছিল অগভীর। কিন্তু এই অবস্থা কখনো একটানা চলেনি। কয়েক লক্ষ বছর পরে পরে দেখা দিয়েছে অপরূপ অলংকারের মতো আকাশছোঁয়া পর্বত, দুরন্ত নদী আর গভীর সমুদ্র। মনে হতে পারে, এই পৃথিবীর মাটি আর সমুদ্রে জরা আর যৌবনের অবিরাম লড়াই চলে এসেছে, কেউ কাউকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারেনি—মাঝে মাঝে জরা কায়েম হয়ে বসেছে, মাঝে মাঝে যৌবন।

এমন কি আজকের পৃথিবীর এই পাঁচটি মহাদেশও কতভাবে যে জায়গা বদল করেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। এককালে হয়তো এই পাঁচটি মহাদেশ পাঁচ ভাইয়ের মতো হাত ধরাধরি করে ছিল। একটু একটু করে হাত থেকে হাত খসে পড়েছে। একটু একটু করে ভাইয়ে ভাইয়ে ব্যবধান বেড়েছে। ভবিষ্যতে আবার কোনোদিন ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন হবে কিনা—সে কথাও জোর করে বলা সম্ভব নয়।

এককালে আমাদের এই পৃথিবীতে দু-ঘণ্টা পরে-পরে দিন-রাত্রির আবর্তন চলত। মাত্র চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পুরো একটা পাক খাওয়া হয়ে যেত পৃথিবীর। তখন চন্দ্র ছিল পৃথিবী থেকে মাত্র আট হাজার মাইল দূরে। তারপর কয়েক-শো কোটি বছরের মধ্যে পৃথিবীর দিন-রাত্রি একটু একটু করে বিলম্বিত হয়েছে। একটু একটু করে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল দূরে সরে গেছে চন্দ্র। এখনো যাচ্ছে। এবং আজ থেকে দু-হাজার বা তিন-হাজার কোটি বছর পরে আরো প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরে যাবে। তখন পৃথিবীর একটি দিনের মাপ হবে এখনকার সাতচল্লিশটি দিনের সমান। আর সেই একই সময়ের মধ্যে চন্দ্র একবার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তাকিয়ে মনে হবে, চন্দ্র আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে, তার উদয়ও নেই, অস্তও নেই, এবং পৃথিবীর অর্ধাংশের মানুষের কাছে চন্দ্রের কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

এখানেই শেষ নয়। বিশ্বজগতে শেষ বলে কিছু নেই। যেখানে শেষ, সেখানেই আবার নতুন করে শুরু। পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরে যাবার পরে চন্দ্র আবার একটু একটু করে কাছে সরে আসবে। আজকের দিনের চেয়েও কাছে। অনেক অনেক কাছে। শেষ পর্যন্ত এমন এক বিপজ্জনক সীমানায় এসে পৌঁছবে যখন পৃথিবীর প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণের টানে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে আমাদের এতদিনের পরিচিত এই চন্দ্র। তারপর থেকে, শনিগ্রহের চারপাশে যেমন একটি বলয় আছে, তেমনি একটি বলয় পৃথিবীর চারপাশেও পাক খেয়ে চলবে।

এখানেও শেষ নয়। এই শেষের পরেও আবার শুরু আছে।

এই অমোঘ ও অনিবার্য পরিণতির দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের এই পৃথিবী ও চন্দ্র। অথচ, ভাবলে অবাক হতে হয়, পৃথিবী ও চন্দ্রের চলাটা কী অবিশ্বাস্য রকমের ধীর, কী কল্পনাতীত রকমের শ্লথ। প্রতি বছরে চন্দ্র মাত্র পাঁচ ইঞ্চি দূরে সরে যাচ্ছে! প্রতি এক লক্ষ কুড়ি-হাজার বছরে পৃথিবীর দিন মাত্র এক-সেকেণ্ড বড়ো হচ্ছে!

মনে হয়, কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর এই পরিবর্তন! কিন্তু তবুও শেষ পর্যন্ত তা কী বিরাট. কী বিপুল!

এই বিপুল মহাবিশ্বের সর্বত্রই এমনি পরিবর্তন, এমনি রূপান্তর। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর ধরে এই পরিবর্তন ও রূপান্তরের প্রক্রিয়া একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিণতি লাভ করে।

সে-তুলনায় মানুষের জীবন এত ক্ষণস্থায়ী যে একটা-দুটো জীবনে এই পরিবর্তনের কোনো সাক্ষ্যই আমাদের চোখে পড়ে না।

আমাদের পায়ের তলার পৃথিবীও কতভাবেই না বদলেছে! কিন্তু তবুও আমাদের কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে পৃথিবীর আজকের দিনের এই বিশেষ রূপ চিরকালের নয়। আমাদের ধারণা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা পৃথিবীকে এই বিশেষ রূপেই দেখেছে, আমরাও তাই দেখেছি, আমাদের উত্তর-পুরুষরাও তাই দেখবে।

পৃথিবীর আকাশে বাতাসে এমনি ঋতুপরিবতনের খেলা চলবে, হিমালয়ের চুড়ো এমনি বরফের মুকুট মাথায় দিয়ে সূর্যের আলোয় ঝিমমিক করবে, গৈরিকবর্ণা নদী এমনি উচ্ছল আবেগে নেমে আসবে সমতল জমিতে। আজকের পৃথিবী যা, আগামী কালের পৃথিবীও তাই। এ ছাড়া অন্য কিছু আমরা ভাবতে পারি না।

কিন্তু মানুষের কাছে আজ ও আগামী কালের ব্যবধান যতো ছোট—পৃথিবীর কাছে তা নয়।

পৃথিবীতে অতি ছোটখাটো পরিবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতেও সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বছর। মানুষের জীবনে যা একটা দিন—পৃথিবীর ইতিহাসে তা লক্ষ বছর।

এমন কি, প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে মানুষের যে গৌরববোধ—তাও খানিকটা যেন ম্লান হয়ে পড়ে যদি ভাবা যায় যে পৃথিবীর সমগ্র ইতিহাসের কাছে মানুষের ইতিহাস নিতান্তই অর্বাচীন। পৃথিবীর জন্মের পরে কোটি-কোটি বছর কেটেছে যখন এই পৃথিবীর কোথাও উদ্ভিদ বা প্রাণের চিহ্নমাত্র ছিল না। তারপরে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজম-এর একটি আণুবীক্ষণিক বিন্দু লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বিবর্তিত হবার পরে আজকের দিনের চোখ দিয়ে চেনবার মতো কোনো একটি প্রাণীর অবয়ব ধারণ করতে পেরেছিল। মানুষ এসেছে অনেক পরে। অনেক অনেক পরে।

একটা ছোট উপমা দিলে কথাটা পরিষ্কার হতে পারে। আমরা জানি, ঘড়ির মিনিটের কাঁটা পুরো এক পাক ঘুরে এলে ৬০ মিনিট। কল্পনা করতে হবে, এই ৬০ মিনিট সময় ৩০ কোটি বছরের সমান। অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটা প্রতি মিনিটে ৫০ লক্ষ বছর পার হচ্ছে।

কথাগুলো যতো সহজে বলা গেল, ততো সহজে কল্পনা করা চলে না। এক-একটি মিনিট পঞ্চাশ লক্ষ বছরের সমান! প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ কোটি বছর! অর্থাৎ আধুনিক মানুষের ইতিহাস এই ঘড়ির কাঁটায় একেবারে এই মুহূর্তের ঘটনা। সিন্ধু সভ্যতা বা মিশর সভ্যতার যুগ থেকে এই বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের কাছে এক

সুদীর্ঘ কাল কিন্তু এই ঘড়ির কাঁটায় এক সেকেণ্ডেরও ভগ্নাংশ। এই ঘড়ির হিসেবে এক সেকেণ্ড আগের যুগের মানুষও বন্য বর্বর জীবন যাপন করেছে।

এবার কল্পনা করা যাক এই ঘড়ির রাত ঠিক বারোটার সময় পৃথিবীর জন্ম হল। পৃথিবী তখন একটি আবর্তমান বস্তুপিণ্ড। কোথাও প্রাণের চিহ্ন নেই। তারপর পৃথিবী ক্রমে তরল হয়েছে, ক্রমে জমাট বেঁধেছে। তৈরি হয়েছে পৃথিবীর আদিম সমুদ্র। কিন্তু তখনো প্রাণের উৎপত্তি হয়নি। সেই শুভ মুহূর্তটির জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে ভোর ছ-টা পর্যন্ত। সেই সময়েই পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রে কতকগুলো আণুবীক্ষণিক বিন্দুকে আশ্রয় করে প্রাণের জন্ম। তারপরে প্রথম শিরদাঁড়াওলা প্রাণীর জন্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সকাল পৌনে নটা পর্যন্ত। সকাল নটার সময়ে উভচর প্রাণীরা জল থেকে ডাঙায় উঠে এসেছে। ৯টা ৮ মিনিটে সরীসৃপের জন্ম, ৯টা ২৩ মিনিটে ডাইনোসরের, ৯টা ২৫ মিনিটে স্তন্যপায়ী, ৯টা ৩৩ মিনিটে পাখি।

আর মানুষ ?

মানুষ এসেছে এই মাত্র ৩০ সেকেণ্ড আগে।

কিন্তু ৩০ সেকেণ্ড আগের সেই মানুষ নামেই মানুষ—চেহারা ও জীবনযাপনের দিক থেকে সেই মানুষের সঙ্গে গরিলা-শিম্পাঞ্জির মিল বেশি।

সভ্য মানুষ এসেছে এক্ষুনি, এই মুহূর্তে—এই ঘড়ির হিসেবে সকাল যখন দশটা।

পৃথিবীর ঠিকানা জানতে হলে এই বিরাট বিপুল কাল-পরিধিকে অতিক্রম করতে হবে।



পৃথিবীর বয়স

তোমার অযুত নিযুত বৎসর সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে
যে বিপুল নিমেষগুলি উন্মীলিত নিমীলিত হতে থাকে—

পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল অমুক সালে। এমনিভাবে এই অধ্যায়টি শুরু করতে পারলে ভালো হত। কিন্তু স্পষ্ট কোনো সাল-তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করে পৃথিবীর বয়সকে নির্দিষ্ট করে দেবার উপায় নেই। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ অনুমানের ব্যাপার। আমরা শুধু আলোচনা করতে পারি, কোন্ অনুমানের ওপরে কতখানি নির্ভর করা চলে। প্রথমে আমাদের জানবার বিষয়টিকে আরো একটু স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে নেওয়া যাক।

আমাদের এই পৃথিবী কোন্ কোন্ উপকরণ দিয়ে তৈরি? এক কথায় বলা চলে, উপকরণ হচ্ছে কতকগুলো মৌলিক পদার্থের পরমাণু। তাহলে কি পৃথিবীর বয়স বলতে বুঝব সেই সময়কে যখন থেকে এই পরমাণুগুলো তৈরি হয়েছিল? তা নয়? যেমন, মানুষের শরীর তৈরি হয়েছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি কতকগুলো মৌলিক পদার্থ দিয়ে। কিন্তু যখন কোনো মানুষ নিজের বয়স বলে তখন কি হিসেব করতে বসে, সেই বিশেষ বিশেষ মৌলিক পদার্থগুলো কবে তৈরি হয়েছিল? তা কক্ষনো করে না। মায়ের পেট থেকে জন্ম হবার সময় থেকে মানুষের বয়সের হিসেব। তেমনি পৃথিবীর বয়সের হিসেব আমরা করব সেই সময় থেকে যখন সৌরমণ্ডলের পৃথক একটি বস্তুপিণ্ড হিসেবে পৃথিবীর অস্তিত্ব। বা,

আরো স্পষ্টভাবে বলা চলে, যখন থেকে পৃথিবীর উপরিতল জমাট বেঁধেছে।

পৃথিবীর বয়স জানবার কৌতূহল মানুষের আজকের নয়। মানুষের চিন্তাজগতে গোড়া থেকেই এ প্রশ্নটি বড়ো রকমের স্থান নিয়ে আছে। অবশ্য প্রাচীনকালে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল একটা বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা হয়ে উঠতে পারেনি, হয়ে উঠেছিল ধর্মবিশ্বাসের অনুষঙ্গ। হিন্দুশাস্ত্রের উপনিষদে কল্পনা করা হয়েছে, মানুষের আত্মা অনন্তকাল ধরে বিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং অনন্তকাল ধরে বিবর্তিত হবে। একথার অর্থ, পৃথিবী চিরকাল ছিল, চিরকাল থাকবে—এর শুরুও নেই, শেষও নেই। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে আর্চ-বিশপ আশার হিব্রু ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে মন্তব্য করেছিলেন যে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে। আশার-এর পরবর্তী ধর্মশাস্ত্রজ্ঞরা এ-ব্যাপারে আরো এগিয়ে এসেছিলেন। শুধু সাল বলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেননি। তাঁদের মতে, পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে ২৩শে অক্টোবর সকাল নটার সময়ে।

আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ হাজির করেছে। কিন্তু তবুও আধুনিক বিজ্ঞানের পক্ষেও পৃথিবীর জন্ম-তারিখটি এত সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব হয়নি।

আবার বিজ্ঞানীদের মধ্যেও পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে এককালে তুমুল তর্কবিতর্ক ছিল। ভূ-বিজ্ঞানী, জীব-বিজ্ঞানী, পদার্থ-বিজ্ঞানী—কারও সঙ্গে কারও মতের মিল ছিল না। প্রত্যেকেই নিজস্ব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বয়স অনুমান করতে চেষ্টা করেছিলেন। এক সময়ে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে কোনো একটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হয়তো সম্ভব নয়। তারপর উনিশ শতকের শেষদিকে 'রেডিও-অ্যাক্টিভিটি' বা তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কৃত হয়, এবং এই নতুন তথ্যের সাহায্যে পাওয়া যায় পৃথিবীর বয়সের নির্ভুল একটা মাপ। তেজস্ক্রিয়তার আলোচনায় আসবার আগে গোড়াকার কথা একটু জেনে নেওয়া দরকার।

ভাঙাগড়ার খেলা

ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দেখি? কোথাও আকাশছোঁয়া পর্বত, কোথাও অতল সমুদ্র; কোথাও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, কোথাও বন্যা ও ভূমিকম্পের সংহারলীলা। সর্বত্র এক বিপুল ভাঙা-গড়ার সুস্পষ্ট সাক্ষ্য।

দেখেশুনে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছিল যে ভূপৃষ্ঠ অনবরত চেহারা পালটাচ্ছে। ঠিক এই মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠে যেসব নদী-সমুদ্র-অরণ্য-পর্বত দেখছি তা চিরকাল ছিল না, চিরকাল থাকবে না। আজকের দিনে যেখানে যতো পাথর আছে, যেখানে যতো উঁচু জমি আছে, তা বৃষ্টির জলে আর তুষারপাতে একটু একটু করে ক্ষয় হচ্ছে। ক্ষয় হতে হতে এককালে ভূপৃষ্ঠের এমন এক দীন দশা উপস্থিত হবে যে কোথাও বাড়তি একটু জমির সঞ্চয় থাকবে না। ভূপৃষ্ঠ সমতল হয়ে যাবে। পাহাড়-পর্বতের চিহ্নমাত্র থাকবে না। মনে হবে, ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে অতিকায় এক স্টীমরোলার চালানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ক্ষয়ে-যাওয়া সমস্ত জমি আর পাথর রেণু রেণু হয়ে নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়ে হাজির হবে সমুদ্রে। থিতিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে। তৈরি হবে নতুন একটা স্তর। এবং এই নতুন তৈরি হওয়া স্তরের চাপে টলে উঠবে ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য। কেন টলে উঠবে, কি-ভাবে টলে উঠবে, সে-সব আলোচনায় আমরা পরে আসব। আপাতত এটুকু জেনে রাখা যাক যে তারপরে আবার নতুন করে তৈরি হবে পর্বত আর উপত্যকা। হয়তো যেখানে আগে ছিল সমুদ্র তা হয়ে উঠবে হিমালয়ের মতো আকাশছোঁয়া পর্বত। এমনিভাবে বিবর্তন ও বিপ্লবের কয়েকটি যুগ পার হয়ে এসে ভূপৃষ্ঠের আজকের এই বিশেষ রূপ। এবং এও স্থায়ী নয়। প্রতি মুহূর্তে ভূপৃষ্ঠের কোথাও না কোথাও ক্ষয় হচ্ছে, কোথাও না কোথাও সঞ্চয় হচ্ছে। এই ক্ষয় আর সঞ্চয়ের মোট ফল খেয়ালী শিল্পীর মতো এই ভূপৃষ্ঠকে কখনো করে তুলছে উঁচু-নিচু, কখনো করে তুলছে সমতল। মহাদেশগুলোকে খুশিমতো টেনেটুনে নতুন নতুন জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে। সমুদ্রকে

সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিপুল ভাঙাগড়ার খেলার মুহূর্তের জন্যেও বিরতি নেই।

ভূপৃষ্ঠের মাটি আর পাথরের স্তরে স্তরে প্রকৃতির নিজস্ব ভাষায় এই ভাঙাগড়ার ইতিহাস পাঠ করেছেন ভূ-বিজ্ঞানীরা। তবে খুব সহজে নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের এই ইতিহাস মানুষের কাছে অজ্ঞাতই ছিল বলা চলে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী জেম্‌স্‌ হাটন ভূপৃষ্ঠের এই ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা সর্বপ্রথম মেলে ধরেছিলেন।

জেম্‌স্‌ হাটন

জেম্‌স্‌ হাটনের সময়ে উপস্থিত হতে হলে পুরো দুশো বছরও আমাদের পার হতে হবে না। আমরা অনায়াসে কল্পনা করতে পারি, সেই স্কচ ভদ্রলোকটি চিকিৎসক-বৃত্তি থেকে অবসর নিয়ে নিজের খামারবাড়িতে চাষবাসের কাজ নিয়ে থাকেন আর অবসর সময়ে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন, একদিকে সমুদ্র আর অন্যদিকে চুনাপাথরের পাহাড়। আর সমুদ্রের সে এক বিচিত্র রূপ। কখনো স্থির ও শান্ত; এক-একটি অলস ঢেউ গড়িয়ে গড়িয়ে পায়ের কাছে এসে পড়ছে আর বালির ওপরে বিচিত্র আল্‌পনা এঁকে আবার সরে যাচ্ছে। কখনো বা সমুদ্রের রুদ্র রূপ, প্রচণ্ড আক্রোশে এক একটা ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ছে চুনা-পাথরের পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ের গা থেকে খাব্‌লে খাব্‌লে খসিয়ে আনছে চুনাপাথরের চাঙড়। জেম্‌স্‌ হাটন ঘুরে বেড়ান আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন। তারপর হঠাৎ একসময়ে আবিষ্কার করেন, কোনো এক শান্ত দিনের সমুদ্রের স্রোত বালির ওপরে যে-ধরনের আল্‌পনা এঁকে দিয়ে যায় হুবহু তেমনি আল্‌পনা আঁকা রয়েছে কোনো একটা ভেঙে পড়া চুনাপাথরের চাঙড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, কেন এমনটি হবে ? সদ্য ভেঙে-পড়া পাথরের গায়ে জলের ঢেউয়ের দাগ আসে কোথা থেকে ?

প্রশ্নটা অতি সাধারণ। কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব ভাবতে গিয়ে জেম্‌স্‌ হাটন ভূপৃষ্ঠের রূপান্তর-প্রক্রিয়ার মূল সূত্রটির সন্ধান পেয়ে গেলেন। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে ঢেউয়ের আল্‌পনা আঁকা এই পাথরের চাঙড় অতীতের কোনো এক সময়ে নিশ্চয়ই সমুদ্রের বেলা-ভূমিতে বালির কণা হয়ে মিশেছিল। এবং সেই বেলাভূমি একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছিল সমুদ্রের গর্ভে। সমুদ্রের ঢেউ এসে তার ওপরে আল্‌পনা এঁকে দিয়ে গেছে। এমনি আল্‌পনা আঁকা বেলাভূমিতে একটি স্তরের ওপরে জড়ো হয়েছে নতুন একটি স্তর। স্তরের পর স্তর জড়ো হতে হতে তৈরি হয়েছে প্রবল এক চাপ ; যার ফলে টলে উঠেছে ভূপৃষ্ঠের ভারসাম্য। তখন সমুদ্রের গর্ভ থেকে এককালের সেই বেলাভূমি ঠেলে উঠেছে পাহাড়ের মতো স্তূপ হয়ে, রোদে আর বাতাসে একটু একটু করে জমাট বাঁধতে বাঁধতে এক সময়ে পাথর হয়ে গেছে।

জেম্‌স্‌ হাটন বুঝতে পেরেছিলেন যে ভাঙা-গড়ার এই চক্রাবর্তন একবারেই শেষ হবার নয়। প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রের ঢেউ বেলাভূমির ওপরে বিচিত্র আল্‌পনা এঁকে চলেছে। প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে। প্রতি মুহূর্তে ভেঙে ভেঙে পড়ছে পাথরের চাঙড়, ঢেউয়ের ধাক্কায় গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে, তৈরি হচ্ছে বেলাভূমির নতুন এক স্তর। প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে বেলাভূমি, প্রতি মুহূর্তে সমুদ্রের গর্ভ থেকে পাহাড়ের মতো স্তূপ হয়ে ঠেলে উঠছে। এই চক্রাবর্তনের কোথার শুরু? কোথায় শেষ? জেম্‌স্‌ হাটন বলেছিলেন, "এই জগৎ-ব্যাপারের কোথায় যে শুরু তার কোনো চিহ্ন আমি পাইনি, কোথায় যে শেষ তার কোনো সম্ভাবনা আমি দেখিনে।" গত দেড়শো বছরে ভূ-বিজ্ঞান অনেকখানি অগ্রসর হয়ে গেছে। আজকের দিনে কোনো ভূ-বিজ্ঞানী মনে করেন না যে জগৎ-ব্যাপারের শুরু বলে কিছু নেই। কিন্তু একথা সবাই মানেন যে জগৎ-ব্যাপারের এই চক্রাবর্তন লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর ধরে চলে আসছে। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০৪ সালে ২৩শে

অক্টোবর সকাল নটার সময়ে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল বলে যাঁরা প্রচার করেছিলেন তাঁদের উক্তিকে উদ্ভট বলে আখ্যা দিতে আজ আর কারও দ্বিধা নেই। এদিক থেকে জেম্‌স্ হাটনকে বলা চলে পৃথিবীর কোষ্ঠীকার। পৃথিবীর বয়স স্থির করবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তাঁর কাছ থেকেই আমরা জেনেছি। তখন থেকেই মানুষ ধারণা করতে পেরেছিল যে পৃথিবীর ইতিহাস এক হাজার দু-হাজার বছরের নয়, একলক্ষ দু-লক্ষ বছরের নয়—কোটি কোটি বছরের। চেষ্টা করলে এই কোটি কোটি বছরের ইতিহাসকে মাটি আর পাথরের স্তরে স্তরে পাঠ করা যেতে পারে।

অন্য একটি দিক থেকেও এই সময়ে মানুষ পৃথিবীর বয়সের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ধারণা করতে পেরেছিল। বিষয়টি হচ্ছে ফসিল। ফসিল জিনিসটি কী, তা প্রথমে ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার।

ফসিল

বৃষ্টির জলে এবং নদীর স্রোতে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয় হচ্ছে, সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু একদিকের ক্ষয় হয়ে ওঠে অন্যদিকের সঞ্চয়। নদীর স্রোতে বয়ে আনা পলিমাটি একটু একটু করে থিতিয়ে পড়তে থাকে সমুদ্রের নিচে। স্তরের পর স্তর জমে ওঠে তারপর প্রচণ্ড চাপে একসময়ে সেই পলিস্তর রূপান্তরিত হয় শিলায়, যে-বিশেষ ধরনের শিলাকে আমরা বলি পাললিক শিলা। সহজেই অনুমান করা চলে, এই পাললিক শিলার স্তরবিভাগটা সময়ের দিক থেকেও একটা অনুক্রম মেনে চলে। অর্থাৎ পৃথিবীব অস্তিত্বের এক-একটা বিশেষ সময়ে পাললিক শিলার এক-একটা স্তর। বা, পাললিক শিলার এক-একটি স্তরকে কল্পনা করা যেতে পারে পৃথিবীর ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা হিসেবে। এমনি অসংখ্য পৃষ্ঠায় পৃথিবীর পুরো ইতিহাস লেখা রয়েছে যেন। তবে এই পৃষ্ঠাগুলো যদি বাঁধানো বইয়ের মতো পর-পর সাজানো থাকত তবে পড়ার কাজটা সহজ হয়ে যেত অনেক। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের ভাঙাগড়ায় পৃষ্ঠাগুলো

ওলোটপালোট হয়ে গেছে। মাত্র গত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে আমরা এই পৃষ্ঠাগুলোর দিকে মন দিয়েছি এবং একটার পর একটা সাজিয়ে তুলছি। পুরোপুরি সাজিয়ে তুলতে এখনো অনেক সময় লাগবে। কিন্তু যেটুকু সাজিয়ে তুলতে পারা গেছে তাতেই পৃথিবীর বয়সের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করতে পারা যায়।

ফসিলকে বলা যেতে পারে এই ইতিহাস-পুস্তকের পৃষ্ঠায় সাজানো এক-একটি অক্ষর। ফসিল কী? ফসিল হচ্ছে এমন একটা নিদর্শন যার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোনো জীব বা গাছপালার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ফসিল তৈরি হবার সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে অগভীর সমুদ্র। কল্পনা করা যাক, কোনো সামুদ্রিক জীবের মৃতদেহ বা নদীর স্রোতে ভেসে আসা কোনো ডাঙার জীবের মৃতদেহ সমুদ্র তলায় থিতিয়ে পড়া পলিস্তরে আট্‌কে গেছে। তারপর? সেই মৃতদেহের ওপরেই স্তরের পর স্তর পলি জমতে থাকবে। প্রচণ্ড চাপে একসময়ে সেই পলিস্তর হয়ে উঠবে পাললিক শিলা। তারপর ভূপৃষ্ঠের ভাঙাগড়ার স্বাভাবিক নিয়মে একসময়ে সেই পাললিক শিলার স্তর ঠেলা খেয়ে উঠে আসবে সমুদ্রের তলা থেকে। এইভাবে শিলাস্তরের মধ্যে এক-একটি বিশেষ সময়ের জীবজগতের সাক্ষ্য থেকে যাচ্ছে। এরই নাম ফসিল।

ফসিল নানাধরনের হতে পারে। এক ধরনের ফসিল আছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সত্যিকারের দেহাবশেষটুকুকেই পাওয়া যায়। দেহাবশেষ বলতে গোটা শরীরটাও হতে পারে, বা শরীরের কোনো অংশের হাড় বা খানিকটা নরম অংশ, বা এমনি ধরনের যা হোক কিছু। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা চলে, সাইবেরিয়ার তুষার-আস্তরের মধ্যে পুরাকালের কোনো কোনো অতিকায় জন্তুর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। আরেক ধরনের ফসিল আছে যেখানে প্রাগৈতিহাসিক জীবের সত্যিকারের দেহাবশেষ থাকে না—শুধু পাওয়া যায় অবিকৃত একটি ছাপ। এ ধরনের কোনো কোনো ফসিলে সত্যিকারের গড়নটুকুও হুবহু থেকে যায়। অন্য এক ধরনের ফসিল আছে যেখানে

থেকে প্রাগৈতিহাসিক কোনো জীবের জীবননির্বাহের ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। যেমন, কোনো ডাইনোসর বা অতিকায় জীবের পায়ের ছাপ বা পোকামাকড়ের বাসা বা এমনি ধরনের কিছু।

একথাটা মনে রাখা দরকার যে ফসিল আধুনিক মানুষের আবিষ্কার নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ফসিলের সঙ্গে পরিচিত। কিন্তু সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 'ফসিলকে বিশ্লেষণ করা শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। কুভিএ (Cuvier) নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের নাম এ-প্রসঙ্গে সবার আগে উল্লেখ করতে হবে। নানাধরনের ফসিল অনুশীলন করে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে বিভিন্ন ফসিলের মধ্যে এমন সব জীবের সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে যাদের অস্তিত্ব এখন আর পৃথিবীতে নেই। তাঁর ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবীর ইতিহাসে এক-একটি বিশেষ যুগে একেক বিশেষ ধরনের জীবের আবির্ভাব হয়েছিল। এবং সেই বিশেষ যুগটি শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশেষ ধরনের জীবের অস্তিত্বও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়েছে।

এই একই সময়ে, অর্থাৎ গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে, বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী লামার্ক ফসিল নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি কিন্তু অন্য ধরনের কথা বললেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই: পৃথিবীর ইতিহাসে একেকটি বিশেষ যুগে একেক বিশেষ ধরনের জীবের অস্তিত্ব ছিল—একথা ঠিক। কিন্তু কোনো কোনো বিশেষ ধরনের জীব পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশেষ যুগ পার হয়ে তার পরের যুগেও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে—একথাও ঠিক। আবার কোনো কোনো বিশেষ ধরনের জীব যুগে যুগে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে রূপান্তরিত হয়েছে—একথাও ঠিক। লামার্কের এই মতবাদ থেকেই গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ডারউইনের মতবাদের উদ্ভব।

যুগ-বিভাগ

ফসিল নিয়ে গবেষণা করতে করতে গত শতাব্দীর প্রথম পাদে

উইলিয়ম স্মিথ নামে একজন ইংরেজ ভূ-বিজ্ঞানী একটা নতুন ব্যাপার আবিষ্কার করলেন। তিনি দেখলেন যে কোনো কোনো বিশেষ ধরনের ফসিল পাওয়া যায় শুধু বিশেষ ধরনের শিলায়। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে কোনো কোনো বিশেষ ধরনের ফসিল যে-যে বিশেষ ধরনের শিলায় পাওয়া যায়, সেই-সেই বিশেষ শিলা পৃথিবীর ইতিহাসে একেক বিশেষ যুগের অন্তর্ভুক্ত। এই উক্তিকে মেনে নিলে পৃথিবীর বয়সকে কয়েকটি বিশেষ যুগে সহজেই ভাগ করে নেওয়া যায়। তাছাড়া আমরা জানি যে উদ্ভিদ্‌জগৎ ও জীবজগতের একটা ক্রমবিকাশ আছে। সেই ক্রমবিকাশে যে উদ্ভিদ বা যে জীব যতো বেশি প্রাথমিক স্তরের, বয়সের দিক থেকেও তারা ততো প্রাচীন—একথা নিশ্চয়ই ধরে নেওয়া চলে। এই দুটি সিদ্ধান্তের ওপরে ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়সকে কয়েকটি প্রধান যুগে ভাগ করে নিয়েছেন। এই যুগ-বিভাগ সম্পর্কে খানিকটা ধারণা থাকা দরকার।

সবচেয়ে নবীন যুগটির নাম 'নবজীবীয়' (cainozoic)। এটি হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীবদের যুগ। এই যুগের শুরু ৭ কোটি বছর আগে এবং এখনো চলছে।

নবজীবীয় যুগের আগের যুগটির নাম 'মধ্যজীবীয়' (mesozoic)। এটি হচ্ছে সরীসৃপদের যুগ। ১৯ কোটি বছর আগে শুরু হয়ে ৭ কোটি বছর আগে এই যুগটি শেষ হয়েছে।

মধ্যজীবীয় যুগের আগে 'পুরাজীবীয়' (palaeozoic) যুগ। এই যুগে জীবজগতের প্রাথমিক স্তর। এই যুগেই মাছ-জাতীয় প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব। পরে এই মাছ-জাতীয় প্রাণীর বিশেষ একটি শাখা ডাঙায় উঠে আসে ও আকাশে উড়তে শুরু করে। এই যুগটি প্রায় ৩৪ কোটি বছর বজায় ছিল।

পুরাজীবীয় যুগের আগেও কোটি কোটি বছরের ইতিহাস আছে। এই কোটি কোটি বছরে সামুদ্রিক গাছপালা ছাড়া অন্য কিছুর সাক্ষ্য পাওয়া যায় না।

এ সমস্ত তথ্য জানার পরে ভূ-বিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদের কাছে একটি কথা খুব স্পষ্ট হয়ে গেল। পৃথিবীর বয়স অবিশ্বাস্য রকমের বেশি। কয়েক-শো কোটি বছরের কম কিছুতেই নয়। কয়েক-শো কোটি বছর ধরে ভূপৃষ্ঠের ও জীবজগতের বিবর্তন হয়েছে।

কিন্তু উনিশ শতকের পদার্থবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে পৃথক্ একটি গ্রহ হিসেবে পৃথিবীর অস্তিত্ব এত দীর্ঘ সময়ের নয়। পদার্থ-বিজ্ঞানীরাও নিজেদের মতের সপক্ষে এমন সব যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন যা তখনকার কালে খণ্ডন করা যায়নি। পরে, গত শতাব্দীর শেষ দিকে পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার হয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে তেজস্ক্রিয়তা। এই নতুন আবিষ্কার পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে পুরনো তর্কবিতর্কের চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিয়েছে। নির্ভুলভাবে জানা গিয়েছে যে পৃথিবীর বয়স কয়েক-শো কোটি বছরের কম কিছুতেই হতে পারে না আর উনিশ শতকের ভূ-বিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদের অনুমান সঠিক।

পদার্থবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত

কিন্তু উনিশ শতকের দিকপাল পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন অখণ্ডনীয় যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন যে পৃথিবীর বয়স বড়ো জোর দশ কোটি বছর। লর্ড কেলভিনের যুক্তিবিস্তারের সঙ্গে আমাদের কিছুটা পরিচিত হতে হবে ; কারণ লর্ড কেলভিন এমন কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন যার ওপরে আজকের দিনেও গবেষণা চলছে।

লর্ড কেলভিন তিনটি বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্নটির মীমাংসা করেছিলেন।

প্রথম কথা, এই বিপুল বিশ্বজগতে এই যে অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র আপন আপন নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছে, তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আছে কিনা ; নাকি এই বিশ্বজগতের গতি-বিন্যাস আজকের দিনে যা আছে, অতীতের যে-কোনো সময়ে তাই ছিল

আর ভবিষ্যতের যে কোনো সময়ে তাই থাকবে ?

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনেক অঙ্ক কষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে আমাদের এই সৌরমণ্ডলে কোনো রকম অস্থিরতা নেই। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের সূর্য-পরিক্রমা ঠিক আজকের দিনে যেমনভাবে চলছে, অতীতের যে-কোনো সময়ে ঠিক তেমনিভাবেই চলেছিল, ভবিষ্যতের যে-কোনো সময়ে ঠিক তেমনি-ভাবেই চলবে। অর্থাৎ, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের গতিবেগ শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয়।

দেখা গেল, জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভূ-বিজ্ঞানী ও জীববিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের একটা মিল থেকে যাচ্ছে। ভূ-বিজ্ঞানী জেম্স হাটনের সেই উক্তি—এই জগৎ-ব্যাপারের শুরুও নেই, শেষও নেই—তারই জোরালো সমর্থন পাওয়া গেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের উক্তিতে। এই বিশ্বজগতেও বিপুলতম বস্তুপিণ্ড থেকে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্যন্ত সবকিছুই গতিশীল। এই গতিশীলতা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। কোথাও এর শুরু আছে বলে মনে হয় না। কারণ এই গতিশীলতার মধ্যে কোনো রকম পরিবর্তন নেই। আজকের এই বিশেষ মুহূর্তে বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তুপিণ্ডের যে বিশেষ অবস্থান—তা এই গতিশীলতারই প্রকাশ। সুতরাং জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করলেন, বিশ্বজগতের এই গতিশীলতাকে যদি ঠিকভাবে বুঝে নেওয়া যায় তাহলেই বিশ্বজগতের মূল রহস্যকে বোঝা হয়ে গেল।

কথাটা আরেকটু পরিষ্কারভাবে বলা যাক। আমাদের এই পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি মাঝারি আকারের গ্রহ। ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড সময়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট একটি কক্ষপথে একবার ঘুরে আসে। আমাদের কাছে সময়ের মাপটা কি ? না, আমরা জানি, পৃথিবী লাট্টুর মতো পাক খেতে খেতে সূর্যের চারদিকে ঘোরে ; পৃথিবীর এক-একটি লাট্টুর পাক খাওয়ার সময়কে আমরা ধরে নিয়েছি ২৪ ঘণ্টা হিসেবে। আবার প্রত্যেকটি

ঘণ্টাকে ভাগ করে নিয়েছি ৬০ মিনিটে এবং প্রত্যেকটি মিনিটকে ৬০ সেকেণ্ডে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের বিজ্ঞানীরা বললেন যে, অতীতের দিকে যতো দূরেই দৃষ্টিপাত করা যাক না কেন, পৃথিবী এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই এক-একবার লাট্টুর পাক খেয়েছে, এক-একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে এসেছে। এ-ব্যাপারে কক্ষনো কোনো রকম ওলোট-পালোট হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে না। কাজেই পৃথিবীর গতিশীলতার নিয়মকানুনগুলোকে যদি একবার ঠিকভাবে বুঝে নেওয়া যায়—তাহলেই এ-ব্যাপারে আর কোনো রহস্য থাকে না। অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়াটা তখন শুধু একটা অঙ্ক কষার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

এই একই কথা পৃথিবী ও চন্দ্র সম্পর্কে। চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে সময় নেয় ২৮ দিন। আবার পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে গিয়ে নিজের চারদিকেও একবার লাট্টুর মতো পাক খায়। চন্দ্রের এই গতিশীলতাকে বুঝে নিতে পারলেই এক্ষেত্রেও আর কোনো রহস্য থাকে না। শুধু অঙ্ক কষেই আমরা বলে দিতে পারি, অতীতের যে-কোনো সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্র কোন্ বিশেষ অবস্থানে ছিল এবং ভবিষ্যতের যে-কোনো সময়ে কোন্ বিশেষ অবস্থানে থাকবে।

অর্থাৎ, এই জগৎ-ব্যাপারের শুরুও নেই, শেষও নেই। অনন্তকাল ধরে একই নিয়মে প্রত্যেকটি বস্তুপিণ্ড আবর্তিত হয়ে চলেছে।

ঘর্ষণজনিত ফলাফল

১৮৫৩ সাল পর্যন্ত মোটামুটি এই ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মত। তারপরে প্রথম অন্য ধরনের কথা বললেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী, নেপচুন গ্রহের অন্যতম আবিষ্কর্তা, জে-সি অ্যাডাম্স্।

এতদিন পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ফ্রিক্শন বা ঘর্ষণের জন্যে গ্রহের গতিশীলতায় কোনো হেরফের হয় না। বা, যদি হয়েও থাকে তবে তা এত তুচ্ছ যে অনায়াসেই হিসেব থেকে বাতিল করা চলে।

ফ্রিক্‌শন বা ঘর্ষণ শব্দটি ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। রেল লাইনের ওপর দিয়ে মালগাড়িকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হলে ইঞ্জিনের দরকার হয়। কেন দরকার হয়? কেন এক ঠেলাতেই মালগাড়ি গড়গড় করে চলতে চলতে গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছয় না? কেন খানিকটা এসে থেমে যায়? কারণ-- এই ফ্রিক্‌শন বা ঘর্ষণ। রেলের লাইনের সঙ্গে মালগাড়ির চাকার ঘর্ষণ, বাতাসের সঙ্গে মালগাড়ির কাঠামোর ঘর্ষণ। এই ঘর্ষণের জন্যেই মালগাড়ির গতি কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত থেমে যায়। আমাদের রোজকার জীবনে আমরা দেখি, কোনো গতিই অনন্তকালের নয়। গতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে অনবরত তাকে ঠেলা দিতে হয় বা টান মারতে হয়। কারণ, যেখানেই গতি সেখানেই ঘর্ষণের পিছুটান। কিন্তু মহাজাগতিক ক্ষেত্রে কি কোথাও কোনো রকম ঘর্ষণজনিত পিছুটান নেই? আমাদের এই সৌরমণ্ডলে এই যে এতগুলো গ্রহ অনবরত ঘুরছে আর পাক খাচ্ছে—সেখানে ঘর্ষণের ব্যাপারটিকে কি সত্যি সত্যিই একেবারে তুচ্ছ করা চলে?

সমস্যাটাকে বোঝবার জন্যে আবার আমরা খুব একটা ছোট পরিধির মধ্যে নজর দেব। পৃথিবী ও চন্দ্র। একটি গ্রহ, অপরটি উপগ্রহ। এই গ্রহ-উপগ্রহের ক্ষেত্রে ঘর্ষণজনিত পিছুটানের প্রত্যক্ষ ফল কতটুকু, তা যদি বুঝে নিতে পারা যায় তাহলে অন্তত এটুকু অনুমান করে নিতে বাধা থাকে না যে সৌরমণ্ডলের ক্ষেত্রে বা মহাজাগতিক ক্ষেত্রে সমস্যাটা অনেক বেশি গুরুতর।

আমরা জানি, পৃথিবীর এক পাক আমাদের ঘড়ির পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। পৃথিবী পাক খাচ্ছে পশ্চিম থেকে পুবে। কিন্তু আমরা সেটা টের পাই না। আমাদের মনে হয়, আকাশটা যেন পুব থেকে পশ্চিমে পাক খাচ্ছে। তাহলে পৃথিবীর পাক খাওয়াকে সময়ের হিসেবের মধ্যে ধরবার উপায় কী? উপায় খুবই সহজ। মনে করা যাক বিশেষ একটি নক্ষত্র বিশেষ এক সময়ে আকাশের মধ্যরেখাকে অতিক্রম করছে। তাহলে কাঁটায় কাঁটায় ২৪ ঘণ্টা

পরে এই বিশেষ নক্ষত্রটি আকাশের মধ্যরেখাকে দ্বিতীয়বার অতিক্রম করবে। সময়ের এই মাপকে বলা হয় নাক্ষত্রকাল। অবশ্য আমাদের রোজকার জীবনে আমরা যে ঘড়ির সময়কে মেনে চলি তা নাক্ষত্রকাল নয়, সৌরকাল। অর্থাৎ আমাদের কাঁটাকে সূর্যের চলাফেরার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়। সূর্য যখন আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করে তখন আমাদের ঘড়িতে দুপুর বারোটা। সূর্য একই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত জায়গায় আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করে না ; কাজেই পৃথিবীর একদেশের ঘড়ির সময়ের সঙ্গে অপর দেশের ঘড়ির সময়ের মিল নেই। আমরা সৌরকালকে মেনে চলি আমাদের কাজের সুবিধের জন্যে। আসলে কিন্তু নাক্ষত্রকাল ও সৌরকালের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ক্ষেত্রেই পৃথিবীর পুরো একটি পাক খাওয়াকে আমরা পুরো চব্বিশ ঘণ্টা হিসেবে ধরে নিচ্ছি। আমাদের এই পৃথিবীর পাক খাওয়াটাই আমাদের ঘড়ির হিসেব।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, আমাদের এই ঘড়ির হিসেবে কখনো গরমিল হয়নি, কখনো গরমিল হবে না। কিন্তু উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে এসে জানতে পারা গেল, এই ধারণা ভুল। পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ খুব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ, এখন যেখানে পৃথিবীর পুরো একটি পাক খেতে সময় লাগে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা, সেখানে অতীতে সময় লেগেছে চব্বিশ ঘণ্টার কম, ভবিষ্যতে সময় লাগবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি। ব্যাপারটা ভালো করে বোঝা দরকার।

পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ খুব আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে—কথাটার মানে কী? একটি চাকার পাক-খাওয়ার বেগ যতো কমে, ততোই চাকাটির পুরো এক পাক ঘুরতে আরো বেশি সময় লাগে। আবার আমরা জানি, পৃথিবীর এক পাক আমাদের একটি দিন ও একটি রাত্রি মিলিয়ে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। পৃথিবীর এই পাক-খাওয়ার বেগ যদি কমে যায়, তাহলে পৃথিবী পুরো একটি পাক খেতে

আরো বেশি সময় নেবে। তার মানে, যেখানে আমাদের দিন ও রাত্রি মিলিয়ে সময়ের হিসেবটা ছিল পুরো চব্বিশ ঘণ্টা—সেখানে তা আর চব্বিশ ঘণ্টা থাকবে না, আরো বেশি হবে।

কিন্তু পৃথিবীর পাক-খাওয়ার বেগ এত আস্তে আস্তে কমছে যে আমাদের একটা-তুটো জীবনে এর বিন্দুমাত্র তারতম্য আমরা টের পাই না। সাধারণভাবে এ-ব্যাপারটাকে আমরা অনায়াসেই উপেক্ষা করে চলতে পারি।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, একটা-তুটো জীবনে যে-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটে না, তা টের পাওয়া গেল কি করে ?

বিষয়টি এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে আমাদের আলোচনা থেকে খানিকটা সরে এসে এ-বিষয়ে আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

পৃথিবী ও চন্দ্রের ঠেলাঠেলি

পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের পাক খাওয়ার রাস্তা বড়ো জটিল। কারণ চন্দ্রকে অনেকগুলো টানের মাঝখানে পড়তে হয়েছে। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের টান যেমন পৃথিবীর ওপরে আছে, তেমনি চন্দ্রের ওপরেও আছে। আমাদের এই সৌরমণ্ডলে সূর্যের টান সবচেয়ে বড়ো, সেজন্যে প্রত্যেকটি গ্রহ সূর্যের চারপাশে ঘোরে। কিন্তু চন্দ্র যে পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে তার কারণ, চন্দ্র থেকে সূর্য অনেক দূরে, পৃথিবী অনেক কাছে—কাজেই চন্দ্রের ওপরে সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর টান বেশি। আবার পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অতএব সেই সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রকেও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চলতে হচ্ছে। তাছাড়া চন্দ্র থেকে সূর্য যতো দূরেই হোক, পৃথিবীর ওপরে সূর্যের টানের যেমন প্রত্যক্ষ ফল আছে, তেমনি আছে চন্দ্রের ওপরে সূর্যের টানেরও। এই সমস্ত কারণে চন্দ্রের চলাফেরাটা বড়ো জটিল। এমনিতে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ যদি না থাকত তাহলে চন্দ্র স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর চারপাশে বৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে ঘুরে চলত।

তার মধ্যে কোনো রকম জটিলতা থাকত না। কিন্তু এতগুলো টানের মাঝখানে পড়ে চন্দ্র বেচারাকে কিছুটা হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই জটিল ব্যাপারটাও অঙ্ক কষে নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করেছেন। পৃথিবী সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহের পরিমণ্ডলে চন্দ্র কখন কোথায় অবস্থান করবে, সেই হিসেবটা পাকাপাকিভাবে জানা গেছে। এই হিসেব থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন, অতীতে কোন্ কোন্ সময়ে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ সময়ে সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হবে।

কিন্তু বিপদ বাধল এখানেই। প্রাচীনকালের যে-সব সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের কথা পুঁথিপত্রে লেখা আছে—সেগুলোর সঙ্গে হিসেবটাকে যাচাই করতে গিয়ে দেখা গেল, বড়োই গণ্ডগোল, হিসেব মেলে না। প্রাচীনকালে প্রত্যেকটি সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হিসেব-করা সময়ের খানিকটা আগে ঘটে গেছে। যেমন ধরা যাক, খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালে ব্যাবিলন শহরের চন্দ্রগ্রহণের কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে স্থির করলেন ঠিক কোন্ সময়ে এই চন্দ্রগ্রহণ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পুঁথিপত্রের বিবরণ থেকে জানা গেল, হিসেবের সময়ের থেকে সাড়ে-তিন ঘণ্টা আগে চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালের এই চন্দ্রগ্রহণটি আরো সাড়ে-তিন ঘণ্টা পরে হলে হিসেব ঠিক থাকত। তেমনি পরেকার কালের যতো সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে, প্রত্যেকটিই হিসেবের সময়ের আগে ঘটছে। তবে সবগুলোই সাড়ে-তিন ঘণ্টা আগে নয়। আধুনিককালের দিকে যতোই এগিয়ে আসা যায়, ততোই এই সময়ের তফাৎ কমতে থাকে।

কেন এমনটি হবে? কোন্ বিশেষ অবস্থায় এমনটি হওয়া সম্ভব? জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বললেন যে এ-ব্যাপারটি সম্ভব হতে পারে যদি পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্রের ছুট দেওয়াটা চিরকাল একই মাপের না থেকে ক্রমেই একটু একটু করে বাড়তে থাকে। অর্থাৎ প্রাচীন কালে চন্দ্র যতোটা বেগে ছুটত এখন তার চেয়ে অনেক বেশি

বেগে ছুটছে, এবং এই ছোটার বেগ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটু একটু করে বেড়েছে।

এ তো গেল জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা। কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাই ঘটেছে? যদি ঘটে থাকে তো কেন ঘটেছে? এর পিছনকার কার্যকারণ সম্পর্কটা কী?

পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ২,৪০,০০০ মাইল। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই দূরত্ব কি চিরকাল একই রকম থেকেছে? জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, তা থাকেনি। গোড়ার দিকে পৃথিবী ও চন্দ্র খুবই কাছাকাছি ছিল। কিন্তু ক্রমেই একটু একটু করে চন্দ্র দূরে সরে গেছে। এখনো যাচ্ছে। আরো বেশ কিছুকাল ধরে যাবে।

তাহলেই প্রশ্ন ওঠে, চন্দ্র কেন দূরে সরে যাচ্ছে?

এই একটি প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই অন্য সমস্ত প্রশ্নের জবাব আছে। ধরে নেওয়া যাক, গোড়ার অবস্থায় পৃথিবী ও চন্দ্র ছিল খুবই কাছাকাছি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ চন্দ্রকে টানছিল; চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীকে টানছিল। চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ-টানের ফলে পৃথিবীর সমুদ্রে শুরু হয় জোয়ার-ভাঁটা। পৃথিবীর যে বিশেষ দিক চন্দ্রের দিকে মুখ করে আছে সে-দিকের সমুদ্রের জলকে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ টান মারে। তেমনি সেই বিশেষ দিকের উল্‌টো দিকের সমুদ্রের জলকেও চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ টান মারে। কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্রে এই দুই বিপরীত দিকের টান সমান মাপের হয় না। পৃথিবীর একদিকটা রয়েছে চন্দ্রের খুব কাছে, অপর দিক রয়েছে চন্দ্র থেকে অনেকটা দূরে। কাজেই, কাছের দিকে চন্দ্রের টান বেশি, দূরের দিকে চন্দ্রের টান কম। টানের এই তারতম্যের ফলে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ারের দুটি আলাদা স্রোত তৈরি হয়। কিন্তু পৃথিবীও স্থির হয়ে নেই, চন্দ্রও স্থির হয়ে নেই। চন্দ্র যেদিক দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, এই দুটি স্রোতও সেদিক দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে চেষ্টা করে। কিন্তু চন্দ্র যতোক্ষণ সময়ে পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরছে,

তার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি পৃথিবী নিজের চারদিকে একবার পাক খাচ্ছে। তার মানে, এই স্রোতছুটি চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারদিকে পুরোপুরি একটা পাক খায়। এজন্যেই পৃথিবীর যে-কোনো জায়গার সমুদ্রে দিনে-রাতে দু-বার জোয়ার-ভাঁটা।

কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠের সবটাই তো আর সমুদ্র নয়। কাজেই জোয়ারের স্রোত নির্বিবাদে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেতে পারে না। অনেকগুলো মহাদেশ আছে, অনেক বাধাবিপত্তি আছে, সুতরাং জোয়ারের স্রোতকে পদে পদে ঠোক্কর খেতে হয়। আর জোয়ারের স্রোত যখনই এভাবে ঠোক্কর খায়, তখনই সেটা একটা ব্রেক হিসেবে কাজ করে। চাকার ব্রেক কষলে যেমন চাকার পাক খাওয়ার বেগ কমে যায় বা চাকা একেবারে থেমে যায়—তেমনি জোয়ারের স্রোতের ঠোক্কর খাওয়ার ব্রেকও পৃথিবীর পাক-খাওয়াকে কমিয়ে দেয় বা থামিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তবে এই ব্রেক এতই দুর্বল যে থামিয়ে কোনো সময়েই দিতে পারে না, আর যেটুকু কমিয়ে দেয় তাও এত যৎসামান্য যে সাধারণ ব্যাপারে ধর্তব্যই নয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে দিনরাত্রির চব্বিশ ঘণ্টাই জোয়ারের স্রোত পৃথিবীর চারদিকে পাক খাচ্ছে আর পাক খেতে গিয়ে কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু এমনিতে যে ব্রেক এত দুর্বল যে সাধারণ সমস্ত ব্যাপারে একেবারেই উপেক্ষা করা চলে, সেই ব্রেকই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অনবরত কাজ করার পরে দেখা যায়, ব্যাপারটি তুচ্ছ করার মতো নয়। দেখা যায়, পৃথিবী আর আগের মতো তাড়াতাড়ি পাক খাচ্ছে না; পৃথিবীর পাক-খাওয়াটা খানিকটা বিলম্বিত হয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর দিন বড়ো হয়ে গেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি ১,২০,০০০ বছরে আমাদের এই পৃথিবীর দিন এক সেকেণ্ড হিসেবে বেড়ে যাচ্ছে।

১,২০,০০০ বছরে এক সেকেণ্ড!

মনে হতে পারে এত ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে এত বেশি মাথা না

ঘামালেও চলে। ১,২০,০০০ বছরে পৃথিবীর দিন যদি এক সেকেণ্ড বেড়ে যায় তো বাড়ুক, পৃথিবীর কোনো যন্ত্রে এত সামান্য একটা পরিবর্তন কোনো দিনই ধরা পড়বে না।

আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অঙ্ক কষে দেখানো যেতে পারে এই সামান্য পরিবর্তনের জন্যেই গত চার হাজার বছরে সময়ের হিসেবে সাত ঘণ্টা হেরফের হয়ে গেছে। তার মানে, কথাটা দাঁড়ায় এই : পুরো চব্বিশ ঘণ্টায় একটি দিন—এই ধরে নিয়ে যদি হিসেব করা যায় তাহলে দেখা যাবে, জ্যোতির্লোকের কোনো ঘটনা ঠিক যে-সময়ে ঘটেছিল বলে তৎকালীন বিবরণ থেকে পাওয়া যায়, অঙ্কের হিসেবের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। অঙ্কের হিসেবে দেখা যাবে, ঘটনাটি আরো সাত ঘণ্টা পরে ঘটা উচিত ছিল।

আবার, পৃথিবীর দিন যতো সামান্য হারেই বাড়ুক না কেন, চন্দ্রের বেগের ওপরে তার একটা ফল আছে। পৃথিবীর পাক খাওয়া যতো বিলম্বিত হয় চন্দ্রের বেগ ততো বাড়ে। কেন বাড়ে সে-আলোচনার মধ্যে আমাদের না গেলেও চলবে। এটা হচ্ছে বলবিদ্যার একটা সাধারণ নিয়ম।

চন্দ্রের বেগ বেড়ে যাওয়ার ফলটা কী হবে? চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে। একদিকে ছুট এবং অপরদিকে টান আছে বলেই চন্দ্র পৃথিবীর গায়ের ওপরে মুখ থুবড়ে পড়ে না বা ছিট্‌কে বেরিয়ে যেতে পারে না। শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর চারদিকে চক্রাকারে ঘুরতে শুরু করে। চন্দ্রের এই চক্রপথ—বা যাকে আমরা বলি কক্ষ—কী আকার নেবে তা নির্ভর করে এই টান আর ছুটের ওপরে। আবার, এই টান আর ছুটের মধ্যে সামঞ্জস্য রেখে চন্দ্র যখন বিশেষ একটি কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, তখন যদি চন্দ্রের ছুট খানিকটা বেড়ে যায় তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে? চন্দ্রের ছুট বেড়ে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, পৃথিবীর টানকে খানিকটা অগ্রাহ্য করে আরো খানিকটা দূরে সরে যাবার ক্ষমতা চন্দ্র আয়ত্ত করে। কতোটা দূরে সরবে? ঠিক যতোটা দূরে সরলে চন্দ্রের ছুট

আর পৃথিবীর টান আবার সমান সমান হবে।

এইভাবে পৃথিবীর পাক-খাওয়া যতোই কমেছে, চন্দ্র ততোই দূরে সরে গেছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের হিসেব থেকে জানা গেছে, চন্দ্র প্রতি বছরে পাঁচ ইঞ্চি দূরে সরে যায়।

আর এজন্যেই প্রাচীন পুঁথিপত্রে যতো চন্দ্রগ্রহণ আর সূর্যগ্রহণের বিবরণ আছে, সবগুলোই খানিকটা আগে আগে হয়ে গেছে মনে হয়। পুরো চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর একটি দিন এটুকু ধরে নিয়ে যতোই অঙ্কের হিসেব করা যাক না কেন, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তাকে কিছুতেই মেলানো যাবে না।

প্রসঙ্গক্রমে, এই ঘটনার অপর দিকটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। চন্দ্রের টানে যেমন পৃথিবীতে জোয়ার-ভাঁটা হচ্ছে, তেমনি পৃথিবীর টানে চন্দ্রেও জোয়ার-ভাঁটা হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা জানি, চন্দ্রে একফোঁটা জলও নেই এবং যে বস্তুপিণ্ড দিয়ে চন্দ্র তৈরি হয়েছে তা পুরোপুরি জমাট বেঁধে গেছে। কাজেই আপাতত চন্দ্রে জোয়ার-ভাঁটা হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু অতীতের কোনো এক সময়ে নিশ্চয়ই চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড তরল অবস্থায় ছিল। সে-সময়ে নিশ্চয়ই পৃথিবীর টানে সেই তরল বস্তুতে জোয়ার-ভাঁটা হয়েছে। সেই জোয়ার-ভাঁটার ফল কী দাঁড়িয়েছে ? ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, চন্দ্রের পাক-খাওয়া বিলম্বিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা মাপে এসে ঠেকেছে যে চন্দ্রের একদিকটা সব সময়েই পৃথিবীর দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরতে চন্দ্র যতোটা সময় নেয় (২৮ দিন), সেই সময়ের মধ্যে চন্দ্র নিজের চারদিকে একবার মাত্র পাক খায়। এই হচ্ছে চন্দ্রের ওপরে পৃথিবীর টানের চূড়ান্ত ফল। চন্দ্রের পাক খাওয়া এর চেয়ে বিলম্বিত হওয়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তা হতে হলে চন্দ্রকে পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে যেতে হয়। এবং সেটা সম্ভব নয় বলেই চন্দ্রের এই অবস্থা।

সৌরমণ্ডলে এ-ধরনের দৃষ্টান্ত আরো আছে। সূর্যের সবচেয়ে কাছের

গ্রহ বুধ সব সময়েই বিশেষ এক দিক সূর্যের দিকে ফিরিয়ে থাকে। অর্থাৎ বুধগ্রহের একদিকে চিরকালের জন্যে দিন, অপরদিকে চির-কালের জন্যে রাত্রি। সূর্যের প্রচণ্ড টানে বুধগ্রহের তরল অবস্থায় বুধগ্রহের বস্তুপিণ্ডে যে জোয়ার-ভাঁটা উঠেছিল, তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে বুধগ্রহের এই পরিণতি।

বয়সের হিসেব

আমরা আলোচনা করছিলাম পৃথিবীর বয়স নিয়ে। সেই আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

পৃথিবী ও চন্দ্রের ঠেলাঠেলির ব্যাপারটা যদি ঠিকমতো বুঝতে পারা গিয়ে থাকে তবে এ-থেকেই চন্দ্রের বয়সের একটা হিসেব পাওয়া যেতে পারে। আর চন্দ্রের বয়স সম্পর্কে একটা ধারণা করে নিতে পারলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পৃথিবী ও চন্দ্রের ঠেলাঠেলির ব্যাপারটা থেকে দুটি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। (১) পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে; ফলে পৃথিবীর দিনের মাপ প্রতি একলক্ষ কুড়িহাজার বছরে এক সেকেণ্ড হিসেবে বাড়ছে। (২) চন্দ্র প্রতি বছরে পাঁচ ইঞ্চি হিসেবে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই দুটি সিদ্ধান্ত থেকে তৃতীয় আরেকটি সিদ্ধান্ত করা চলে। এক সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থান নিশ্চয়ই খুব কাছাকাছি ছিল। আর সে-সময়ে পৃথিবী নিশ্চয়ই আরো অনেক দ্রুত পাক খেত। এবং যেহেতু পৃথিবী ও চন্দ্রের অবস্থান ছিল আরো অনেক কাছাকাছি, অতএব চন্দ্রের টানে পৃথিবীতে আরো অনেক জোরালো জোয়ার-ভাঁটা হত। আজকের দিনে যেমন জোয়ার-ভাঁটার ফলে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন বিলম্বিত হচ্ছে, তখনো নিশ্চয়ই তাই হয়েছিল।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমরা বলেছি, সমুদ্রের জোয়ার-

ভাঁটা পৃথিবীর আহ্নিক-গতির ক্ষেত্রে একটা ব্রেক হিসেবে কাজ করে, যেজন্যে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন ক্রমেই বিলম্বিত হয়। কি মাপে বিলম্বিত হয় তার একটা হিসেবও পাওয়া গেছে। কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই মাপটা সব যুগে সমান নাও হতে পারে। ভূপৃষ্ঠে কত যে পরিবর্তন হয়েছে, তার ঠিকঠিকানা নেই। আজকের দিনে সমুদ্র মহাদেশ ও পর্বতের বিন্যাস যেমনটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—তা বিশেষ করে আজকের এই যুগেরই সৃষ্টি। অতীতের অন্য কোনো যুগের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। তাছাড়া পৃথিবীতে অন্তত কয়েকটা যুগ গেছে যখন গোটা পৃথিবী সমতল হয়ে উঠেছিল। সুতরাং, সহজেই অনুমান করা চলে, সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটা হবার জন্যে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন যে বিলম্বিত হয়, সেই মাপটা সব যুগে সমান নয়। তার মধ্যে মাত্রার তারতম্য আছে।

কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মোটামুটি হিসেব করে বার করেছেন, চন্দ্রের জন্ম হবার সময়ে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন কী মাপের ছিল। কোন্ যুগে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন কতখানি বিলম্বিত হয়েছে, সেই হিসেব থেকেই এই হিসেব বার করা হয়েছে। তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের মতে, আজ থেকে ৪০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চন্দ্রের কেন্দ্রের দূরত্ব ছিল মাত্র ৮,০০০ মাইল, পৃথিবী তখন প্রতি চার ঘণ্টায় একবার লাট্টুর পাক খেত, চন্দ্র প্রতি চার ঘণ্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করত।

একবার সে-সময়কার অবস্থাটা ভাবতে চেষ্টা করা যাক। পৃথিবীর উপরিতল তখনো পুরোপুরি জমাট বাঁধেনি। চারদিকে ধোঁয়া আর বাষ্প উঠছে। এই ধোঁয়া আর বাষ্প থেকেই তৈরি হবে প্রাণীর বসবাসের উপযোগী বাতাস আর সমুদ্রের জল। দিনের সূর্য মাত্র দু-ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উদয়াচল থেকে অস্তাচল পরিক্রমা শেষ করে। রাত্রিবেলা মনে হয় চাঁদ যেন হাতের নাগালের মধ্যে রয়েছে। আকাশের তারাগুলো ভালো করে ফুটে ওঠারও সময় থাকে না। গোধূলির অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে না আসতেই ঊষার

আলো ফুটে ওঠে। মাত্র দু-ঘণ্টা!

তারপর একটু একটু করে পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন বিলম্বিত হয়েছে। একটু একটু করে চাঁদ সরে গেছে।

একটি দিন ও একটি রাত যেখানে ছিল মাত্র চার ঘণ্টা, তা বড়ো হতে হতে এখন এসে দাঁড়িয়েছে চব্বিশ ঘণ্টায়। আরো বড়ো হচ্ছে। বড়ো হতে হতে একসময়ে পৃথিবীর একটি দিন ও একটি রাত্রি পৃথিবীর সাতচল্লিশটি দিন-রাত্রির সমান হবে। কিন্তু সে-সব পরের কথা।

যে-কথা আমরা আলোচনা করছিলাম। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে লর্ড কেল্‌ভিন পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে নিজের মতামতের সমর্থনে তিনটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এবার আমরা লর্ড কেল্‌ভিনের প্রথম যুক্তিটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন ক্রমেই বিলম্বিত হচ্ছে। তার মানে, যতোই অতীতের দিকে যাওয়া যাবে, ততোই পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন দ্রুততর হবে। বর্তমানে, চব্বিশ ঘণ্টায় পৃথিবীর একটি পাক—তখন আরো অনেক কম সময়ে। লর্ড কেল্‌ভিন বললেন, আচ্ছা, হিসেব করে দেখা যাক, ১০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী আরো কতটা কম সময়ে একটি পাক খাওয়া শেষ করত, বা, অন্য ভাষায়, আরো কত তাড়া-তাড়ি পাক খেত। হিসেব করে দেখা গেল, এখন যে-সময়ের মধ্যে পৃথিবী ছ-বার পাক খায়, তখন সেই সময়ের মধ্যেই পাক খেত সাত বার। লর্ড কেল্‌ভিন প্রমাণ করলেন, তখন যদি পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড তরল বা গ্যাসীয় অবস্থায় থাকত তাহলে পাক খাওয়ার স্বাভাবিক নিয়মেই পৃথিবীর উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরুর দিক আরো অনেক চ্যাপ্‌টা হয়ে যেত। আর যদি ধরে নেওয়া যায়, পৃথিবীর উপরিতল সে-সময়ের আগেই সম্পূর্ণ জমাট বেঁধে গেছে—তাহলেও প্রশ্ন ওঠে। সেক্ষেত্রে, তারও আগের যুগে, যখন পৃথিবী গ্যাসীয় বা তরল অবস্থায় ছিল এবং পৃথিবী আরো অনেক বেশি দ্রুত পাক খেত—তাহলে তখনই পৃথিবী দুই মেরু-অঞ্চলের দিকে অনেক বেশি চ্যাপ্‌টা হয়ে

গিয়েছিল ; সুতরাং তার পরের যুগে যদি পৃথিবীর উপরিতল জমাট বেঁধে থাকে, তাহলে এই অনেক-বেশি-চ্যাপ্টা-হয়ে-যাওয়া আকারটা বজায় থাকত। তিনি হিসেব করে দেখালেন—পৃথিবীর যে বিশেষ আকার এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, বা, বলতে পারা যায়, পৃথিবীর যে বিশেষ আকার বজায় থেকে গেছে, যেখানে পৃথিবীর বিষুব-অঞ্চলের ব্যাসের চেয়ে মেরু-অঞ্চলের ব্যাস মাত্র ছাব্বিশ মাইল কম —তা সম্ভব যদি দশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর উপরিতল জমাট বেঁধে থাকে। দশ কোটি বছরের আগে জমাট বাঁধলে পৃথিবীর মেরু-অঞ্চলের ব্যাস বিষুব-অঞ্চলের ব্যাসের চেয়ে আরো অনেক কম হত, বা, পৃথিবী মেরু-অঞ্চলের দিকে আরো অনেক বেশি চ্যাপ্টা হত। সুতরাং পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের বেশি কিছুতেই নয়।

আগেই বলেছি, লর্ড কেল্ভিনের যুক্তি সে-যুগে অখণ্ডনীয় বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই বিশেষ যুক্তিতে একটি বিষয় ধরে নেওয়া হয়েছে—পৃথিবীর উপরিতল একবার জমাট বাঁধলে তার আর ভাঙাচোরা নেই। কিন্তু পরের যুগের গবেষণার ফলে জানা গেছে, কথাটা ঠিক নয়। পৃথিবীর উপরিতল বারবার বিপর্যস্ত হয়েছে ; কত মহাদেশ গড়ে উঠেছে, আবার তলিয়ে গেছে ; কতবার এগিয়ে এসেছে সমুদ্র, আবার পেছিয়ে গেছে ; কত পর্বত কতভাবে কতবার যে মাথা তুলেছে তার ঠিকঠিকানা নেই। এই পৃথিবীর ইতিহাসই হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন ভাঙাগড়ার ইতিহাস।

পৃথিবীর বয়স যে কয়েক-শো কোটি বছর হতেই পারে না, আরো অনেক কম, তা প্রমাণ করতে গিয়ে লর্ড কেল্ভিন দ্বিতীয় যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন তাও সে-যুগে কম জোরালো মনে হয়নি। তিনি বিশেষ এক পদ্ধতিতে সূর্যের বয়স হিসেব করেছিলেন। পৃথিবীর বয়স সূর্যের বয়সের বেশি কিছুতেই নয়। সুতরাং যদি প্রমাণ করা চলে যে আমাদের এই সূর্য অপেক্ষাকৃত নবীন, তবে পৃথিবীর প্রাচীনত্ব কিছুতেই বজায় থাকে না। লর্ড কেল্ভিন জোর দিয়ে বললেন যে সূর্য মোটামুটি ১০ কোটি বছর ধরে আলো ও উত্তাপ দিয়ে আসছে।

কি ভাবে প্রমাণ করেছিলেন তা আমাদের বিস্তৃতভাবে না জানলেও চলবে। লর্ড কেল্‌ভিনের মূল বক্তব্য ছিল এই : সূর্যের আলো ও উত্তাপ অনবরত খরচ হচ্ছে, তবুও সূর্যের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হচ্ছে না। কেন ? নিশ্চয়ই সূর্যের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রক্রিয়া চলছে যা থেকে আলো ও উত্তাপের অফুরন্ত যোগান আসে। এই প্রক্রিয়াটি কী ? লর্ড কেল্‌ভিন বললেন যে সূর্যের গ্যাসীয় পরিমণ্ডলটি একটু একটু করে সংকুচিত হচ্ছে এবং এই সংকোচন-প্রক্রিয়ার সাহায্যেই তৈরি হচ্ছে সূর্যের তেজ। পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ের ওপরে অনেক গবেষণা করেছেন। গ্যাসীয় পরিমণ্ডল সংকুচিত হলে কি-পরিমাণ তেজ তৈরি হতে পারে তার নির্ভুল হিসেব পাওয়া গেছে। এই হিসেব থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, সূর্যের বয়স পাঁচ কোটি বছরের বেশি কিছুতেই হতে পারে না।

কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিনের যুক্তির গলদ এই নয় যে তিনি হিসেবে ভুল করেছিলেন। তাঁর ভুলটা ছিল তত্ত্বগত। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে একথা কিছুতেই জানা সম্ভব ছিল না যে সূর্যের তেজের যোগান আসে পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে। এই প্রক্রিয়াটি এমনই যে প্রায় অনন্তকাল ধরে সূর্যের আলো ও উত্তাপের ভাণ্ডার অফুরন্ত থাকতে পারে। অর্থাৎ, যে ভিত্তিভূমির ওপরে দাঁড়িয়ে লর্ড কেল্‌ভিন প্রমাণ করেছিলেন, বয়সের দিক থেকে সূর্য অপেক্ষাকৃত নবীন—সেই ভিত্তিভূমিই ছিল ভুল।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে লর্ড কেল্‌ভিন তৃতীয় আরেকটি যুক্তি দেখিয়েছিলেন। এই যুক্তিও খুব সহজ ও স্পষ্ট। তিনি বললেন যে, ভূগর্ভে যতো নিচে নামা যায়, ততোই উত্তাপ বাড়ে। কতটা বাড়ে তাও জানা। প্রতি ৮০ ফুটে ১° সেন্টিগ্রেড হিসেবে। উত্তাপ কেন বাড়ে ? আমরা জানি, পৃথিবীর বাইরের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে কিন্তু ভেতরের দিকটা এখনো প্রচণ্ড রকমের উত্তপ্ত। ভেতরের এই প্রচণ্ড উত্তাপ স্তরে স্তরে ওপরে উঠে এসে শূন্যে মিলিয়ে

যায়। ধরে নেওয়া যাক যে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড যখন পুরোপুরি গলিত অবস্থায় ছিল তখন তার উত্তাপ ছিল ৪৫০০° সেন্টিগ্রেড। লর্ড কেল্‌ভিন হিসেব করে দেখালেন, এই ৪৫০০° সেন্টিগ্রেডের একটি গোলক ঠাণ্ডা হতে হতে বর্তমান অবস্থায় পোঁছতে কত বছর সময় লাগতে পারে। দেখা গেল, ১০ কোটি বছরের বেশি নয়।

লর্ড কেল্‌ভিনের তৃতীয় যুক্তিতেও গলদ রয়ে গেছে। তখনো পর্যন্ত কারও ধারণা ছিল না যে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড একদিকে যেমন ঠাণ্ডা হচ্ছে, তেমনি কোনো কোনো বিশেষ প্রক্রিয়ায় আবার উত্তপ্তও হচ্ছে। তেজস্ক্রিয়তার উল্লেখ এখানে করা চলে। তাছাড়া, পৃথিবীর অভ্যন্তরে এমন সব রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলতে পারে যা প্রচণ্ড উত্তাপ তৈরি করবে। সুতরাং যদি সরাসরি হিসেব করে বার করা হয় যে ৪৫০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপবিশিষ্ট একটি গোলক ঠাণ্ডা হতে কতটা সময় নেবে এবং যদি সিদ্ধান্ত করা হয় যে পৃথিবীর বয়স এই সময়ের চেয়ে বেশি কিছুতেই নয়—তাহলে ঠিক কথা বলা হয় না।

কিন্তু লর্ড কেল্‌ভিনের সময়ে তাঁর এই তিনটি যুক্তিকে খণ্ডন করার মতো উপকরণের অভাব ছিল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা দাঁড়াল এই যে পদার্থবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ভূ-বিজ্ঞানীদের বিশেষ কোনো যোগাযোগ রইল না। পদার্থবিজ্ঞানীরা ভাবলেন যে তাঁরা তাঁদের বক্তব্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছেন এবং ভূ-বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর বয়স যতো বেশি বলেই প্রচার করুন না কেন আসলে পৃথিবী তার চেয়েও নবীন। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদেরও নিজস্ব যুক্তি কিছু ছিল। তাঁরা সেইসব যুক্তিকেই আঁকড়ে ধরে রইলেন এবং প্রচার করলেন যে পৃথিবীর বয়স কয়েক-শো কোটি বছরের কম কিছুতেই নয়।

এবার ভূ-বিজ্ঞানীদের বক্তব্যের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হওয়া দরকার।

সমুদ্রের লবণতা

পৃথিবী যে বয়সের দিক থেকে অনেক বেশি প্রাচীন, পৃথিবীর বয়স যে

কয়েক-শো কোটি বছরের কম কিছুতেই নয়—ভূ-বিজ্ঞানীরা একথা দু-উপায়ে প্রমাণ করেছেন। একটি উপায় হচ্ছে, সমুদ্রের লবণতা কত বছরে কতটা বাড়ছে তার একটা হিসেব নেওয়া। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, সমুদ্রের নিচে কত বছরে কী পরিমাণ পলি থিতিয়ে পড়ে তার একটা হিসেব নেওয়া।

প্রথমে সমুদ্রের লবণতার ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে সমুদ্র। আমরা সবাই জানি, সমুদ্রের জল লোনা। প্রশ্ন উঠতে পারে, সমুদ্রের জলে এত নুন এল কোত্থেকে? নদীর জল মিষ্টি অথচ সমুদ্রের জল লোনা—এমন ব্যাপার কি করে সম্ভব হল? শুনলে অবাক হতে হবে যে নদীর মিষ্টি জল-ই সমুদ্রের সমস্ত নুন বয়ে এনেছে। সমুদ্রের জল একদিনে আচমকা লোনা হয়ে যায়নি। এক সময়ে সমুদ্রের জলও নিশ্চয়ই মিষ্টি ছিল। তারপর একটু একটু করে নদীর জলের সঙ্গে নুন এসে পড়েছে সমুদ্রের জলে। একটু একটু করে সমুদ্রের জল লোনা হয়েছে। সূর্যের তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায় কিন্তু নুনের পরিমাণ যেমন থাকার তেমনি থাকে। সেই বাষ্প মেঘ হয়ে বাতাসে ভেসে আসে। বৃষ্টি হয়ে ঝড়ে পড়ে। পাহাড়ের গা বেয়ে, মাটির ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে, জমি ধুয়ে, পাথর ক্ষইয়ে বৃষ্টির জল এসে পড়ে নদীতে। সঙ্গে নিয়ে আসে মস্ত এক আবর্জনার সঞ্চয়। সেই আবর্জনার কিছুটা জলের সঙ্গে মিশে যায়, কিছুটা মেশে না। যেটুকু মিশে যায় তার মধ্যে আছে নুন, যেটুকু মেশে না তা নদীর জলকে ঘোলাটে করে তোলে। এসব আবর্জনার প্রায় সবটাই শেষ পর্যন্ত এসে পড়ে সমুদ্রের জলে। নুনের ভাগ সমুদ্রের জলকে আরো লোনা করে তোলে। আর আবর্জনার যে অংশটুকু জলের সঙ্গে মিশতে পারেনি, জলকে ঘোলাটে করে তুলেছিল, তা সমুদ্রে এসে পড়ার পর আস্তে আস্তে থিতিয়ে পড়ে, তৈরি হয় নতুন এক পলিস্তর—যার শিলীভূত রূপকে আমরা নাম দিয়েছি পাললিক শিলা।

এইভাবে দিনের পর দিন সমুদ্রের জলে নুনের ভাগ বেড়েই চলে। দিনের পর দিন সমুদ্রের জল আরো বেশি লোনা হয়।

এবার যদি একটা হিসেব নেওয়া যায়, পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে কী পরিমাণ নুন আছে আর পৃথিবীর সমস্ত নদীপথে প্রতি বছরে কী পরিমাণ নুন এসে সমুদ্রের জলে মিশছে, তাহলে প্রথম সংখ্যাটিকে দ্বিতীয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে বেরিয়ে যায় সমুদ্রের জল কত বছর ধরে লোনা হচ্ছে। আমরা ধরে নিতে পারি, আমাদের এই পৃথিবীতে যখন থেকে সমুদ্র রয়েছে, তখন থেকেই সমুদ্রের জল লোনা হয়ে চলেছে। তার মানে, সমুদ্রের জল কত বছর ধরে লোনা হয়েছে জানতে পারলেই জানা হয়ে যায় পৃথিবীতে কত বছর ধরে সমুদ্র রয়েছে। অর্থাৎ, সমুদ্রের বয়স।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে বলেছেন, পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রের মোট জলের পরিমাণ প্রায় ১,৫০,০০,০০,০০০ ঘন-কিলোমিটার। বর্তমানে সমুদ্রের জলে নুনের ভাগ শতকরা ৩ ভাগ। অর্থাৎ বর্তমানে সমুদ্রের নুনের পরিমাণ চারশো-কোটি কোটি টনেরও বেশি। চারশো-কোটি কোটি সংখ্যাটিকে কাগজে-কলমে লিখতে হলে ৪ সংখ্যাটির পরে ১৬টি শূন্য বসাতে হবে। প্রতি বছর পৃথিবীর সমস্ত নদীপথে প্রায় ৪০ কোটি টন নুন এসে সমুদ্রের জলে মিশছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে বর্তমানে যে-পরিমাণ নুন প্রতি বছর সমুদ্রের জলে এসে মিশছে, অতীতে বরাবরই সেই পরিমাণ নুন এসে সমুদ্রের জলে মিশেছিল— তাহলে সমুদ্রের বয়স দাঁড়ায় দশ কোটি বছর।

কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে যে-ব্যাপারটিকে ধরে নেওয়া হয়েছে সেখানেই কিছুটা গণ্ডগোল থেকে গেছে। অতীতে বরাবর সমান পরিমাণ নুন সমুদ্রের জলে মেশেনি কারণ অতীতে বরাবর ভূপৃষ্ঠের চেহারা একই রকম ছিল না। অধিকাংশ সময়েই ভূপৃষ্ঠ ছিল সমতল এবং পৃথিবীর অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ছিল অগভীর সমুদ্র। মাঝে মাঝে পাহাড়-পর্বত-মালভূমি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আবার স্বাভাবিক নিয়মেই ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে। সুতরাং, অনায়াসে কল্পনা

করে নেওয়া চলে, ভূপৃষ্ঠ যদি সমতল অবস্থায় থাকে তাহলে নদীর স্রোতের তীব্রতা কমে যায় এবং নদীবাহিত নুনের পরিমাণও যায় কমে। তাছাড়া, যখনই সমুদ্রের জল থেকে কোনো জমি ঠেলে উঠেছে, তখনই সেই জমির সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণ নুনও জল ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে ডাঙায়। পরে নদীর জলের সঙ্গে সেই নুনই আবার গিয়ে মিশেছে সমুদ্রের জলে।

এসব ব্যাপার হিসেবের মধ্যে ধরে নিলে মোটামুটি বলা চলে সমুদ্রের বয়স একশো কোটি বা দেড়শো কোটি বছর।

সমুদ্র তৈরি হবার আগেও নিশ্চয়ই এই পৃথিবীর অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তখন পৃথিবী এতবেশি উত্তপ্ত ছিল যে সমস্ত জল বাষ্প হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াত। তারপর পৃথিবী ক্রমে ঠাণ্ডা হয়েছে, ক্রমে সমস্ত বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়েছে নবীন পৃথিবীর গায়ে, সমস্ত নিচু জমি ভরাট হয়ে গিয়ে তৈরি হয়েছে এক বিপুল সমুদ্র।

যাই হোক, আমরা আলোচনা করছিলাম—ভূ-বিজ্ঞানীরা কি কি উপায়ে পৃথিবীর বয়স ঠিক করেছিলেন। প্রথম উপায়টি জানা গেল। এবার দ্বিতীয় উপায়ের আলোচনায় আসা যাক।

থিতিয়ে পড়া পলি

দ্বিতীয় উপায়টি প্রথম উপায়ের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। প্রথমে হিসেব করতে হবে, নদীর জল বা হিমবাহ ইত্যাদির সঙ্গে কী পরিমাণ মাটি প্রতি বছর সমুদ্রের জলে এসে পড়ছে। যেমন, হিসেব করে দেখা গেছে, টেম্‌স্‌ নদীর জলের সঙ্গে প্রতি বছর ১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ টন মাটি সমুদ্রের জলে পড়ে। এভাবে হিসেব করতে হবে, পৃথিবীর সমস্ত নদীপথে কী পরিমাণ মাটি আসে। এই মাটি সমুদ্রের জলে এসে পড়ার পর শেষ পর্যন্ত থিতিয়ে পড়ে এবং শিলীভূত হয়। আমরা এই বিশেষ ধরনের শিলার নাম দিয়েছি পাললিক শিলা। ৭০ মাইল গভীর পাললিক শিলার স্তরও পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং, পাকাপাকি হিসেবটা যাই হোক, পৃথিবীর বয়স

যে বৈজ্ঞানিক কেল্‌ভিনের হিসেবের চেয়ে অনেক বেশি—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

অবশ্য তখনো পর্যন্ত এই দুটি হিসেবের মধ্যে কোনোটির সাহায্যেই পৃথিবীর বয়স সঠিকভাবে নির্ধারিত করা যায়নি। দুই হিসেবের মধ্যেই অনেক কিছু অনুমান করে নিতে হয়, অনেক বড়ো বড়ো ফাঁক থাকার সম্ভাবনাকে মেনে নিতে হয়।

পরে, উনিশ শতকের শেষ দিকে নতুন এক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায় পৃথিবীর বয়সের নির্ভুল এক মাপ। নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে পৃথিবীর বয়স অন্তত কয়েক-শো কোটি বছর।

এই নতুন পদ্ধতিটি পদার্থবিজ্ঞানের অবদান। এর নাম—তেজস্ক্রিয়তা।

তেজস্ক্রিয়তা

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে কি-ভাবে পৃথিবীর বয়স ঠিক করা হয়েছে তা আলোচনা করবার আগে জানতে হবে—তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপারটা কী।

আবার তেজস্ক্রিয়তা বুঝতে হলে প্রথমে বস্তুর গড়ন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করে নিতে হবে।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, দুই বা ততোধিক পরমাণু যুক্ত হয়ে বস্তুর রূপ নেয়। যেমন, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্‌সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয় জলের একটি অণু। একটি কার্বন পরমাণু ও দুটি অক্‌সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে তৈরি হয় কার্বন ডাই-অক্‌সাইড। অর্থাৎ, পরমাণুই হচ্ছে বস্তুর শেষ কথা। পরমাণুর চেয়ে ছোট কিছু নেই। পরমাণু অবিভাজ্য।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষ দিকে নানা ব্যাপার দেখে বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জাগতে লাগল যে বস্তুর গড়ন এতটা সরল নয়।

কথাটাকে বোঝাবার জন্যে খুব সহজ একটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

একটা কাঁচের নলের মধ্যে খুব অল্প চাপে খানিকটা গ্যাস ভরা হল। এবার কাঁচের নলের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ-চলাচলের ব্যবস্থা করতে পারলে অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানা দেখা যাবে। নলের ভেতরকার গ্যাসের চাপ যদি খুবই কমিয়ে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাবে—কতকগুলো আগুনের কণা যেন নেগেটিভ দিক থেকে পজিটিভ দিকে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। এত দ্রুত ছুটছে যে সব মিলিয়ে নীল একটা শিখার মতো মনে হবে। এই আগুনের কণাগুলোর নাম দেওয়া হল 'ইলেকট্রন'। দেখা গেল, ইলেকট্রন বৈদ্যুতিক ধর্মের দিক থেকে নেগেটিভ ; আর কাঁচের নলের ভেতরে যে-কোনো গ্যাস ব্যবহার করা হোক না কেন, বিদ্যুৎ চলাচলের জন্যে কাঁচের নলের দু-প্রান্তে যে-কোনো ধাতুর পাত থাকুক না কেন—একই ধরনের ইলেকট্রন-প্রবাহ সৃষ্টি হবে।

বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে ইলেকট্রন হচ্ছে বস্তুরই অঙ্গ। অর্থাৎ, পরমাণু বস্তুর শেষ কণা নয়। পরমাণুর মধ্যেও আছে ইলেকট্রন। নলের ভেতরকার ইলেকট্রনগুলো গ্যাসের পরমাণু থেকেই বেরিয়ে এসেছে। আরো প্রমাণ পাওয়া গেল, ইলেকট্রন বেরিয়ে আসার পরে পরমাণু পজিটিভ হয়ে যায় এবং পজিটিভ পরমাণু কাঁচের নলের পজিটিভ দিক থেকে নেগেটিভ দিকে ছুটে চলে। এমনিভাবে কাঁচের নলের ভেতরে তৈরি হয় পজিটিভ পরমাণুর একটি প্রবাহ। আরো দেখা গেল, পজিটিভ পরমাণুর এই প্রবাহটিকে নড়ানো-চড়ানো যায়।

এই কাঁচের নলের মধ্যে ইলেকট্রন প্রবাহের আড়াআড়ি একটা ধাতুর পাত বসালে নলের ভেতর থেকে যে রশ্মি ঠিকরে বেরিয়ে আসে—তারই নাম রঞ্জন রশ্মি।

এই রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কারের সময়েই অন্য একটি ব্যাপারের দিকে বিজ্ঞানীদের নজর পড়ে। দেখা গেল, যে সব পদার্থে ইউরেনিয়াম

আছে, সেগুলো থেকে অদ্ভুত এক ধরনের রশ্মি বিকীরিত হয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানীরা উঠে-পড়ে লাগলেন এই অদ্ভুত বিকীরণের রহস্যভেদ করতে। বিশেষ করে দুজন বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনার ফলে শেষ পর্যন্ত এই রহস্যভেদ সম্ভব হয়েছিল। এ দুজন বিজ্ঞানী হচ্ছেন —পিয়ের ও মাদাম কুরী।

গবেষণার শুরুতেই মাদাম কুরী বুঝতে পেরেছিলেন যে এই অদ্ভুত রশ্মি বিকীরিত হচ্ছে পদার্থেরই ভেতরকার কোনো ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে। পরে মাদাম কুরী এই ক্রিয়াকাণ্ডের নাম দিয়েছিলেন— তেজস্ক্রিয়তা।

মাদাম কুরী প্রথমে গবেষণা শুরু করেছিলেন ইউরেনিয়াম নিয়ে। তিনি দেখলেন, ইউরেনিয়ামের পরিমাণ যতো বাড়ে, রশ্মি-বিকীরণের তীব্রতাও ততো বাড়ে। নানা পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে করতে তিনি টের পেলেন যে শুধু ইউরেনিয়াম নয়, থোরিয়াম থেকেও এই একই ধরনের রশ্মি বিকীরিত হয়। কতখানি ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থাকলে রশ্মি-বিকীরণের তীব্রতা কতখানি হতে পারে —তার একটা হিসেবও তিনি করে ফেললেন।

পরে, পীচ্ব্লেণ্ড নামে আলকাতরা জাতীয় একটি পদার্থ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তাঁকে ভীষণভাবে অবাক হতে হল। এতদিন জানা ছিল, এই বিশেষ পদার্থটির মধ্যে আছে ইউরেনিয়াম ও অক্সিজেন। নির্দিষ্ট পরিমাণের ইউরেনিয়াম থেকে নির্দিষ্ট তীব্রতার বিকীরণ সম্ভব। কিন্তু মাদাম কুরী দেখলেন এই বিশেষ পদার্থটির বিকীরণ হিসেব ছাড়িয়ে যাচ্ছে। তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে এই বিশেষ পদার্থটির মধ্যে ইউরেনিয়াম ছাড়াও নিশ্চয়ই আরো কিছু আছে যা তেজস্ক্রিয়—অর্থাৎ যা থেকে রশ্মি বিকীরিত হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মাদাম কুরী দুটি নতুন তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন। একটির নাম দিলেন পোলোনিয়াম, অপরটির নাম রেডিয়াম।

রেডিয়ামের আবিষ্কার পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী

ঘটনা। পরে রেডিয়াম নিয়ে বিপুল গবেষণা হয়েছে। জানা গিয়েছে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে তিন ধরনের রশ্মি বিকীরিত হতে পারে। এই তিন ধরনের রশ্মির নাম দেওয়া হয়েছে আল্‌ফা, বিটা, গামা—গ্রীক অক্ষরমালার প্রথম তিনটি অক্ষর।

এতদিন পর্যন্ত ধারণা ছিল, মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়। মধ্যযুগের আল্‌কেমিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করেও লোহাকে সোনা করতে পারেনি। কিন্তু তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাবার পরে মেনে নিতে হল, তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু অনবরত রূপান্তরিত হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠছে একেবারে নতুন ধরনের পরমাণু। ব্যাপারটা ঘটছে আপনা থেকেই, অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তার ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে।

বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার ফলে এই রূপান্তর-প্রক্রিয়াটির পুরো চেহারা শেষ পর্যন্ত জানা গিয়েছে। সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম থেকে যদি শুরু করা যায়, তবে দেখা যাবে, ইউরেনিয়াম চেহারা পাল্‌টাতে পাল্‌টাতে শেষ পর্যন্ত হয়ে গেছে সীসে। এই চেহারা-পাল্‌টানোর পুরো ছবিটা একটা ছক কেটে তুলে ধরছি।

ইউরেনিয়ামের রূপান্তর

	রশ্মি বিকীরণ	নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পরিমাণ রূপান্তরিত হতে কত সময় লাগে
ইউরেনিয়াম I	আল্‌ফা	৪৫০ কোটি বছর
ইউরেনিয়াম X_1	বিটা	২৪ দিন
ইউরেনিয়াম X_2	বিটা	১$\frac{1}{৫}$ মিনিট
ইউরেনিয়াম II	আল্‌ফা	৩,৪০,০০০ বছর
আয়োনিয়াম	আল্‌ফা	৮২,০০০ বছর
রেডিয়াম	আল্‌ফা, বিটা, গামা	১,৬০০ বছর
র‍্যাডন	আল্‌ফা	৩$\frac{৩}{৪}$ দিন

রেডিয়াম A	আল্‌ফা	৩ মিনিট
রেডিয়াম B	বিটা, গামা	২৭ মিনিট
রেডিয়াম C	বিটা, গামা	২০ মিনিট
রেডিয়াম C^1	আল্‌ফা	এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ
রেডিয়াম D	বিটা, গামা	২২ বছর
রেডিয়াম E	বিটা, গামা	৫ দিন
পোলোনিয়াম	আল্‌ফা	১৪০ দিন
সীসে	নিষ্ক্রিয়	

ওপরের ছকের প্রথম স্তম্ভে তাকালে বোঝা যাবে, ইউরেনিয়ামের সীসে হবার পর্বে পর্বে অন্য কোন্ কোন্ পদার্থের আবির্ভাব ঘটে। দ্বিতীয় স্তম্ভের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কোন্ পদার্থ থেকে কোন্ জাতের রশ্মি বিকীরিত হয়। তৃতীয় স্তম্ভের দিকে তাকালে বোঝা যাবে, কোন্ পদার্থের স্থায়িত্ব কত দিনের। এই তৃতীয় স্তম্ভের ওপরে লেখা আছে—নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্ধেক পরিমাণ রূপান্তরিত হতে কত সময় লাগে। কথাটার মানে হচ্ছে এই: যদি ধরে নেওয়া যায় যে গোড়ায় দু-কোটি ইউরেনিয়াম I পরমাণু ছিল, তাহলে এক-কোটি ইউরেনিয়াম I পরমাণু রূপান্তরিত হয়ে ইউরেনিয়াম X_1 হতে সময় লাগবে ৪৫০ কোটি বছর; বাকি এক-কোটি ইউরেনিয়াম I পরমাণু অপরিবর্তিত থেকে যাবে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে মূল যে কথাটি বুঝে নিতে হবে তা হচ্ছে এই: কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থই চিরস্থায়ী নয়, অনবরত রশ্মি বিকিরণ করতে করতে অনবরত রূপান্তরিত হয়; শেষ পর্যন্ত সেটি আর তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকে না, হয়ে ওঠে নিষ্ক্রিয় পদার্থ সীসে। এই রূপান্তরের প্রত্যেকটি পর্ব শেষ হতে নির্দিষ্ট সময় লাগে।

এবার আমাদের মূল আলোচনায় ফিরে আসা যেতে পারে।

তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে কি-ভাবে পৃথিবীর বয়সের মাপ পাওয়া যায়?

উপায়টা খুবই সহজ। এমন একটি শিলাখণ্ড নিতে হবে যার মধ্যে ইউরেনিয়াম আছে। তারপর হিসেব করতে হবে, সেই শিলাখণ্ডের মধ্যে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ কত এবং ইউরেনিয়াম থেকে রূপান্তরিত সীসের পরিমাণ কত। এই হিসেব থেকেই অনায়াসে বার করে নেওয়া চলে, শিলাখণ্ডের মধ্যে রূপান্তর-প্রক্রিয়া কত বছর ধরে চলেছে।

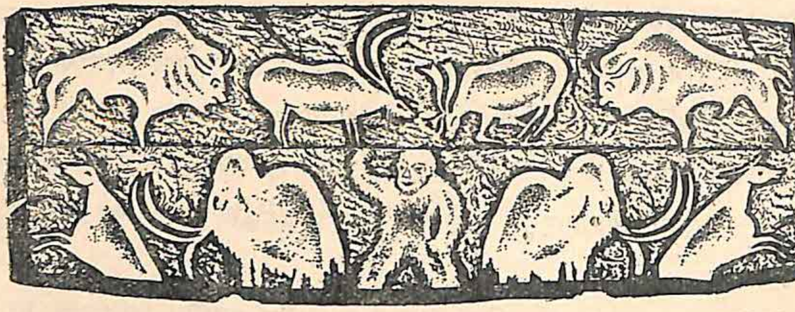
এই উপায়ে বয়সের মাপ নিতে গিয়ে সবচেয়ে প্রাচীন শিলাখণ্ড যা পাওয়া গিয়েছে তার বয়স ১৮৫ কোটি বছর।

তবে মনে রাখতে হবে, শিলাখণ্ডের বয়স আর পৃথিবীর বয়স কিছুতেই এক হতে পারে না। ভূপৃষ্ঠ জমাট বাঁধতে শুরু করার পরেই শিলাখণ্ড তৈরি হয়েছে। তার মানে, ভূপৃষ্ঠ জমাট বাঁধতে শুরু করার সময় থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর বয়স হচ্ছে ১৮৫ কোটি বছর। তার আগেও দীর্ঘ সময় পার হয়েছে গ্যাসীয় ও তরল অবস্থায়।

আবার, এমন শিলাখণ্ডও পাওয়া যেতে পারে যার বয়স ১৮৫ কোটি বছরেরও বেশি।

সুতরাং শিলাখণ্ডের বয়স যেখানে ১৮৫ কোটি বছর, সেখানে পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে ২০০ কোটি বছর। কিংবা তার চেয়েও অনেক বেশি। ৩০০ কোটি বছর বা তারও বেশি হবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর বয়স চারশো কোটি থেকে পাঁচশো কোটি বছরের মধ্যে।



পৃথিবীর উপগ্রহ

একদা পরমমূল্য জন্মক্ষণ দিয়েছে তোমায়,
আগন্তুক। রূপের দুর্লভ সত্তা লভিয়া বসেছ
সূর্যনক্ষত্রের সাথে। দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্য-ডোরে দ্যুলোকের সাথে···

সৌরমণ্ডলের ন-টি গ্রহের মধ্যে সাতটি গ্রহেরই উপগ্রহ আছে। পৃথিবীর উপগ্রহ মাত্র একটি—চন্দ্র।

চন্দ্র সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার কথাটা এই যে চন্দ্রের মতো এতবড়ো উপগ্রহ অন্য কোনো গ্রহের নেই। চন্দ্র পৃথিবীর চেয়ে মাত্র বিরাশি ভাগ ছোট। সৌরমণ্ডলে অন্যান্য যে-সব গ্রহের উপগ্রহ আছে তারা প্রত্যেকেই তাদের গ্রহের চেয়ে হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ ভাগ ছোট। এই কারণেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করেন যে পৃথিবী ও চন্দ্রকে যুগল-গ্রহ হিসেবে গণ্য করা উচিত। সে যাই হোক, বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে একমত যে চন্দ্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যেই চন্দ্রের উৎপত্তিকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখনো পর্যন্ত এ-বিষয়ে কোনো সর্বগ্রাহ্য তত্ত্ব পাওয়া যায়নি। শুধু বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্যে আমরা এখানে একটি তত্ত্বকে বিস্তৃতভাবে তুলে ধরছি। জর্জ গ্যামোর 'বায়োগ্রাফি অফ দি আর্থ' বই থেকে এই তত্ত্বটি নেওয়া হয়েছে।

এই তত্ত্ব অনুসারে, পৃথিবীর তরল অবস্থায় সূর্যের টানে পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ড প্রথমে লম্বাটে হয়ে যায়, তারপরে এই লম্বাটে বস্তুপিণ্ডের সূর্যের দিকের প্রান্ত ফোড়ার মতো ফুলে ওঠে, শেষ পর্যন্ত এই ফুলে-ওঠা ফোড়াটুকু মূল বস্তুপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উপগ্রহ যদি এভাবে তৈরি হয় তাহলে উপগ্রহের আকার মূল গ্রহের তুলনায় নিতান্ত ছোট হয় না।

কিন্তু ব্যাপারটা যতো সহজে ব্যাখ্যা করা গেল বাস্তবে অতোটা সহজে ঘটে না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবী তরল অবস্থায় পৌঁছবার পরে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি আজকের মতোই ছিল। অর্থাৎ, আজকের দিনে সূর্যের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে যেমন জোয়ার জাগে, সে-যুগেও তরল পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে তেমনি জোয়ার জাগত। আমরা জানি আজকের পৃথিবীর সমুদ্রে যে জোয়ার জাগে তার মাত্র চারভাগের একভাগ সূর্যের টানে, বাকিটা চন্দ্রের টানে। আমরা যে-সময়ের কথা আলোচনা করছি তখনো চন্দ্রের উৎপত্তি হয়নি ; কাজেই পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ডে যা কিছু জোয়ার তার সবটাই সূর্যের টানে কাজেই সেই জোয়ার খুববেশি জোরালো হতে পারত না। তবুও সূর্যের টানে চন্দ্রের মতো এমন মস্ত একটি পিণ্ড পৃথিবীর গা থেকে খসল কি করে ? বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা দরকার।

বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্যে বিজ্ঞানীরা 'রেসোনান্স'-এর কথা বলেছেন। এই ইংরেজি শব্দটিকে বাংলায় আমরা বলব অনুক্রিয়া।

অনুক্রিয়া

অনুক্রিয়া বলতে আমরা কী বুঝব ?

একটি ছেলে দোলনায় দুলছে ; অপর একটি ছেলে দোলনাটিকে ঠেলা দিচ্ছে। এখন, এই ঠেলা দেবার ফলে দোলনা যে সব সময়ে আরো বেশি বেশি দুলবে—তা নাও হতে পারে। প্রত্যেকবারের ঠেলাতেই যদি দোল্‌নার দোলনকে বাড়িয়ে চলতে হয় তবে একটা নির্দিষ্ট সময়

পরে পরে ঠেলা দিতে হবে। যদি দেখা যায় যে সত্যিই দোলনার দোলন বেড়ে চলেছে তাহলে আমরা বলব, দোল্‌নার দোলনের সময়ের সঙ্গে ঠেলা দেওয়ার সময়ের সমতা রক্ষিত হয়েছে। এরই নাম অনুক্রিয়া। দোল্‌নার দোলনের সময় নির্ভর করে, দোল্‌নার দড়ি কতটা লম্বা তার ওপরে। দোলনের এই সময়ের নাম দোলনকাল (period)। প্রত্যেক বস্তুরই একটি নির্দিষ্ট দোলনকাল আছে। অনুক্রিয়ার আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে।

একটা কাঠের পুল এমনিতে হয়তো পঞ্চাশ টন ওজনেও ঠিক থাকে। কিন্তু এমনও হতে পারে, সেই কাঠের পুলের ওপর দিয়ে পঞ্চাশজন লোক মার্চ করে যেতেই কাঠের পুলটা ভেঙে পড়ল। এটা কি করে সম্ভব? সম্ভব অনুক্রিয়ার ফলে। পঞ্চাশজন লোক পুলের ওপর দিয়ে মার্চ করে চলার সময় পুলটা দুলতে শুরু করেছিল; সেই দোলনের একটা সময় আছে। আবার পঞ্চাশজন মানুষের পা একসঙ্গে ওঠা-নামা করছিল; তারও একটা সময় আছে। এই দুটি সময়ের মধ্যে যদি সমতা থাকে তাহলে পুলের দোলন ক্রমেই বেড়ে বেড়ে চলবে এবং এক সময়ে পুল ভেঙে পড়বে।

ঠিক এই একই রকমের ব্যাপার ঘটেছিল বলে চন্দ্রের উৎপত্তি।

সেই গোড়ার যুগে পৃথিবী চার ঘণ্টায় পুরো একটা পাক খেত। ওদিকে সূর্যের টানে পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ডের দুই বিপরীত দিকে জোয়ারের স্রোত উঠেছিল। চার ঘণ্টা সময়ের মধ্যে পৃথিবীর পুরো একটি পাক; সুতরাং এই সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকের দুটি জোয়ারের স্রোত পৃথিবীকে পুরো একবার পাক খেয়েছিল। অর্থাৎ প্রতি দু-ঘণ্টা অন্তর জোয়ার-ভাঁটা চলেছিল।

আবার, হিসেব করে দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে যদি কোনো দোলন জাগে তবে দোলনকাল হবে দু-ঘণ্টা। ফলে, জোয়ার-ভাঁটার সময়ের সঙ্গে দোলনকালের সমতা এসে গেল। তার মানে সে-সময়ে সূর্যের টানে পৃথিবীর জোয়ার-ভাঁটায় অনুক্রিয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছিল।

বাকিটা কল্পনা করে নিতে হবে। যেহেতু অনুক্রিয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে, সুতরাং পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ডে জোয়ারের স্রোত ক্রমেই বেশি বেশি উঁচু হয়ে উঠবে। উঁচু হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা হবে যে সেই উঁচু-হয়ে-ওঠা বস্তুপিণ্ডকে ধরে রাখবার ক্ষমতা পৃথিবীর আর থাকবে না। পৃথিবীর টান ছিঁড়ে সেই বস্তুপিণ্ডটি মহাশূন্যে পাড়ি দেবে।

এই ছিঁড়ে-যাওয়া বস্তুপিণ্ডটিই হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্র।

এই তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিচ্ছেদের ব্যাপারটি যখন ঘটেছিল তখন তরল বস্তুপিণ্ডের উপরিতলে খুব পাতলা একটা আস্তরণও পড়ে গিয়েছিল। একথা মনে করবার কারণ কি?

কারণ, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই বিচ্ছেদের ক্ষতিচিহ্ন এখনো পৃথিবীর গায়ে রয়ে গিয়েছে। পৃথিবী যদি পুরাপুরি তরল অবস্থাতে থাকত তাহলে এই বিচ্ছেদের ক্ষতচিহ্নের ওপরে অতি সহজেই প্রলেপ পড়তে পারত। বস্তুপিণ্ড থেকে খানিকটা অংশ খাব্‌লে নিলেও কোনো গর্তের চিহ্ন থাকে না। পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ড থেকে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড খসে যাওয়ার পরেও বিচ্ছেদের চিহ্ন একইভাবে মুছে যেতে পারত। কিন্তু তা যায়নি।

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর গর্ত এখনো সেই প্রাচীন বিচ্ছেদের সাক্ষ্য বহন করছে।

কেন এই গর্ত সঙ্গে সঙ্গে ভরাট হয়নি?

কারণ, পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ডের উপরিতলে পাতলা আস্তরণ পড়ে গিয়েছিল। গর্তটি ভরাট হওয়া সম্ভব ছিল না।

চন্দ্রের উৎপত্তির এই তত্ত্ব এবং প্রশান্ত মহাসাগরের গহ্বরের এই ব্যাখ্যা সবাই মানেন না। অনেকেই ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন রুশ বিজ্ঞানী শ্মিট (Schmidt) সৌরমণ্ডলের উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন তাতে বলা হয়েছে যে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি একই সময়ে এবং একই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে। সৃষ্টির

আদিতে ধুলো ও গ্যাসের একটা মেঘ সূর্যকে ঘিরে পাক খাচ্ছিল। "ধুলোর কণাগুলোর মধ্যে অনবরত ঠোকাঠুকি হচ্ছিল, ফলে তাদের বেগ কমছিল আর গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে তারা জমাট বাঁধছিল। এই প্রক্রিয়াটি চলতে চলতেই সারা চাকতির মধ্যে ছোট-বড়ো অসংখ্য গ্রহাণু তৈরি হয়েছিল। এই গ্রহাণুগুলোর মধ্যেও আবার ঠোকাঠুকি চলতে থাকে। ফলে কতকগুলো গ্রহাণু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কতকগুলো হয়তো আস্তো থাকে। তারপরেও নতুন নতুন ধুলোর কণা এসে জমতে থাকে ছোট-বড়ো টুকরোগুলোর গায়ে। এই ছড়ানো-ছিটানো ছোট-বড়ো টুকরোগুলোই নানাভাবে চেহারা পালটাতে পালটাতে শেষ পর্যন্ত গ্রহ-উপগ্রহ-উল্কাপিণ্ড-ধূমকেতু হয়ে দেখা দিয়েছে।"*

সূর্যের টানে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড থেকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়ে চন্দ্রের উৎপত্তি—এই ব্যাখ্যা যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ডে কি-কি উপকরণ আছে সে সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা চলে।

আমাদের এই পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড স্তরে স্তরে বিভক্ত। ভারী পদার্থগুলো রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, হালকা পদার্থগুলো রয়েছে পৃথিবীর উপরিতলের দিকে। ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে প্রধান স্তরবিভাগ তিনটি। পৃথিবীর উপরিতলের স্তরটিকে বলা হয় গ্রানাইট স্তর। জলের ঘনত্বকে যদি একক ধরা হয় তবে এই স্তরের ঘনত্ব ২·৭। এই স্তরের গভীরতা মোটামুটি ৫০ কিলোমিটার। গ্রানাইট স্তরের নিচেই রয়েছে আরো ভারী পদার্থের একটি স্তর—ব্যাসল্ট। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে এই পদার্থটি বেরিয়ে আসে। এই ব্যাসল্ট স্তরটি প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার গভীর। আরও নিচে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় স্তর। এই স্তরটি তরল অবস্থায় আছে এবং লোহা ও অন্যান্য ভারী ধাতু রয়েছে এই স্তরে। এই স্তরের ঘনত্ব দশ বা তারও বেশি।

---

* মহাকাশের ঠিকানা—পৃঃ ৬০

অর্থাৎ পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে ভারী পদার্থগুলো জড়ো হয়েছে কেন্দ্রের দিকে, হাল্‌কা পদার্থগুলো উপরিতলের দিকে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড যখন তরল অবস্থায় ছিল তখনই এ-ধরনের স্তরবিন্যাস সম্ভব হয়েছিল। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড একবার জমাট বেঁধে যাবার পরে এ-ব্যাপার আর কিছুতেই সম্ভব নয়। কারণ সে-অবস্থায় পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের কোনো পদার্থই আর নড়াচড়া করতে পারে না।

পৃথিবীর কেন্দ্রে অনেকখানি জায়গা জুড়ে লোহা ও অন্যান্য ভারী পদার্থ আছে—সবই তরল অবস্থায়—একথা বিজ্ঞানীরা নানাভাবে প্রমাণ করেছেন। সে-আলোচনায় আমরা পরে আসব। তবে শুধু ঘনত্বের হিসেবটা মনে রাখলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব অনেক বেশি। কারণ, হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে সব মিলিয়ে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের ঘনত্ব হচ্ছে ৫·৫; অথচ আমরা জানি পৃথিবীর উপরিতলের গ্রানাইট স্তরের ঘনত্ব মাত্র ২·৭; কাজেই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব নিশ্চয়ই অনেক বেশি—নইলে সব মিলিয়ে পৃথিবীর ঘনত্ব কিছুতেই ৫·৫ হতে পারে না।

পৃথিবীর গড়ন সম্পর্কে এই ধারণাটুকু হবার পরে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা চলে। সূর্যের টানে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের খানিকটা অংশ ফোড়ার মতো ফুলে উঠে ছিট্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল —চন্দ্রের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যা যদি ঠিক হয়, তবে এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত টানা চলে। চন্দ্রের বস্তুপিণ্ডের বেশির ভাগটাই হবে পৃথিবীর ওপরের স্তর গ্রানাইট ও মাঝের স্তর ব্যাসল্ট। কেন্দ্রীয় স্তরের ভারী পদার্থ চন্দ্রের বস্তুপিণ্ডে খুব কমই যেতে পেরেছে।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে জোরালো সমর্থন পাওয়া গেছে ঘনত্বের হিসেব থেকে। চন্দ্রের ঘনত্ব হচ্ছে ৩·৩; যে বস্তুপিণ্ডের বেশির ভাগটাই হচ্ছে গ্রানাইট ও ব্যাসল্ট তার ঘনত্ব এ-রকমটিই হওয়া উচিত।

চন্দ্রের অপসরণ

বিজ্ঞানীরা বলেন যে গোড়ার দিকে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ছিল আট-হাজার মাইল। তারপর কয়েক-শো কোটি বছরে চন্দ্র পৃথিবী থেকে একটু একটু করে দূরে সরে গেছে। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে বিষয়টির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ওপরে খানিকটা জোর দিতে চাই।

পৃথিবী চন্দ্রকে টানছে, চন্দ্র পৃথিবীকে টানছে। এই টানাটানির মোট ফল হিসেবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

একবার ঘুরতে শুরু করার পরে চন্দ্র সেই একই বেগে এবং একই কক্ষে অনন্তকাল ধরে ঘুরে চলবে কিনা—তা কিন্তু অনেকগুলো বিষয়ের ওপরে নির্ভর করে। সবচেয়ে বেশি নির্ভর করে পৃথিবীর ভর ও বেগ এবং চন্দ্রের ভর ও বেগের ওপরে। এগুলো ঠিক থাকলে গোটা ব্যবস্থা ঠিক থাকে, এগুলোর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ঘটলে গোটা ব্যবস্থা পাল্‌টে যায়। কি-ভাবে পাল্‌টাবে, কোথায় পাল্‌টাবে কতখানি পাল্‌টাবে—সে-সব সূক্ষ্ম হিসেবের মধ্যে আমাদের না গেলেও চলবে। শুধু এটুকু মনে রাখা দরকার—কোনো কারণে যদি পৃথিবীর বেগ পালটে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রের বেগও পাল্‌টায় ; ফলে চন্দ্র আরো দূরে চলে যায় বা কাছে সরে আসে।

চন্দ্রের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা ওঠে, পৃথিবীর দুই বিপরীত দিকের দুটি স্রোত পৃথিবীর চারদিকে পাক খেয়ে চলে ; এই স্রোতের ঘর্ষণে বিলম্বিত হয় পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ ; ফলে চন্দ্রের বেগ যায় বেড়ে এবং চন্দ্র আরো দূরে সরে যায়—এসব কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। গোড়ার দিকে পৃথিবী পাক খেত চার ঘণ্টায় একবার, এখন পাক খাচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার। গোড়ার দিকে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব ছিল আট-হাজার মাইল, এখন প্রায় আড়াই-লক্ষ মাইল।

আগেও বলছি, আবারও বলছি, প্রতি একলক্ষ-কুড়িহাজার বছরে

পৃথিবীর দিন এক সেকেণ্ড হিসেবে বড়ো হচ্ছে। প্রতি বছরে চন্দ্র পাঁচ-ইঞ্চি হিসেবে দূরে সরে যাচ্ছে।

এই দূরে সরে যাবার একটা সীমানা আছে। সেই সীমানায় পৌঁছে চন্দ্র আবার কাছে আসতে শুরু করবে। সে-আলোচনায় আমরা পরে আসব।

বিচ্ছেদের ক্ষতচিহ্ন

কুয়ো থেকে এক বালতি জল তুলে নিলে কুয়োর জলের উপরিতল সমতলই থেকে যায়—সেখানে কোনো গর্ত হয় না। কিন্তু এক চাঙড় বরফ থেকে খানিকটা অংশ কেটে তুলে নিলে সেখানে গর্ত থেকে যাবে। তেমনি পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড থেকে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার পরে গর্ত থাকবে কি থাকবে না তা নির্ভর করবে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের অবস্থার ওপরে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড যদি সে-সময়ে সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় থাকে, তাহলে গর্ত থাকবে না, জমাট বাঁধলে গর্ত থাকবে। আবার পুরোপুরি যদি জমাট বেঁধে যায়, তাহলে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড কিছুতেই ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারত না। এক্ষেত্রে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে জমাট ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি এমন এক অবস্থায় থাকতে হবে যাতে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়াটা অসম্ভব না হয়, আবার গর্ত ভরাট না হয়ে যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক, পৃথিবীর উপরিতলে কোথাও এমন একটা গর্ত পাওয়া যায় কিনা যা দেখে আমরা বলতে পারি, চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার ফলেই এই বিশেষ গর্তটি তৈরি হয়েছে।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, প্রশান্ত মহাসাগরের গহ্বর এই বিশেষ গর্ত।

প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর উপরিতলের তিনভাগের একভাগ জায়গা জুড়ে আছে। আকারে এই মহাসাগরটি প্রায় গোল। শুধু এজন্যেই নয়, আরো একটি জোরালো যুক্তি আছে।

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সবচেয়ে বাইরের স্তর হচ্ছে গ্রানাইট। গ্রানাইটের নিচের স্তর—ব্যাসল্ট। ব্যাসল্ট-এর নিচের স্তর ভারী ধাতু—প্রধানত লোহা। প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের কেন্দ্রীয় ধাতু-স্তর এবং প্রায় ৩০০০ কিলোমিটার গভীর মাঝের ব্যাসল্ট-স্তর নিয়ে আপাতত আমরা মাথা ঘামাব না। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড থেকে এই দুটি স্তর কিছুতেই লোপাট হতে পারে না। কিন্তু একেবারে বাইরের দিকের গ্রানাইট স্তরটি সম্পর্কে একথা খাটে না। গ্রানাইট স্তর জায়গা বিশেষে গভীর, জায়গা বিশেষে পাতলা। মহাদেশের তলদেশে গ্রানাইট স্তর গভীর। মহাসাগরের তলদেশে গ্রানাইট স্তর পাতলা। কিন্তু গ্রানাইট স্তরের একেবারে চিহ্নমাত্র নেই এমন মহাসাগর পৃথিবীতে একটিমাত্রই আছে—তা হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগরটিতে অজস্র দ্বীপ ছড়ানো ছিটানো আছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোথাও গ্রানাইটের একটা টুকরোও পাওয়া যায়নি। মনে হতে পারে, একটা অদৃশ্য হাত এই বিশেষ এলাকা থেকে গ্রানাইটের শেষ চিহ্নটুকুও লোপাট করে নিয়ে গেছে। এই অদৃশ্য হাতটি হচ্ছে সূর্যের টান। চন্দ্রের বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে এই এলাকার সমস্ত গ্রানাইট মহাশূন্যে পাড়ি দিয়েছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের গহ্বরের অপর একটি বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এই মহাসমুদ্রের গহ্বরটিকে মালার মতো বেষ্টন করে আছে সারি সারি আগ্নেয়গিরি। সুতরাং মনে হতে পারে, এই বিশেষ গহ্বরটির আকারগত কোনো অদলবদল হয়নি। দূর অতীতেও যা ছিল এখনো তাই আছে।

এ-সমস্ত কারণেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী বেশ জোর দিয়েই বলেছেন যে প্রশান্ত মহাসাগরের গহ্বরই চন্দ্রের বস্তুপিণ্ডের আদি অবস্থান।

এই বিশেষ মতাবলম্বী বিজ্ঞানীরা আরো বলেছেন যে চন্দ্রের উৎপত্তি হবার মতো এমন একটি বিপর্যয় কাণ্ড ঘটেছিল বলেই ভূপৃষ্ঠে এত

বেশি ভৌগোলিক বৈচিত্র্য থাকা সম্ভব হয়েছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা যাক।

আগেই বলেছি, চন্দ্রের উৎপত্তির এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে ধরে নিতে হয় যে পৃথিবীর বাইরের দিকের গ্রানাইট স্তরে সে-সময়ে পাতলা একটা আস্তর জমাট বাঁধতে পেরেছিল– সেজন্যে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের গর্ত ভরাট হতে পারেনি। আবার, পৃথিবীর একদিকে যদি এতবড়ো একটা বিপর্যয় কাণ্ড চলে তবে তার ধাক্কা অপরদিকেও পৌঁছয়। ফলে, গ্রানাইটের জমাট-বাঁধা আস্তরে নানা জায়গায় ফাটল দেখা দিয়েছিল। এই ফাটলগুলো ক্রমেই বড়ো হয়েছে। এই ফাটলগুলোই হচ্ছে সাগর। আবার, এই ফাটলগুলো দেখা দিয়েছিল বলেই ভূপৃষ্ঠের ঠেলে-ওঠা অংশ এতগুলো টুকরো টুকরো মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে। নইলে, একথা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, এককালে সবকটি মহাদেশ অখণ্ড অবস্থায় ছিল।

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড যখন পুরোপুরি তরল অবস্থায় ছিল, তখন যদি চন্দ্রের উৎপত্তি হয়ে থাকত তাহলে চন্দ্রের বস্তুপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবার পরেও তরল বস্তুর স্বাভাবিক নিয়মেই গর্ত ভরাট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াত? পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হত ; ফলে সেই বস্তুপিণ্ডের বাইরে দিকে পুরোপুরি মসৃণ একটি আস্তর জমাট বেঁধে উঠত। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড ক্রমে ক্রমে আরো ঠাণ্ডা হত ; ফলে সমস্ত বাষ্প জলে হয়ে ঝরে পড়ত সেই মসৃণ আস্তরের ওপরে। তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বাইরের দিককার আস্তরে কোনো গর্ত বা ফাটল নেই ; কাজেই সমস্ত জল সমান পুরু একটা মোড়কের মতো পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডকে মুড়ে রেখে দিত। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড ক্রমে ক্রমে আরো ঠাণ্ডা হত ; ফলে সেই জমাট-বাঁধা আস্তরের কোনো কোনো অংশ উঁচু হয়ে উঠে ডাঙা তৈরি হত। কিন্তু সেই ডাঙার জমি আজকের মহাদেশের মতো এত বিচিত্র ও এত বিরাট কিছুতেই হতে পারত না, সারা ভূপৃষ্ঠে

ছোট ছোট দ্বীপের মতো তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত।

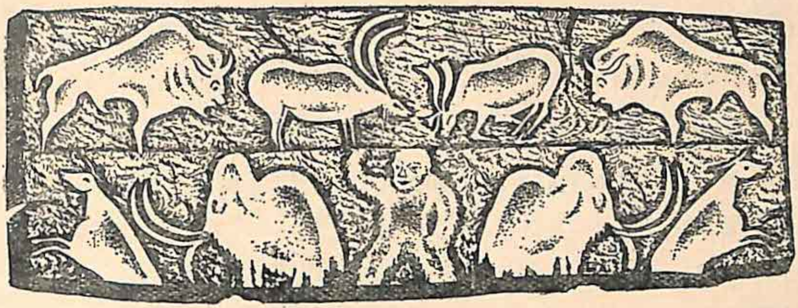
পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে একবার তাকিয়েই বলতে পারা যায় যে ব্যাপারটা তা হয়নি। অবশ্য মহাদেশগুলোকে আজকাল আমরা যে চেহারায় দেখছি, অতীতেও তাই ছিল—তা নিশ্চয়ই নয়। প্রত্যেকটি মহাদেশেই অজস্র আকৃতিগত অদলবদল ঘটেছে। তবে যতো অদলবদলই ঘটে থাকুক না কেন, যদি মনে করা হয় যে এককালের কতকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ থেকে মহাদেশগুলো গড়ে উঠেছে তবে তা হবে নিতান্তই কষ্টকল্পনা।

অন্যপক্ষের যুক্তিও প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা চলে। তাঁদের মতে, পৃথিবীর বাইরের দিকের আস্তরটি পুরোপুরি মসৃণভাবে জমাট বেঁধে উঠেছিল—তা ঠিক নয়। তখন থেকেই ভূপৃষ্ঠ ছিল অসমান—কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু। নিচু অংশগুলো হয়েছে সমুদ্রের গহ্বর, উঁচু অংশগুলো মহাদেশ।

উঁচু নিচু কেন হবে?

কারণ, পৃথিবীর উপরিতলের ঘনত্ব সর্বত্র সমান নয়; কোথাও বেশি কোথাও কম। যে জায়গার ঘনত্ব বেশি, সে-জায়গা মাধ্যাকর্ষণের টানে খানিকটা ডেবে যায়; যে-জায়গার ঘনত্ব কম, সে-জায়গা মাধ্যাকর্ষণের টানকে উপেক্ষা করে খানিকটা উঁচু হয়ে ওঠে। এভাবেই তৈরি হয়েছে সমুদ্র আর মহাদেশ। চন্দ্রের উৎপত্তি যেভাবেই হয়ে থাকুক না কেন, তার সঙ্গে পৃথিবীর সমুদ্র ও মহাদেশের বিশেষ-বিশেষ আকৃতি নিয়ে গড়ে ওঠার কোনো সম্পর্ক নেই।

সমুদ্র ও মহাদেশ নিয়ে পরে আবার আমরা আলোচনা করব। তার আগে পৃথিবীর গড়ন সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া দরকার।



পৃথিবীর গড়ন

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্রতরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,—

আমাদের এই পৃথিবীর আকার গোলকের মতো। গোলকটির ওপরে-নিচে খানিকটা চ্যাপ্‌টা, মাঝ-বরাবর খানিকটা ফুলে-ওঠা।* আমাদের কাজকর্ম চলাফেরা সবই এই গোলকের বাইরের খোলসের ওপরে। বাইরের দিকের এই খোলসটিকে বলা হয় ভূত্বক (crust of the earth)। ভূত্বকের কোথাও সমুদ্র, কোথাও পর্বত, কোথাও সমতল ভূমি। আর এই পৃথিবীকে মোড়কের মতো মুড়ে রেখেছে কয়েক-শো কিলোমিটার গভীর বায়ুমণ্ডল (atmosphere)।
ভূত্বকের কঠিন অংশকে বলা হয় অশ্মমণ্ডল, (lithosphere) আর জলীয় অংশকে বারিমণ্ডল (hydrosphere)।
পৃথিবীর অপর নাম ভূমণ্ডল। এই ভূমণ্ডলের বাইরের দিকের

* মার্কিন বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম-উপগ্রহ ভ্যানগার্ড-১ মারফত জানা গিয়েছে যে পৃথিবীর চেহারা অনেকটা পেয়ারা ফলের মতো। উত্তরমেরুর দিকে ৫০ ফুট ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, দক্ষিণমেরুর দিক ৫০ ফুট সেঁদিয়ে গিয়েছে। আর পৃথিবীর বিষুব-বেড় নাকি (অক্ষ-আবর্তন আছে এমন একটি বস্তুপিণ্ডের যতোটা হওয়া উচিত সে-তুলনায়) যথেষ্ট কম।

তিনটি মণ্ডল চোখের ওপরেই দেখা যাচ্ছে ; অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল।

অশ্মমণ্ডল মোটামুটি পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীর এবং প্রধানত গ্রানাইট শিলায় তৈরি। অশ্মমণ্ডলের নিচেও একাধিক মণ্ডল রয়েছে।

উত্তপ্ত অভ্যন্তর

কোনো খনি বা কূপের ভেতর দিয়ে যদি পৃথিবীর ভেতরের দিকে রওনা হওয়া যায়, তাহলে অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। যতোই নিচের দিকে নামা যাচ্ছে ততোই উত্তাপ বাড়ছে। অবশ্য জেনে রাখা ভালো যে পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খনি বা কূপ যা আছে তা পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের বেশি গভীর নয়। সুতরাং পৃথিবীর ভেতরের দিকে সশরীরে রওনা হয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটারের বেশি নিচে নামা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

অবশ্য সশরীরে না গিয়েও অন্যান্য নানা উপায়ে খবর সংগ্রহ করা যায়। বিজ্ঞানীরা তাই করেছেন।

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৪০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ভূত্বক থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৌঁছতে হলে প্রায় সাড়ে-ছয় কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে হবে। সাড়ে-ছয় কিলোমিটারের তুলনায় ছয় কিলোমিটার কিছুই নয়। কিন্তু এই ছয় কিলোমিটার রাস্তার শেষের দিকেই উত্তাপ এত বেড়ে যায় যে কোনো জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থায় টিকে থাকা সম্ভব নয় ; প্রচণ্ড উত্তাপে ঝল্‌সে যাবার মতো অবস্থা হয়ে ওঠে।

দক্ষিণ আফ্রিকার রবিনসন সোনার খনি পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর খনি। সেই খনির নিচে উত্তাপ এত বেশি যে দশ-লক্ষ ডলার খরচ করে তাপ-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। নইলে খনি-শ্রমিকরা জীবন্ত ঝল্‌সে যেত।

ভূত্বকের উপরিতলের চেহারা যা খুশি হতে পারে—মহাদেশ বা

মহাসমুদ্র, মরুভূমি বা জমাট বরফ, ইত্যাদি। কিন্তু ভূত্বকের নিচে যতোই ভেতরের দিকে যাওয়া যায় ততোই উত্তাপ বেড়ে চলে। অবশ্য ভূত্বকের ঠিক নিচেই উত্তাপ কিছুটা কমবেশি হতে পারে—যেমন, মরুভূমির ঠিক নিচেই উত্তাপ বেশি, বরফ-স্তূপের ঠিক নিচেই উত্তাপ অপেক্ষাকৃত কম—কিন্তু খানিকটা ভেতরের দিকে যাবার পরে উত্তাপের এই তারতম্য থাকে না। মোটামুটি দেখা গেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরের কোন্ জায়গা কতটা উত্তপ্ত হবে তা নির্ভর করে সেই বিশেষ জায়গা ভূত্বকের কতটা নিচে তার ওপরে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, ভূত্বকের নিচে প্রতি ৩৩ মিটারে এক-ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হিসেবে উত্তাপ বেড়ে চলে। প্রথম কয়েক-শো মিটার পর্যন্ত হয়তো এই হিসেবে খানিকটা গরমিল হতে পারে—কিন্তু কয়েক-শো মিটার পেরিয়ে যাবার পরে এই হিসেব পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় খাটে। অর্থাৎ, মরুভূমিই হোক বা মহাসমুদ্রই হোক বা তুষার অঞ্চলই হোক—ভূত্বকের নিচে কয়েক-শো মিটার পেরিয়ে যাবার পরে একই গভীরতায় একই উত্তাপ।

আমরা জানি, ভূত্বকের ওপরে উত্তাপ সর্বত্র সমান নয়। মেরু অঞ্চলের দিকে উত্তাপ কম, বিষুব অঞ্চলের দিকে উত্তাপ বেশি। এই কম-বেশি উত্তাপের গড় নিয়ে বলা চলে পৃথিবীর উত্তাপ মোটামুটি ২৮° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। এই উত্তাপে প্রাণীরা বেঁচে থাকতে পারে, জল বাষ্প হয় না এবং অধিকাংশ পদার্থ জমাট অবস্থায় থাকে। কিন্তু মাটির নিচে অবস্থাটা তা নয়। সেখানে উত্তাপ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। যতো বেশি নিচে যাওয়া যাবে, ততো বেশি উত্তাপ। হিসেব করে দেখা গেছে, প্রায় ২২০০ মিটার মাটির নিচে উত্তাপ এত বেশি যে জল বাষ্প হয়ে যায়। ফাটল পেলে এই বাষ্প অনেক সময়ে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে।

২২০০ মিটার মানে তিন কিলোমিটারও নয়। অথচ পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার। মাত্র তিন কিলোমিটারের মধ্যেই যদি এমন কাণ্ড ঘটতে পারে; তাহলে আরো কয়েক কিলোমিটার

নিচে নামতে পারলে কী ভীষণ উত্তাপ হবে—তা কল্পনা করা চলে। হিসেব করে দেখা গেছে, মাটির নিচে দশ কিলোমিটার নামতে পারলে উত্তাপ হবে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপের চেয়ে ৩০০° সে. বেশি। ৪০ কি. মি. নামতে পারলে উত্তাপ নিশ্চয়ই ১২০০° সে-এর মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

এই প্রচণ্ড উত্তাপে পাথর পর্যন্ত গলতে শুরু করে।

অর্থাৎ ভূত্বকের মাত্র ৪০ কি. মি. নিচে কোনো বস্তুই কঠিন অবস্থায় থাকতে পারে না। এ থেকে মনে হতে পারে পৃথিবীর অভ্যন্তর তরল অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের চাপও প্রচণ্ড। এই প্রচণ্ড চাপ পদার্থের গলনাঙ্ক (অর্থাৎ যে-বিশেষ উত্তাপে পদার্থ গলতে শুরু করে) অনেকখানি বেড়ে যায়। এই কারণেই আধুনিক বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বহুদূর পর্যন্ত পদার্থকে কঠিন অবস্থাতেই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো কারণে যদি ভূত্বকে গভীর ফাটল দেখা দেয় তাহলে সেই বিশেষ জায়গায় অভ্যন্তরের চাপ খুবই কমে যাবে এবং ফলে সমস্ত পদার্থই থাকবে গলিত অবস্থায়। আগ্নেয়গিরির গহ্বর দিয়ে এই গলিত পদার্থই বাইরে বেরিয়ে আসে। আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোতের উত্তাপ আর মাটির ৪০ কিলোমিটার নিচের উত্তাপ একই মাপের—অর্থাৎ ১২০০° সেন্টিগ্রেড।

৬৪০০ কিলোমিটারের মধ্যে মাত্র চল্লিশ কিলোমিটারেই এই অবস্থা! আরো নিচে আরো বেশি মাত্রার উত্তাপ। সেকালের মানুষরা কল্পনা করেছিল, পাতালে প্রবেশ করতে পারলে নরকে পৌঁছনো যায়। সেই নরকের চারদিকে আগুন জ্বলছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, আমাদের পায়ের তলায় মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার নিচেই এমনি আগুনের রাজ্য রয়েছে। সেই ভয়াবহ অগ্নিরাজ্যের সামান্য একটু আভাস মাত্র পাওয়া যায় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে। বাকিটুকু কল্পনা করে নিতে হবে। আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ সেই অগ্নিরাজ্যের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারেনি।

আর এ থেকে বোঝা যাবে, আমাদের পায়ের তলার যে মাটিকে এতবড়ো একটা আশ্রয় বলে আমরা মনে করি—তা নিতান্তই পলকা একটা ব্যাপার। কোথাও পঞ্চাশ কিলোমিটারের বেশি পুরু নয়। গোটা আপেলের তুলনায় আপেলের খোসা অনেক বেশি পুরু এর চেয়ে।

পুরো ছবিটা কল্পনা করলেও শিউরে উঠতে হবে। প্রায় তেরো হাজার কিলোমিটার ব্যাসের সুবিপুল এক অগ্নিরাজ্য। স্তরে স্তরে সাজানো উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড। আর তারই ওপরে নিতান্ত অসহায়ভাবে ভেসে আছে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার পুরু এক শিলাস্তর—যার নাম আমরা দিয়েছি ভূত্বক।

কঠিনে-কোমলে

ভূত্বকের মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার নিচের প্রচণ্ড উত্তাপের কথা আমরা বলেছি, যে-উত্তাপে সমস্ত পদার্থেরই তরল অবস্থায় থাকার কথা। কিন্তু প্রচণ্ড চাপের দরুন এই পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে না। পুরোপুরি কঠিনও নয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, নমনীয় কঠিন। একটা দৃষ্টান্ত দিলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কলকাতার রাস্তায় যে পীচ ঢালা হয় তা আমরা সবাই দেখেছি। এই পীচ এমনিতে ইটের মতো শক্ত—হাতুড়ির বাড়ি মারলে ইটের মতোই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু এক ড্রাম পীচ উপুড় করে রেখে দিলে দেখা যাবে, তরল বস্তুর মতো পীচ ড্রামের ভেতর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য ব্যাপারটা ঘটতে অনেকক্ষণ সময় লাগে—দু-এক ঘণ্টায় কিছু হবার নয়। কিন্তু যতো সময়ই লাগুক, শেষ পর্যন্ত তরল বস্তুর মতোই ড্রামের ভেতর থেকে পীচ গড়িয়ে পড়ে। অপর একটি দৃষ্টান্ত—মোমের পুতুল। ধরাছোঁয়ায় যেটুকু বোঝা যায় তাতে মার্বেলের পুতুলের সঙ্গে মোমের পুতুলের বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। কিন্তু একটা মোমের পুতুলকে মেঝের ওপরে ফেলে রেখে দীর্ঘ সময় পার হতে দিলে দেখা যাবে—পুতুলের চিহ্নমাত্র নেই, মস্ত একফোঁটা জলের

মতো খানিকটা মোম মেঝের ওপরে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি আরেকটি দৃষ্টান্ত—গালা।

অর্থাৎ, আমরা বলতে পারি, পৃথিবীর অভ্যন্তরের বস্তুপিণ্ড জাতের বিচারে তরল কিন্তু গুণাগুণের বিচারে নমনীয় কঠিন। বিজ্ঞানীরা বস্তুর তরল ও কঠিন অবস্থার জাত-বিচার করেন বস্তুর পরমাণুর বিন্যাসকে বিচার করে। কঠিন বস্তুর পরমাণু কখনো ছাড়া ছাড়া অবস্থায় থাকে না; কতকগুলো পরমাণু মিলে বিশেষ একটা প্যাটার্ন তৈরি করে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক, একটা খোলা মাঠে পাঁচশো ছেলে রয়েছে। এখন এই পাঁচশো-জন ছেলে যদি দশজন-দশজন হিসেবে পঞ্চাশটা দলে ভাগ হয়ে যায় এবং প্রত্যেক দলের দশজনে হাত-ধরাধরি করে বিশেষ একটা প্যাটার্ন তৈরি করে তাহলে যে ছবিটা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে বস্তুর কঠিন অবস্থার ছবি! একেক দলে দশজনেই থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই; যতোগুলো দলই হোক, প্রত্যেক দলে থাকবে সমান-সংখ্যক ছেলে। আসলে বিজ্ঞানীরা দলের সংখ্যা নিয়ে মাথা ঘামান না; তাঁরা শুধু দেখেন, কতজনে মিলে একটা দল হয়েছে এবং সেই দলের বিশেষ প্যাটার্নটা কী। আবার, সেই পাঁচশোজন ছেলে যদি যথেচ্ছ ঘুরে বেড়ায়, কারও সঙ্গে কারও কোনো সম্পর্ক না থাকে, যে যে-দিকে পারে ছুটে চলে—তাহলে যে ছবিটা পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে বস্তুর তরল অবস্থার ছবি। এবার সেই পাঁচশোজন ছেলেকে যদি খোলা মাঠ থেকে নিয়ে এসে বদ্ধ একটা ঘরের মধ্যে আটক করা যায়, তাহলে আর যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা কারও থাকে না, গায়ে গায়ে সেঁটে থাকতে হয় সবাইকে—এই হচ্ছে তরল বস্তুর নমনীয় কঠিন অবস্থা। মোট কথা, বস্তুর পরমাণু যতোক্ষণ পর্যন্ত না বিশেষ একটা প্যাটার্ন তৈরি করছে ততোক্ষণ বস্তুর তরল অবস্থা, কিন্তু প্রচণ্ড চাপে এই তরল বস্তুর চালচলনও কঠিন বস্তুর মতো হয়ে যেতে পারে।

মাটির তলায় পঞ্চাশ কিলোমিটার নিচে এমনি এক প্রচণ্ড চাপ

আছে। যে চাপে গলনাঙ্কের অনেক বেশি উত্তাপেও বস্তু তরল হয় না, নমনীয় কাঠিন্য লাভ করে। হিসেব করে দেখা গেছে, মাটির তলায় পঞ্চাশ কিলোমিটার নিচে এই শিলাস্তরের চাপ ২০,০০০ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান। ২০,০০০ বায়ুমণ্ডলের চাপ কথাটার মানে—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাটির ওপরে যতোখানি চাপ দেয় তার ২০,০০০ গুণ বেশি চাপ। বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৪·৭২ পাউণ্ড। কাজেই ২০,০০০ বায়ুমণ্ডলের চাপ যে কী প্রচণ্ড একটা ব্যাপার তা অনায়াসে কল্পনা করা চলে।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই: আমাদের পায়ের তলার শক্ত মাটি মাত্র ৪০-৫০ কিলোমিটার পুরু। এর সবটাই গ্রানাইট শিলার স্তর। তার নিচে ব্যাসল্ট। সবই আছে উত্তপ্ত এবং নমনীয় কঠিন অবস্থায়। ভূত্বকের কোথাও একটু ফাটল পেলে এই উত্তপ্ত বস্তুপিণ্ড স্রোতের মতো বেরিয়ে আসে। এই ফাটলের বাইরের দিকের মুখকেই আমরা বলি আগ্নেয়গিরি।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর মোট ব্যাসার্ধের প্রায় মাঝ-বরাবর পর্যন্ত, অর্থাৎ তিন-হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশি পর্যন্ত, বস্তুপিণ্ডের এমনি উত্তপ্ত ও নমনীয় কঠিন অবস্থা। আমরা আগেই বলেছি পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের মাঝের স্তর ব্যাসল্টের সীমানাও এই পর্যন্তই। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় স্তর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করবার আগে সমুদ্র ও মহাদেশ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করে নেওয়া থাক।

ভাসমান মহাদেশ

এই পৃথিবীর উপরিতলে যেমন আছে মহাদেশ, তেমনি মহাসমুদ্র। আবার, মহাদেশই হোক আর মহাসমুদ্রই হোক, বাসল্ট স্তরটি সব জায়গায় সমানভাবে রয়েছে। গ্রানাইট স্তর মহাদেশের এলাকায় পুরোপুরি। মহাসমুদ্রের এলাকায় কোথাও একেবারেই নেই, কোথাও খুবই পাতলা।

এই ছবিটি যদি স্পষ্ট হয়ে থাকে তবে এ থেকে আরেকটি ব্যাপারও

বোঝা যাবে। মহাদেশগুলোর চল্লিশ কিলোমিটার নিচে বস্তুপিণ্ড যদি তরল (নমনীয় কঠিন) উত্তপ্ত অবস্থায় থেকে থাকে, তবে বলতে হবে, মহাদেশগুলো ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। কথাটাকে আরো পরিষ্কার করা দরকার।

জলের ওপরে বরফের চাঁই—বা যাকে আমরা বলি হিমশৈল—ভাসে কেন ? ভাসে, কারণ বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে কম। তবে বরফের চাঁইটি জলের ওপরে পুরোপুরি গা উঠিয়ে ভাসে না ; তার অনেকখানি অংশ থাকে জলের ভেতরে, সামান্য একটু অংশ জেগে থাকে জলের ওপরে। কতখানি জলের ভেতরে থাকবে আর কতখানি জলের ওপরে থাকবে তারও একটা হিসেব আছে। হিসেবটি পাওয়া গেছে গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে। আর্কিমিডিসের সূত্রের মোট কথাটা হচ্ছে এই : কোনো বস্তু যখন জলে ডোবে, তখন সেই বস্তু সমান আয়তনের জল স্থানচ্যুত করে ; এই স্থানচ্যুত জলের যা ওজন, সেই ওজনটুকু বস্তুর ওজন থেকে বাদ দিলে যা বাকি থাকে, তাই হয় জলে ডোবা অবস্থায় বস্তুর ওজন। অর্থাৎ জলে-ডোবা অবস্থায় যে-কোনো বস্তু অনেকটা হাল্‌কা হয়ে যায়। আবার ব্যাপারটা যদি এই হয় যে, বস্তুটি পুরোপুরি ডোববার আগেই যতোখানি জল স্থানচ্যুত হয়েছে তার ওজন বস্তুর ওজনের সমান—তাহলে বস্তুটি আর ডুববে না, যতোখানি ডুবেছিল ততোখানি অংশ জলের ভেতরে ডুবিয়ে রেখেই ভাসতে শুরু করবে। এই নিয়ম যে-কোনো ভাসমান বস্তু সম্পর্কে খাটে।

লোহা জলে ভাসে না, তার কারণ লোহার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে এতবেশি যে লোহা পুরোপুরি ডুবে যাবার পরেও যতোখানি জল স্থানচ্যুত হয় তার ওজন লোহার ওজনের সমান হয় না। কিন্তু জাহাজের খোল জাহাজের পুরো কাঠামোটি সমেত জলে ভাসে, কারণ, জাহাজের খোল এমন একটা বিশেষ আকারে তৈরি করা হয় যাতে স্থানচ্যুত জলের ওজন জাহাজের ওজনের সমান হতে পারে।

এবার মহাদেশের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। মহাদেশগুলো আছে ভাসমান অবস্থায়, কাজেই আর্কিমিডিসের সূত্র এখানেও নিশ্চয়ই খাটবে। অর্থাৎ মহাদেশগুলোর পক্ষে পুরোপুরি গা ভাসিয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়; কিছুটা অংশ নিশ্চয়ই ডুবে থাকবে। কতখানি ডুববে? না, যতোক্ষণ না স্থানচ্যুত তরল ব্যাসল্টের ওজন কঠিন গ্রানাইটের ওজনের সমান হয় (এক্ষেত্রে তরল বস্তুটি হচ্ছে ব্যাসল্ট, ভাসমান কঠিন বস্তুটি হচ্ছে গ্রানাইট—একথা মনে রাখা দরকার)। গ্রানাইটের ঘনত্ব ২·৬৫, ব্যাসল্টের ঘনত্ব ২·৮৫; এ থেকে হিসেব করে দেখা গেছে, তরল ব্যাসল্টের ওপরে কঠিন গ্রানাইটের তৈরি মহাদেশগুলোকে যদি ভাসতে হয়, তাহলে মহাদেশগুলোর তেরো ভাগের বারো ভাগ থাকবে ডুবন্ত অবস্থায় এবং মাত্র একভাগ ওপরে জেগে থাকবে।

কিন্তু ভারসাম্যের এই অবস্থা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। পৃথিবী ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়েছে এবং একসময়ে আকাশের সমস্ত বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়েছে পৃথিবীর ওপরে এবং ভূত্বকের বড়ো বড়ো গর্তগুলো ভরে গিয়ে তৈরি হয়েছে মহাসমুদ্র। মহাসমুদ্রের বিপুল পরিমাণ জলের চাপও বিপুল। সেই বিপুল চাপে মহাসমুদ্রের তলদেশ আরো খানিকটা নিচে নেমে যায়; ফলে মহাদেশের তলদেশে চারদিক থেকে চাপ পড়ে এবং সেই চাপে মহাদেশ খানিকটা ওপরে উঠে আসে।

এই বিষয়ে আমরা পরে আবার আলোচনা করব। আপাতত এটুকু জেনে রাখা যাক যে ভূত্বকের ভারসাম্য এভাবে অনবরত টলে টলে উঠেছে। নানা কারণে ভূত্বকের কোথাও চাপ বাড়ে, কোথাও চাপ কমে—তারই ফলে ভূত্বককে অনবরত নড়েচড়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়। এমনি নাড়াচাড়ার ফলেই আকাশছোঁয়া পর্বত জেগে ওঠে, মাটির গায়ে গায়ে ঢেউয়ের মতো খাঁজ পড়ে, এবং আরো অজস্র পরিবর্তনের লীলা চলতে থাকে।

পৃথিবীর বাইরের দিকে রয়েছে মহাসমুদ্র ও মহাদেশ। সেখানে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। কোথাও আকাশছোঁয়া পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও উপত্যকা, আবার কোথাও বা আগ্নেয়গিরির রুদ্র তাণ্ডব। এরই মধ্যে আমাদের জীবননির্বাহ। এই মাটিতেই আমরা চাষ করি, এই মাটি খুঁড়েই আমরা কয়লা, তেল ও ধাতু তুলে আনি, এই মাটির ওপরেই আমরা কল-কারখানা গড়ি। মাটি আমাদের মা।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও কি আমরা কল্পনা করি যে পৃথিবীর বাইরের দিকের এই কঠিন আবরণটুকু কিছুই নয়! এই কঠিন আবরণের নিচে রয়েছে কয়েক হাজার কিলোমিটার গভীর উত্তপ্ত ও তরল বস্তুপিণ্ড। শুনলে অবাক হতে হবে যে এই উত্তপ্ত ও তরল বস্তুপিণ্ড আছে বলেই পৃথিবীর বাইরের দিক এত বৈচিত্র্যভরা। যেমন পুতুল নাচের আসরে পুতুলের নাচটাই আমাদের কাছে একটা বিস্ময়, আসরের অন্তরালে অদৃশ্য সুতোর টান আমাদের চোখে পড়ে না; তেমনি এই পৃথিবীর বিন্যাস ও ভঙ্গিমা দেখেই আমরা মুগ্ধ, কিন্তু এই বিন্যাস ও ভঙ্গিমার টান আসছে কোত্থেকে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়।

উনিশ শতকে ভূ-বিজ্ঞানীদের নজর ছিল পৃথিবীর বাইরের দিকের এই বিন্যাস ও ভঙ্গিমার দিকেই। যতোটুকু চোখে দেখা যায় ততোটুকুই ছিল তাঁদের গবেষণার এলাকা। তাঁদের গবেষণা ব্যর্থ হয়নি। অন্তত দুটি মূল বিষয়ের দিকে তাঁদের নজর পড়েছিল। প্রথমত তাঁরা বুঝেছিলেন যে পৃথিবীর ইতিহাস একহাজার-দু-হাজার বা একলক্ষ-দু-লক্ষ বছরের নয়—কোটি কোটি বছরের। দ্বিতীয়ত তাঁরা বুঝেছিলেন, পৃথিবীর বাইরের দিকে এই যে বৈচিত্র্য—কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও মরুভূমি, কোথাও সমুদ্র, কোথাও হিমালয়, কোথাও ভূমধ্যসাগর—এর রহস্য খুঁজতে হবে পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরে, যেখানে চোখের দৃষ্টি পৌঁছয় না।

বিশ শতকের ভূ-বিজ্ঞানীদের সবচেয়ে বড়ো কাজই হল, পৃথিবীর এই গভীর অভ্যন্তরকে উদ্ঘাটিত করা। কোন্ উপায়ে তা করা সম্ভব? চোখের দৃষ্টি সেখানে পৌঁছয় না, খনি বা কূপের গহ্বর সেই এলাকার ধারে-কাছেও আসেনি—তা হলে কোন্ বিশেষ দূতকে পাঠানো যেতে পারে সেই বিশেষ এলাকার খবর সংগ্রহ করবার জন্যে?

খবর বলতে কী ধরনের খবর তাও ভূ-বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। পৃথিবীর বাইরের দিকের যে অংশকে আমরা চোখের ওপরে দেখি তার নিচে কী আছে? কী ভাবে আছে? কোন্ শক্তিকে ধারণ করে আছে? ভূত্বক কি সব জায়গায় সমান মজবুত? নাকি, কোথাও কোথাও তা এত পল্‌কা যে অল্প চাপেই ডেবে যায় ও চারদিকে একটা স্পন্দন জাগিয়ে তোলে? এমনি আরো সব প্রশ্ন।

প্রশ্নগুলোর ধরন দেখে বোঝা যায়, এসব প্রশ্নের জবাব জানবার জন্যে ভূ-বিজ্ঞান ও পদার্থ-বিজ্ঞানকে হাত মিলোতে হয়েছিল। দেখা গেল একটি পরমাণুর মধ্যে যতো রহস্য আছে, দূরের কোনো নক্ষত্রের মধ্যেও তেমনি রহস্য এবং আমাদের এই অতি কাছের পৃথিবীর অভ্যন্তরের রহস্যও কিছু কম নয়। বিশ্বজোড়া এত রহস্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মানুষ কিন্তু বিহ্বল হয়নি; বিশ্ব-রহস্য উদ্ঘাটিত হবেই—এই বিশ্বাসে অবিচলিত ছিল।

চোখের দেখা ও হাতের নাগালের বাইরে রয়েছে যে এলাকা—সেই এলাকার খবর কে বয়ে আনবে? বয়ে আনবে তরঙ্গ, বয়ে আনবে কম্পন, বয়ে আনবে ছন্দোবদ্ধ গতি। অনেক দূরের নক্ষত্র থেকে ঢেউয়ের পর ঢেউ আসছে—আলোর ঢেউ, উত্তাপের ঢেউ, মহাজাগতিক রশ্মির ঢেউ। সেই ঢেউয়ের রেখায় রেখায় নক্ষত্রের খবর পাঠ করো। পরমাণুর অন্তর্লোকের খবর জানতে চাও তো পাঠাও একদল রশ্মি; বিপুল এক সৈন্যদলের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়ুক পরমাণুর দুর্গ-প্রাকারের ভেতরে। কোনো বস্তু কাঠিন্য লাভ করার পরে দানা বেঁধেছে; কি-ভাবে দানা বেঁধেছে সেই বিশেষ বিন্যাসটিকে জানতে

হবে ; হাতের কাছে মজুত আছে রঞ্জনরশ্মি—সেই অন্তর্ভেদী রশ্মির কাছে কিছুই অপ্রত্যক্ষ থাকবে না।

তেমনি পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরের খবর জানা চলে ঢেউয়ের কম্পন থেকে। ঢেউ আছে নানা মাপের। বস্তুর অন্তর্লোকের খবর সংগ্রহ করে আনে যে রঞ্জনরশ্মি—তার ঢেউ খুবই ছোট। দূর নক্ষত্রের খবর সংগ্রহ করে আনে যে আলোর ঢেউ, তা মাপে আরো একটু বড়ো। সমুদ্রের তলদেশের খবর সংগ্রহ করে আছে যে শব্দের ঢেউ—তা আরো বড়ো। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম শিখরের খবর সংগ্রহ করে আনে যে বেতার ঢেউ—তা আরো বড়ো। আর পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরের খবর সংগ্রহ করে আনবে যে ঢেউ—তা হবে আরো বড়ো।

এই সবচেয়ে বড়ো মাপের ঢেউয়ের উৎস কী? উৎস—ভূমিকম্প। ভূমিকম্প হচ্ছে মস্ত একটা হাতুড়ির ঘায়ের মতো ; সেই হাতুড়ির ঘায়ে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের স্তরে স্তরে ঢেউ জেগে ওঠে। আর এই ঢেউয়ের কম্পনে ধরা পড়ে পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তরের খবর।

ভূমিকম্পের ঢেউ দু-জাতের। একজাতের ঢেউ বস্তুকণাগুলোকে এমনভাবে নাড়া দিয়ে যায় যে তারা সামনে-পেছনে ছুটোছুটি শুরু



লম্বালম্বি ঢেউ



আড়াআড়ি ঢেউ

করে। অর্থাৎ ঢেউ যে পথ বরাবর চলে, সেই পথ বরাবরই বস্তু-কণাগুলোর কাঁপুনি শুরু হয়। সবটা মিলিয়ে দেখলে মনে হবে,

বস্তুকণাগুলো একেক জায়গায় গায়ে গায়ে লেগে যেতে চাইছে, একেক জায়গায় দূরে দূরে সরে যেতে চাইছে—কোথাও সংকুচিত, কোথাও প্রসারিত। একটা উপমা দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। মাটির ওপর দিয়ে যখন একটা কেঁচো চলে তখন কেঁচোর শরীরটা একেকবার কুঁচকে ছোট হয়, একেকবার ছড়িয়ে বড়ো হয়। এই বিশেষ জাতের ঢেউও তেমনি বস্তুকণাগুলোকে কোথাও কুঁচকে দেয়, কোথাও ছড়িয়ে দেয়; আবার পর মুহূর্তেই কুঁচকোনো জায়গাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়, ছড়ানো জায়গাগুলোকে কুঁচকে দেয়। এমনিভাবে চলতে থাকে ঢেউয়ের কম্পন। এই বিশেষ জাতের ঢেউকে আমরা বলব লম্বালম্বি ঢেউ বা দিঘল-তরঙ্গ (longitudinal waves)।

দ্বিতীয় জাতের ঢেউকে বলা যেতে পারে আড়াআড়ি ঢেউ বা আড়-তরঙ্গ (transversal waves)। এক্ষেত্রে বস্তুকণাগুলো ওপরে-নিচে ছুটোছুটি শুরু করে। এবারেও একটা উপমা দেওয়া চলে। একদল সৈন্য মার্চ করে চলেছে, সৈন্যদের পাগুলো কখনো ওপরে উঠছে, কখনো নিচে নামছে—কিন্তু চলাটা সামনের দিকে। তেমনি আড়াআড়ি ঢেউয়ের বেলাতেও বস্তুকণা কোথাও ওপরে ওঠে, কোথাও নিচে নামে—কিন্তু ঢেউ এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

একটা কথা কিন্তু বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। লম্বালম্বি ঢেউই হোক, আর আড়াআড়ি ঢেউই হোক—বস্তুকণাগুলি যে-জায়গার সে-জায়গাতেই থাকে, কেঁচো বা সৈন্যদলের মতো চলতে শুরু করে না ; একই জায়গায় থেকে বস্তুকণাগুলো এমন একটা বিশেষ নিয়মে ও ছন্দে কাঁপতে শুরু করে যে সব মিলিয়ে মনে হয় বিশেষ ধরনের একটা ঢেউ যেন এগিয়ে চলেছে।

বড়ো রকমের একটা ভূমিকম্পকে তুলনা করা চলে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের সঙ্গে, যা বিস্তীর্ণ এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে পারে। কিংবা তুলনা করা যেতে পারে মস্ত একটা হাতুড়ির ঘায়ের সঙ্গে। হাতুড়ির ঘা যেন একটা পেটা-ঘণ্টার গায়ে এসে পড়ছে। যতোবার ঘা এসে পড়ে ততোবার পেটা-ঘণ্টা থর থর করে কেঁপে

ওঠে ; জবর রকমের ঘা হলে পেটা-ঘণ্টা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে।

ভূমিকম্পের এই কাঁপুনি কোনো একটা সীমাবদ্ধ এলাকার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় না। হাজার হাজার মাইল পার হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। এমন কি শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অপর দিকে পর্যন্ত হাজির হয়।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে ভূমিকম্পের কাঁপুনি যতোই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ততোই কম্পনের তীব্রতা কমে যায়। কয়েক-শো কিলোমিটার পার হলে প্রচণ্ডতম ভূমিকম্পের কাঁপুনিও মানুষের পক্ষে টের পাওয়া সম্ভব নয়। ভূমিকম্পের কাঁপুনি যখন পৃথিবীর একদিকে শুরু হয়ে শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর অপরদিকে হাজির হয় তখন তা এত মৃদু যে সূক্ষ্মতম যন্ত্র না হলে তা ধরা পড়ে না। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। মৃদুতম কম্পনকেও কাগজে-কলমে ধরে রাখবার জন্যে মানুষ এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছে, যার নাম ভূকম্পলিখ-যন্ত্র (seismograph)।

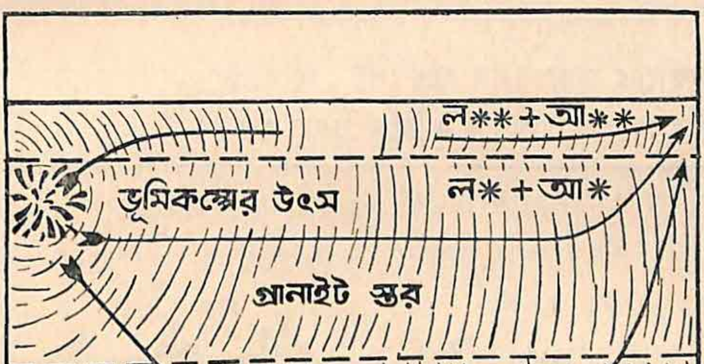
এই ভূকম্পলিখ-যন্ত্রে সত্যি সত্যিই কাগজে-কলমে কম্পনের ছবি উঠে আসে। লম্বা একটা ছক-কাটা কাগজ থাকে আর একটা পেন্সিল অনবরত সেই কাগজের ওপরে দাগ টেনে চলে। যখন কোথাও কোনো কম্পন থাকে না তখন এই দাগ হয় সিধে ও সরল। সামান্যতম কম্পনেও দাগটা এঁকেবেঁকে যায়। এই আঁকাবাঁকা দাগ দেখেই ভূ-বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারেন, কোথায় কতদূরে কম্পনের উৎস, কোন্ বিশেষ ধরনের কম্পন কখন এসে পৌঁছেছে এবং কোন বিশেষ পথ ধরে এসেছে। এটুকু জানার পর পথের নানা বিচিত্র খবর সামান্য একটা দাগের সূত্র ধরে টেনে টেনে বার করা হয়।

এই দাগকে বিশ্লেষণ করে ভূ-বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন যে শব্দ বা আলোর ঢেউয়ের সঙ্গে ভূমিকম্পের ঢেউয়ের বিশেষ মিল আছে। শব্দ বা আলোর ঢেউয়ের মতোই ভূমিকম্পের ঢেউও প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হতে পারে। সূর্যের আলো যেমন ত্রিশিরা কাঁচ বা

বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে আসবার সময় রামধনুর সাতরঙা রঙে ফেটে পড়ে, ভূমিকম্পের ঢেউও তেমনি কোনো কোনো শিলার মধ্যে ঢুকে বেরিয়ে আসবার সময় নানাভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। শব্দের ঢেউ যেমন বাতাসের চেয়ে জলে বেশি জোরে ছোটে, জলের চেয়ে শিলায় আরো বেশি জোরে—তেমনি ভূমিকম্পের ঢেউয়ের ছুটও শিলাভেদে কম বা বেশি।

ভূমিকম্পের ঢেউকে এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারার পর থেকেই অন্য একটা ব্যাপারে মানুষের পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব হয়েছে। মাটির তলায় তেলের খনির সন্ধান পাবার জন্যে আগে মানুষকে মাটি খুঁড়তে হত। এখন কৃত্রিম উপায়ে ভূমিকম্প ঘটিয়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা বলে দিতে পারেন, সেই বিশেষ জায়গায় মাটির নিচে কোনো তেলের খনি আছে কিনা। সম্প্রতি বহু তেলের খনি এই পদ্ধতিতেই আবিষ্কৃত হয়েছে; তেলের খনির চাক্ষুষ প্রমাণ পাবার জন্যে মাটি খুঁড়তে হয়নি।

ভূমিকম্পের ঢেউয়ের কম-বেশি ছুটের ব্যাপারটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। মনে করা যাক, তিনটি সড়ক দুটি গ্রামকে যুক্ত করেছে। প্রথম সড়কটি খুবই খারাপ, দ্বিতীয় সড়কটি তার

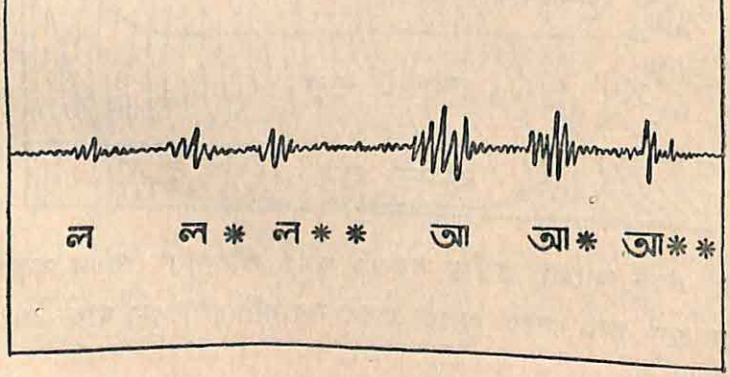


চেয়ে একটু ভালো, তৃতীয় সড়কটি খুবই ভালো। প্রথম সড়কটি দিয়ে এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে সরাসরি পৌঁছনো যায়—অর্থাৎ

সবচেয়ে কম দূরত্ব। দ্বিতীয় সড়ক দিয়ে আরেকটু ঘুরে যেতে হয়—অর্থাৎ আরেকটু বেশি দূরত্ব। তৃতীয় সড়ক দিয়ে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়—অর্থাৎ অনেক বেশি দূরত্ব। এবারে মনে করা যাক, তিনটি গাড়ি একই সময়ে তিনটি আলাদা সড়ক ধরে এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামের দিকে রওনা হল। দেখা যাবে, তৃতীয় সড়ক ধরে যে গাড়িটি এসেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশি দূরত্ব যে গাড়িটিকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেই গাড়িটি গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছে সবার আগে ; আর প্রথম সড়ক ধরে যে গাড়িটি এসেছে, অর্থাৎ সবচেয়ে কম দূরত্ব যে গাড়িটিকে অতিক্রম করতে হয়েছে, সেই গাড়িটি পৌঁছেছে সবার পরে।

ভূমিকম্পের ঢেউয়ের বেলাতেও এই একই ব্যাপার ঘটে। এই পৃষ্ঠার ছবির দিকে তাকালে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। ছবির বাঁ-প্রান্তে ভূমিকম্পের উৎস, ডানদিকের কোনায় গন্তব্যস্থান। ভূমিকম্পের ঢেউ উৎস থেকে গন্তব্যস্থানে ছুটেছে। তিনটি আলাদা সড়ক ধরে ভূমিকম্পের ঢেউ ছুট দিতে পারে। একটি সড়ক হচ্ছে মাটির স্তর, দ্বিতীয়টি গ্রানাইট, তৃতীয়টি ব্যাসল্ট। দেখা যাবে, তৃতীয় সড়ক ধরে আসা ঢেউ যদিও সবচেয়ে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে তবুও সবচেয়ে আগে পৌঁছয়।

গন্তব্যস্থানের ভূকম্পলিখ যন্ত্রে সেই পেন্সিলের দাগ কিভাবে এঁকে-বেঁকে যাবে তার একটা ছবি নিচে দেওয়া হল :



ছবিতে লম্বালম্বি ঢেউকে ল চিহ্নিত করা হয়েছে, আড়াআড়ি ঢেউকে আ চিহ্নিত করা হয়েছে। ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সবার আগে এসে পৌঁছেছে ব্যাসল্ট স্তরের লম্বালম্বি ঢেউ (ল), তারপর গ্রানাইট স্তরের লম্বালম্বি ঢেউ (ল*), তারপরে মাটির স্তরের লম্বালম্বি ঢেউ (ল**)। তারপরে ঠিক এমনি পরপর আড়াআড়ি ঢেউ আসছে।

এবারে এই ছবিটিকে বিশ্লেষণ করে অনেকগুলো খবর সংগ্রহ করা যেতে পারে। প্রথমত জানা যায়, ভূমিকম্পের ঢেউ কী বেগে ছুটেছে ; দ্বিতীয়ত জানা যায় ভূমিকম্পের ঢেউ কতখানি লম্বা সড়ক পার হয়ে এসেছে। আবার, এই দুটি খবর জানা গেলেই জানা যায় একেকটি স্তরের গভীরতা কত। এমনিভাবে সূত্র থেকে সূত্রে অগ্রসর হয়ে পৃথিবীর হাঁড়ির খবর টেনে বার করা চলে।

তবে হাঁড়ির খবর টেনে বার করতে হলে আয়োজনও করতে হবে তেমনি বৃহৎ। পাশের ছবিতে ভূমিকম্পের ঢেউ উৎস থেকে গন্তব্য স্থানে যাবার জন্যে সামান্য পথই অতিক্রম করছে। কিন্তু ভূমিকম্পের ঢেউ যদি তেমন জোরালো হয় তবে সেই ঢেউ পৃথিবীর একদিক থেকে অপর দিক পর্যন্ত ছুটবে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের প্রত্যেকটি স্তর অতিক্রম করবে সেই ঢেউ। এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় ভূকম্পলিখ-যন্ত্রে সেই ঢেউয়ের যে ছবি ধরা পডবে তা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের খবর জেনে নেওয়া কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে একই ভূমিকম্পের ঢেউয়ের ছবি ধরতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। যতো জোরালো ভূমিকম্পই হোক না কেন, পৃথিবীর কোনো কোনো এলাকায় সেই ভূমিকম্পের বিন্দুমাত্র স্পন্দন পৌঁছয় না। যেমন, মনে করা যাক, দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে ভূমিকম্পের উৎস। তাহলে দেখা যাবে, পশ্চিম গোলার্ধের সর্বত্র সেই ভূমিকম্পের ঢেউ পৌঁছিয়েছে। অপর দিকে পূর্ব গোলার্ধের ভারত,

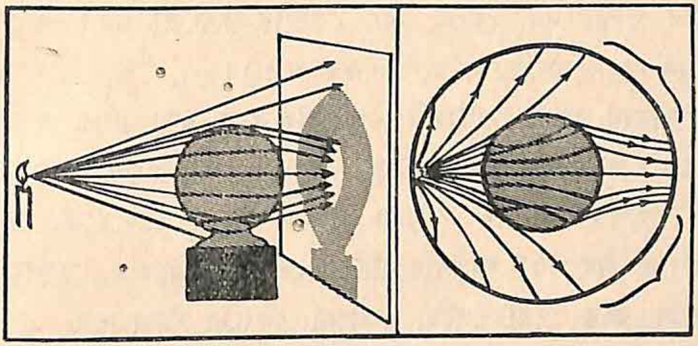
ইন্দোচীন ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সর্বত্র এই ভূমিকম্পের ঢেউ ধরা পড়বে। কিন্তু উত্তর-সাইবেরিয়া, ইওরোপের অধিকাংশ অঞ্চল, পশ্চিম আফ্রিকা, ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে এই ভূমিকম্পের বিন্দুমাত্র স্পন্দন পৌঁছয়নি। অর্থাৎ, মনে হতে পারে, পৃথিবীর যে-দিকে ভূমিকম্পের উৎস, তার অপর দিকে চক্রাকৃতি একটি এলাকাকে ভূমিকম্পের ঢেউ এড়িয়ে চলছে। এই দৃষ্টান্তের বিবরণ অনুযায়ী যে-যে এলাকাকে ভূমিকম্পের ঢেউ এড়িয়ে চলছে, সেই এলাকা-গুলোকে মানচিত্রের ওপরে দাগ টেনে দেখালে যে ছবি পাওয়া যায়, তা নিচে দেওয়া হল।



এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কী?

নিচের ছবির দিকে তাকালে কারণটা বোঝা যাবে। একটা জলভর্তি কাঁচের বলের ওপরে আলো ফেলা হয়েছে! বলের পেছনে রয়েছে

একটা পর্দা। দেখা যাবে পর্দার ওপরে ফুটে উঠেছে বিশেষ একটা ছবি। ঠিক মাঝখানে রয়েছে খানিকটা গোল আলো, সেই আলোকে ঘিরে একটা চক্রাকার ছায়া, তারপরে আবার আলো। অর্থাৎ



কাঁচের বলটি একটি লেন্স-এর কাজ করছে এবং এই লেন্স আলোর রশ্মিকে প্রতিসরিত করেছে। ফলে চক্রাকার খানিকটা অংশে আলোর কোনো রশ্মি পৌঁছতে পারেনি।

ঠিক এমনি ব্যাপার ঘটে ভূমিকম্পের ঢেউয়ের বেলাতেও। যদি ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল এমন কোনো পদার্থে তৈরি যা ভূমিকম্পের ঢেউকে প্রতিসরিত করে তাহলে ভূমিকম্পের ঢেউ চক্রাকার একটা অঞ্চলে একেবারেই পৌঁছতে পারবে না। ওপরের ছবি দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ছবিতে ব্র্যাকেটচিহ্নিত অংশে ভূমিকম্পের ঢেউ পৌঁছতে পারেনি। মনে রাখা দরকার যে এক্ষেত্রে ভূত্বক হচ্ছে পর্দা, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হচ্ছে লেন্স আর ভূমিকম্পের ঢেউ হচ্ছে আলোর রশ্মি।

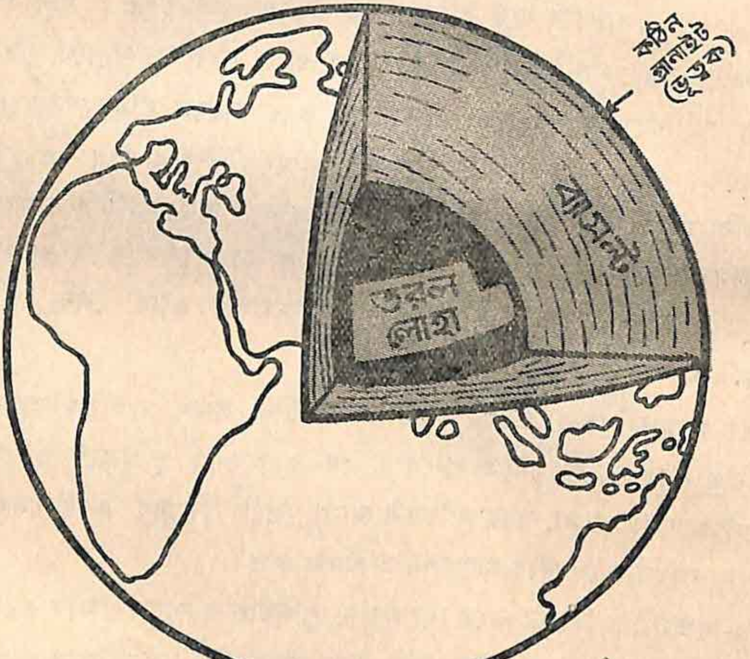
এই সামান্য ঘটনা থেকেই পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চল সম্পর্কে অনেক কিছু খবর পাওয়া যেতে পারে। যে-যে অঞ্চলে ভূমিকম্পের ঢেউ পৌঁছতে পারে না, তার আয়তন জানা গেলে হিসেব করে নেওয়া যায় পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আয়তন কত।

ভূ-বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর ব্যাসার্ধের মাঝ-বরাবর পর্যন্ত, বা আরো পাকাপাকিভাবে বলা চলে, দশ ভাগের ছ-ভাগ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি বিস্তৃত। অর্থাৎ এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটির

ব্যাসার্ধ তিন হাজার কিলোমিটারেরও বেশি।

ভূমিকম্পের ঢেউ কতখানি প্রতিসরিত হয়েছে সেই মাপ থেকে হিসেব করে নেওয়া যায়, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঘনত্ব কত। হিসেব করে দেখা গেছে, এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঘনত্ব দশ থেকে বারোর মধ্যে (জলের ঘনত্বকে একক ধরে)।

ঘনত্ব জানার পরেই মোটামুটি নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা চলে, পৃথিবীর এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলে রয়েছে বিশুদ্ধ লোহা। অন্য একটা ব্যাপারেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। মহাকাশ থেকে যে-সব উল্কাপিণ্ড শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পেরেছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কোনো কোনো উল্কাপিণ্ডে একশো ভাগের নব্বুই ভাগ হচ্ছে লোহা। অনুমান করা চলে যে এই উল্কাপিণ্ডগুলো কোনো একটি বিচূর্ণিত গ্রহের কেন্দ্রীয় অঞ্চল থেকে এসেছে।



আবার, পৃথিবীর এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আড়াআড়ি ঢেউ বাধাপ্রাপ্ত

হয়। সুতরাং, নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা চলে যে পৃথিবীর এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি তরল অবস্থায় আছে।

এবার পৃথিবীর গড়ন সম্পর্কে পুরো একটি ছবি এঁকে নেওয়া যেতে পারে। পৃথিবীর বাইরের দিকে রয়েছে কঠিন গ্রানাইট স্তর। এই স্তরটি মোটামুটি পঞ্চাশ কিলোমিটার গভীর। তার নিচে ব্যাসল্ট স্তর—প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার গভীর। তার নিচে তরল লোহার কেন্দ্রীয় অঞ্চল—তিন হাজার কিলোমিটারে বেশি ব্যাসার্ধ। পাশে পুরো ছবিটা এঁকে দেখানো হল।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে এই ছবিটা আঁকা হয়েছে খুবই মোটা দাগে। খুঁটিনাটি বিবরণ এই ছবির মধ্যে আসেনি। যেমন, মাঝের ব্যাসল্ট স্তরটির কয়েকটি উপস্তর আছে। একেকটি উপস্তরের একেক রকম ঘনত্ব। তবে ঘনত্বের এই বিভিন্নতার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। বাইরের দিক থেকে যতোই ভেতরের দিকে যাওয়া যাবে ততোই এই ঘনত্ব বেড়ে বেড়ে চলবে। শেষ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার ভেতরে চলে আসার পরে পাওয়া যাবে তরল লোহার কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এই অঞ্চলের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি।

পৃথিবীর চুম্বকত্ব

দিগদর্শনযন্ত্রের চুম্বক-শলাকা উত্তর দক্ষিণে মুখ করে থাকে—এ খবর আমরা সবাই জানি। চুম্বক-শলাকার সন্ধান প্রথম পাওয়া গিয়েছিল চীনদেশে। সেখান থেকে মার্কো পোলো এই আশ্চর্য বস্তুটিকে ইওরোপে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে এই বস্তুটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

কল্পনা করা হয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবী হচ্ছে একটি বিশাল চুম্বক। এই চুম্বকের দক্ষিণ মেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক উত্তর মেরুতে, উত্তর মেরু পৃথিবীর ভৌগোলিক দক্ষিণ মেরুতে। এবং এই বিশাল চুম্বকের টানেই চুম্বক-শলাকা উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে।

কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা জানি না, পৃথিবীর এই চুম্বক কি-ভাবে

এসেছে। সোভিয়েত কসমিক রকেটের মারফৎ যে-সব তথ্য পাওয়া গিয়াছে তা থেকে জানা যায় যে চন্দ্রে চুম্বকত্ব নেই। পৃথিবীর অভ্যন্তর সম্পর্কে যেটুকু জ্ঞান আমাদের কাছে তা থেকে বলতে পারা যায়, পৃথিবীরও এই চুম্বকত্ব থাকা উচিত নয়। যে-সমস্ত ধাতুকে চুম্বকে পরিণত করা যায়—যেমন লোহা বা নিকেল—তা নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, একটা বিশেষ মাত্রায় উত্তপ্ত হলে লোহা বা নিকেল কিছুতেই আর চুম্বক হতে পারে না। আমরা জানি, পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ এই বিশেষ মাত্রার অনেক অনেক ওপরে। স্বাভাবিক অবস্থায় এত বেশি উত্তাপে চুম্বকত্ব থাকা সম্ভব নয়।

এমন কি, যদি ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর সমস্ত চুম্বকত্ব রয়েছে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লৌহগোলকে—তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়। আমরা জানি, এই লৌহগোলকটি রয়েছে সম্পূর্ণ তরল অবস্থায় এবং তরল লোহার চুম্বকত্ব থাকে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লৌহগোলকটি তরল হওয়া সত্ত্বেও প্রচণ্ড এক চাপের মধ্যে রয়েছে এবং এই প্রচণ্ড চাপে তরল লোহার চালচলন পাল্‌টে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে এত প্রচণ্ড চাপ তৈরি করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি—সুতরাং এবিষয়ে কোনো পরীক্ষাও হয়নি।

তারপরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের লৌহ-গোলকের চুম্বকত্ব বজায় থাকা সম্ভব—তাহলে প্রশ্ন ওঠে, এই চুম্বকত্ব এল কোথেকে ?

অনেকে বলেন, পৃথিবীর এই চুম্বকত্ব কোনো একটা স্থায়ী ব্যাপার নয়, এর আদি কারণ খুঁজতে যাওয়ার কোনো অর্থ হয় না, এই চুম্বকত্ব তৈরি হয়েছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে। তাহলেও প্রশ্ন ওঠে—এই বিদ্যুৎ-প্রবাহের উৎস কী ?

সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে চুম্বক-শলাকা কেন উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকে তার কারণ আজো আমরা জানি না। তবে একথা ঠিক যে চুম্বক-শলাকার এই রহস্যকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে কোনো

বৈপ্লবিক তত্ত্বের অবতারণা করতে হবে না। পদার্থবিজ্ঞান ও ভূ-বিজ্ঞান যতোটুকু অগ্রসর হয়েছে, তা থেকেই এই ব্যাখ্যা পাওয়া সম্ভব। পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা অস্বাভাবিক রকমের জটিল—এবং এই জটিলতাই হচ্ছে আসল সমস্যা। চুম্বক-শলাকার রহস্যকে জানতে হলে এই জটিলতার আরো কয়েকটি সূত্রের সন্তান পাওয়া দরকার।

বায়ুমণ্ডল

পৃথিবীর এই দৃশ্যমান গোলকটি মোড়া রয়েছে অদৃশ্য এক বায়ুমণ্ডলে। বায়ুমণ্ডলকে চোখে দেখা যায় না; দেখা গেলে বোঝা যেত এই বায়ুমণ্ডল হচ্ছে আরেকটি গোলক, যার ভেতরটা ফাঁপা—অনেকটা স্পঞ্জ রসগোল্লার মতো। এই ফাঁপা অংশের সমস্তটা জুড়ে আছে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড।

আমরা রয়েছি এক দৃশ্যমান গোলকের বাইরের দিকে এবং এক অদৃশ্য গোলকের ভেতরের দিকে। এই দৃশ্য ও অদৃশ্য গোলক মিলিয়েই আমাদের এই পৃথিবী।

আমাদের এই সৌরমণ্ডলে পৃথিবীর মতো আরো আটটি গ্রহ আছে। কিন্তু সব গ্রহেরই যে বায়ুমণ্ডল আছে তা নয়। সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট এবং সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ বুধ—সেখানে ছিটেফোঁটা বাতাসও নেই। তারপরে শুক্র—সেখানকার বাতাসের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড। তারপরে পৃথিবী। তারপরে মঙ্গলগ্রহ। একমাত্র মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলের সঙ্গেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের কিছুটা মিল আছে; তবে মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের ভাগ খুবই কম। তারপরে পর-পর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন। এই চারটি গ্রহেই বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত গ্যাসে তৈরি। সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি।

সৌরমণ্ডলে উপগ্রহ আছে একত্রিশটি। পৃথিবীর একটি, মঙ্গলের দুই, বৃহস্পতির বারো, শনির নয়, ইউরেনাসের পাঁচ ও নেপচুনের দুই। এই একত্রিশটি উপগ্রহের কোনো উপগ্রহেই বায়ুমণ্ডল নেই। এবার তাহলে প্রশ্ন ওঠে, একেক গ্রহে একেক রকম বায়ুমণ্ডল হবারই বা কারণ কী, আর বুধগ্রহে ও উপগ্রহগুলোতে বায়ুমণ্ডল না থাকারই বা কারণ কী। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিশেষ রূপটিকে বুঝতে হলে এই প্রশ্ন নিয়ে খুব সংক্ষেপে কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

বিশেষ করে পৃথিবীর কথাই ধরা যাক। পৃথিবীর বিভিন্ন অবস্থায় নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে নানা রকমের গ্যাস; যেমন হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, নিওন, আর্গন, ক্রিপ্‌টন, ইত্যাদি; এ-ছাড়াও জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, মিথেন—যা আলাদা আলাদা দু-তিনটি গ্যাসের রাসায়নিক মিশ্রণ।

কোনো গ্রহে বায়ুমণ্ডল তৈরি হবে কি হবে না, তা নির্ভর করে—এই সমস্ত গ্যাসকে টেনে ধরে রাখবার ক্ষমতা সেই গ্রহের আছে কি নেই—তার ওপরে। আবার কোন্ বিশেষ ধরনের বায়ুমণ্ডল তৈরি হবে, তা নির্ভর করে—কোন্ কোন্ বিশেষ গ্যাস গ্রহের টানে আটক পড়বে আর কোন্ কোন্ বিশেষ গ্যাস গ্রহের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হবে—তার ওপরে। কথাটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা দরকার।

একটা ফুটবলকে লাথি মেরে যদি শূন্যে তোলা যায় তাহলে ফুটবলটি কিছুক্ষণ পরেই আবার মাটিতে নেমে আসে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে ফুটবলটি শূন্যে উধাও হয়ে যেতে পারে না। ফুটবলের চেয়েও আরো অনেক জোরে ছুট দেয় বন্দুকের গুলি। কিন্তু বন্দুকের গুলিও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে। বন্দুকের গুলির চেয়েও জোরে ছুট দেয় কামানের গোলা। কিন্তু কামানের গোলার পাল্লাও খুব বেশি নয়। কিন্তু আমরা জানি, সোভিয়েত কসমিক

রকেট ও লুনিক পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাশূন্যে ছুট দিয়েছিল।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, কোনো বস্তু যদি সেকেণ্ডে ৬·৯৫ মাইল বা ১১·২ কি. মি. বেগে ছুট দিতে পারে—তাহলে সেই বস্তুটি আর কক্ষনো পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসবে না, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যাবে। যে বিশেষ বেগ আয়ত্ত করতে পারলে মাধ্যাকর্ষণের টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, সেই বেগকে বলে নিষ্ক্রমণ-বেগ (escape-velocity) সোভিয়েত কসমিক রকেট ও লুনিক এবং মার্কিন পায়োনিয়র (চার ও পাঁচ নম্বর) প্রত্যেকেই নিষ্ক্রমণ-বেগ অর্জন করতে পেরেছিল।

সৌরমণ্ডলের কোন্ গ্রহ থেকে কতখানি বেগে ছুট দিতে পারলে সেই বিশেষ গ্রহের টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, তার একটা হিসেব নিচে তুলে দিচ্ছি।

গ্রহ	নিষ্ক্রমণ-বেগ	
	(মাইল। সেকেণ্ড)	কিলোমিটার। সেকেণ্ড
বুধ	২·৪	৩·৯
শুক্র	৬·৫	১০·৫
পৃথিবী	৬·৯৫	১১·২
মঙ্গল	৩·২	৫·১
বৃহস্পতি	৩৮·০	৬১·২
শনি	২৩·০	৩৭·০
ইউরেনাস	১৪·০	২২·৫
নেপচুন	১৫·০	২৪·০
প্লুটো	২·২(?)	৩·৫ (?)

সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে বড়ো গ্রহ বৃহস্পতি। কাজেই বৃহস্পতির মাধ্যাকর্ষণও সবচেয়ে বেশি। ওপরের ছক থেকে দেখা যাবে, বৃহস্পতির টানকে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে হলে সেকেণ্ডে ৬১·২ কি. মি. বেগে ছুট দিতে হবে।

এই নিষ্ক্রমণ-বেগের ব্যাপারটা যদি বুঝতে পারা গিয়ে থাকে তাহলে বায়ুমণ্ডল তৈরি হওয়াটাকে রহস্য বলে মনে হবে না। প্রত্যেকটি গ্রহই বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে অনেক রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে। এই রূপান্তরের নানা পর্যায়ে নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নানা ধরনের গ্যাস তৈরি হয়। এই গ্যাসগুলো সেই বিশেষ গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের টানে আটক পড়বে কি পড়বে না, আটক পড়লে কতখানি আটক পড়বে—তারই ওপরে নির্ভর করে সেই বিশেষ গ্রহের বায়ুমণ্ডল থাকবে কি থাকবে না, থাকলে কি ধরনের থাকবে।

আমরা জানি, গ্যাসের ধর্ম হচ্ছে, ফাঁকা জায়গা পেলে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়া। এই ছড়িয়ে পড়ার ক্ষমতা তরল পদার্থেরও কিছুটা আছে, কঠিন পদার্থের একেবারেই নেই।

গ্যাসীয় অবস্থায় বস্তুকণাগুলো প্রচণ্ড বেগে ছুটোছুটি করে আর ছুটোছুটি করতে গিয়ে অনবরত একটার সঙ্গে আরেকটা ধাক্কা খায়। ছুটোছুটি আর ধাক্কাধাক্কি—এই হচ্ছে গ্যাসের বস্তুকণার বৈশিষ্ট্য। আবার, গ্যাস যতো উত্তপ্ত হয় ততোই বেড়ে যায় দুটি বস্তুকণার মধ্যে ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কি। এমনও হতে পারে, প্রচণ্ড এক ধাক্কার পরে বস্তুকণা ধাক্কার আগের বেগের চারগুণ বেশি বেগে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখা দরকার যে গ্যাসীয় অবস্থায় বস্তুকণাগুলো সেকেণ্ডে লক্ষ-লক্ষ বার ধাক্কা খায়।

কোন্ গ্যাসের বস্তুকণা গড়ে কী বেগে ছুটোছুটি করে, তার একটা হিসেব বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে। আবার, গ্যাসের উত্তাপ যতো বাড়ে, ছুটোছুটির বেগও ততো বাড়ে। যেমন, ০° সেন্টি-গ্রেড উত্তাপে একটি হাইড্রোজেন অণুর বেগ হয় সেকেণ্ডে ১·১৪ মাইল, ২০০° সে. উত্তাপে ১·৫০ মাইল, ৫০০° সে. উত্তাপে ১·৯৩ মাইল, ২০০০° সে. উত্তাপে ৩·৩০ মাইল, ৫০০০° সে. উত্তাপে ৫·০৩ মাইল। অন্য যে-কোনো গ্যাসের বেলাতেও এই একই ব্যাপার। আবার দেখা যায়, ভারী গ্যাসের চেয়ে হাল্‌কা গ্যাসের বস্তুকণা বেশি জোরে ছুটোছুটি করে।

আগেই বলেছি, কোনো বস্তুকণা যদি সেকেণ্ডে ১১·২ কিলোমিটার বেগে ছুট দিতে পারে তাহলে সেই বস্তুকণা পৃথিবীর টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে যায়। গ্যাসের বস্তুকণা অনবরত ছুটোছুটি করে, একেকবার ধাক্কা খাবার পরে বস্তুকণার বেগ চারগুণ-পাঁচগুণ পর্যন্ত বেড়ে যায়—এই ব্যাপারটা যদি চলতে থাকে তাহলে কোনো কোনো গ্যাসের বস্তুকণার বেগ নিষ্ক্রমণ-বেগের মাত্রায় পৌঁছে যেতে পারে। সেই অবস্থায় বস্তুকণাটিকে ধরে রাখবার ক্ষমতা পৃথিবীর আর থাকে না। এজন্যেই মাধ্যাকর্ষণের টান যেখানে কম—যেমন বুধগ্রহে বা চন্দ্রে—সেখানে বায়ুমণ্ডল নেই। অর্থাৎ, সমস্ত গ্যাস মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে।

পৃথিবীর বেলায় দেখা যায়, ২০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম ধরনের হাল্‌কা গ্যাসগুলো পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পরে। কিন্তু অক্‌সিজেন বা নাইট্রোজেনের মতো অপেক্ষাকৃত ভারী গ্যাসগুলো সহজে সে-অবস্থায় পৌঁছয় না। হাইড্রোজেন উধাও হয়ে গেছে বলেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অ্যামোনিয়া বা মিথেনের মতো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হতে পারেনি। কিন্তু বৃহস্পতি শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ এত বেশি যে প্রত্যেকটি গ্যাস আটক পড়ে গেছে এবং সেজন্যে এই চারটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলেই রয়েছে বিষাক্ত গ্যাস।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল তৈরি হবার এই প্রক্রিয়াটিকে বিশদভাবে বোঝা দরকার।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কি কি উপাদান আছে এবং কোন্ উপাদান কি পরিমাণে আছে—প্রথমে তার একটা হিসেব নেওয়া যেতে পারে। হিসেবটা হচ্ছে এই:

উপাদান	শতকরা ভাগ
নাইট্রোজেন	৭৮·০৩
অক্‌সিজেন	২০·৯৯

আর্গন	০·৯৩২৩
কার্বন ডাই-অক্সাইড	০·০৩
হাইড্রোজেন	০·০১
নিয়ন	০·০০১৮
ক্রিপ্‌টন	০·০০০১
হিলিয়াম	০·০০০৫
ওজোন	০·০০০০৬
জেনন	০·০০০০০৯

এই তালিকার যে যে উপাদানের নাম করা হয়েছে তা ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে আছে জলীয় বাষ্প, ধুলো কালি, পরাগ এবং কিছু কিছু দূষিত পদার্থ।

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে, বায়ুমণ্ডলে আর্গনের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়—অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরেই। কিন্তু শুনলে অবাক হতে হবে যে ১৮৯৪ সালের আগে পর্যন্ত এই পদার্থটির অস্তিত্ব জানা ছিল না। আর্গন হচ্ছে একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস; অর্থাৎ স্বভাবের দিক থেকে পদার্থটি নিতান্তই একলসেঁড়ে—কারও সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। ভিড়ের মধ্যে কেউ যদি চুপচাপ থাকে তবে তার দিকে সহজে কারও নজর পড়ে না। আর্গন এমনি একটি অ-মিশুক গ্যাস। এবং আর্গনের মতো অ-মিশুক গ্যাস আরো অন্তত চারটি আছে—হিলিয়াম, নিয়ন, ক্রিপ্‌টন, জেনন।

বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ জায়গা বিশেষে কম বা বেশি। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কতটা হবে, তা প্রধানত নির্ভর করে উত্তাপের ওপরে। বায়ুমণ্ডলের আট-দশ কিলোমিটার ওপরে উত্তাপ এত কম যে সেখানে জলীয় বাষ্প থাকতে পারে না।

এই জলীয় বাষ্পের কম-বেশি থাকাটাকে যদি হিসেবের মধ্যে ধরা না হয়, তাহলে বলা চলে ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উপাদানে ইতরবিশেষ নেই। সর্বত্রই এক ধরনের। আর এই এলাকার বায়ুমণ্ডলে প্রচণ্ড একটা হুটোপাটির ব্যাপার লেগেই

আছে। নিচের বাতাস ওপরে ওঠে, ওপরের বাতাস নিচে নামে—সব সময়ে জোরালো একটা প্রবাহ থেকেই যায়। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কিলোমিটার ওপরে উঠলে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে এই হুটোপাটির ব্যাপারটা আর নেই। তখন কে কোথায় থাকবে তা নির্ধারিত হয় ওজন দিয়ে। যে গ্যাস ওজনে ভারী সে আসে নিচের দিকে যে গ্যাস ওজনে হাল্‌কা সে যায় ওপরের দিকে। স্বাভাবিক-ভাবেই আশা করে চলে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরে আছে সবচেয়ে হাল্‌কা দুটি গ্যাস—হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম।

এবার তাহলে প্রশ্ন ওঠে, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা কত? স্পুৎনিকের যুগ শুরু হবার আগে বিজ্ঞানীরা দু-একটি ঘটনা থেকে এ-সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতেন মাত্র। ঘটনাগুলো প্রথমে বলে নেওয়া যাক।

প্রথম ঘটনা—উল্কাপাত। আমরা জানি, উল্কাপিণ্ডে আগুন জ্বলে ওঠে বাতাসের সঙ্গে ঘষা লাগার পরে। ভূপৃষ্ঠ থেকে ১১০ কি. মি. থেকে ১৬০ কি. মি. উঁচুতে উল্কাপিণ্ডে আগুন জ্বলতে দেখা গেছে। কাজেই, বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা নিশ্চয়ই তার চেয়েও বেশি—কারণ, বাতাসের ছোঁয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে তো আর উল্কাপিণ্ডে আগুন জ্বলে না।

দ্বিতীয় ঘটনা—মেরুজ্যোতি। মেরুদেশের আকাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে উজ্জ্বল আলো ফুটে ওঠে। মেরুজ্যোতি আসলে একটা বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকাণ্ড—কতকগুলো বৈদ্যুতিক কণা মেরুদেশের আকাশে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ঢুকে পড়ে দীপ্তিমান হয়ে ওঠে। দেখা গেছে, মেরুজ্যোতির নিচের প্রান্ত থাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০০ কি. মি. উঁচুতে আর ওপরের প্রান্ত থাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০০০ কি. মি. উঁচুতে। অতএব বায়ুমণ্ডলের বিস্তৃতি হাজার কিলোমিটার তো বটেই।

"কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল মাত্র কয়েক শো কিলোমিটার উঁচু, তার বাইরে ফাঁকা মহাশূন্য।

কিন্তু স্পুৎনিক ও লুনিকের মারফৎ জানা গিয়েছে যে এই ধারণা ঠিক নয়। তিন হাজার কিলোমিটার উঁচুতেও বায়ুমণ্ডলের রেশ থেকে গিয়েছে। রেশ মানে খুবই পাতলা একটি বায়বীয় স্তর। তারও ওপরে রয়েছে তড়িতাবিষ্ট কণিকার একটি মোড়ক। আর এই মোড়কটির বিস্তৃতি পঞ্চাশ হাজার কিলোমিটারের চেয়ে বেশি।"*

এবারে যদি বায়ুমণ্ডল সমেত গোটা পৃথিবীকে একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করি তাহলে মনে হবে, আমাদের এই পৃথিবী প্রকাণ্ড একটি গ্যাসীয় গোলক মাত্র যার কেন্দ্রে রয়েছে যৎসামান্য আয়তনের কঠিন একটি পিণ্ড। স্পুৎনিক ও লুনিকের যুগ শুরু হবার পর পৃথিবী সম্পর্কে সমস্ত পুরনো ধারণা বাতিল হয়ে গেছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, বায়ুমণ্ডলের শতকরা নব্বুই ভাগই জড়ো হয়ে আছে মাটির কাছাকাছি পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে। ত্রিশ কিলোমিটারের মধ্যে আছে শতকরা নিরানব্বুই ভাগ। হিসেব করে দেখা গেছে, ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুমণ্ডলের যা ঘনত্ব, সেই ঘনত্বে যদি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে চেপে আনা যায় তাহলে বায়ু-মণ্ডলের বিস্তৃতি ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ কিলোমিটারের বেশি হবে না।

বায়ুমণ্ডলের উপাদানের যে ছক-কাটা হিসেব ওপরে দেওয়া হয়েছে তা থেকে দেখা যাবে, বায়ুমণ্ডলে প্রতি দশ-লক্ষ ভাগের পাঁচ ভাগ হচ্ছে হিলিয়াম। এই হিলিয়াম সম্পর্কে বিশেষ করে জানার কথা এই যে, এই গ্যাসটি অবিরাম তৈরি হয়ে চলেছে। যে সমস্ত শিলায় ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম আছে—তার রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম গ্যাস বেরিয়ে আসে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে-পরিমাণ হিলিয়াম থাকা উচিত ছিল তা নেই। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে কিছু পরিমাণ হিলিয়াম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে। এবং এখনও যাচ্ছে। কারণ, এই গ্যাসটি অবিরাম তৈরি

* মহাকাশের ঠিকানা পৃঃ ১৯৮

হয়ে চলা সত্ত্বেও বায়ুমণ্ডলের মোট সঞ্চয়কে বাড়াতে পারছে না ; তার মানে, যে-পরিমাণ হিলিয়াম তৈরি হয়, সেই পরিমাণ হিলিয়াম উধাও হয়।

কিন্তু হিসেব নিয়ে দেখা গেল, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় স্বাভাবিক নিয়মে এই হিলিয়াম গ্যাস কিছুতেই উধাও হতে পারে না। হিলিয়াম গ্যাসের আণবিক বেগ সেকেণ্ডে এক কিলোমিটারের কাছাকাছি। প্রচণ্ড একটা ধাক্কার পরে এই আণবিক বেগ যদি চার-পাঁচ গুণ বেড়েও যায় তাহলেও সেই বেগ নিষ্ক্রমণ বেগের অনেক কম থেকে যায়।

তাহলে হিলিয়াম গ্যাসের অন্তর্ধানের রহস্যটা কী?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অন্ধকার রাত্রে সারা আকাশে আবছা একটা আলোর দ্যুতি থাকে। মনে হয়, সারা আকাশকে কে যেন আলোর দ্যুতি দিয়ে লেপে দিয়েছে। এই আলোর দ্যুতির কিছুটা আসে নক্ষত্র থেকে—বাকিটা আসে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তর থেকে। বিজ্ঞানীরা এই আলোর দ্যুতিকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, মেরু-জ্যোতির সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের এই দ্যুতির মিল আছে। বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরে অক্সিজেন পরমাণু ছাড়া ছাড়া ভাবে গা ভাসিয়ে বেড়ায় ; এই বিশেষ ধরনের অক্সিজেন পরমাণু থেকে নির্গত তেজই হচ্ছে রাত্রির আকাশের দ্যুতি। এই বিশেষ ধরনের অক্সিজেন পরমাণু এমনিতে কারও সঙ্গে হাত মেলাতে রাজী নয় ; কিন্তু চলা-ফেরা করতে গিয়ে এই বিশেষ ধরনের অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে অন্য কোনো পরমাণুর ধাক্কা লাগা অসম্ভব ব্যাপার নয়। তা যদি হয়, তবে ধাক্কার পরে পরমাণু দুটি প্রচণ্ড বেগে ছিটকে বেরিয়ে যায়। হিসেব করে দেখা গেছে, এ-ধরনের একটি ধাক্কার পরে হিলিয়াম পরমাণুর বেগ সেকেণ্ডে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। সে-অবস্থায় হিলিয়াম পরমাণুটি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান ছিঁড়ে অনায়াসেই মহাশূন্যে পাড়ি দেয়। আর যদি হাইড্রোজেন-পরমাণু এ-ধরনের একটি ধাক্কায় লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে সেই পরমাণুটির

বেগ হয় আরো অনেক বেশি। তখন আরো অনায়াসে সেই পরমাণুটি মহাশূন্যে পাড়ি দিতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের উচ্চতম স্তরে এ-ধরনের এক বিশেষ ধাক্কাধাক্কির ব্যাপার চলে বলেই আজো হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের অন্তর্ধান ঘটছে।

একথা মনে করবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে পৃথিবী যখন আরো অনেক বেশি উত্তপ্ত ছিল তখন পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই অন্তর্ধান করেছে। আমরা আগেই বলেছি যে উত্তাপ যতো বেশি হবে, বস্তুকণার ছুটোছুটিও হবে ততো বেশি বেগে। কাজেই পৃথিবী যখন খুব বেশি উত্তপ্ত ছিল তখন নাইট্রোজেনের মতো ভারী গ্যাসের বস্তুকণার পক্ষেও নিষ্ক্রমণ-বেগে ছুট দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।

বিষয়টিকে অন্য এক দিক থেকেও দেখা যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, আমাদের এই সূর্য ও সৌরমণ্ডল একই উপাদান থেকে তৈরি। তাই যদি হয়, সূর্যের বস্তুপিণ্ডের সঙ্গে গ্রহ ও উপগ্রহের বস্তুপিণ্ডের মিল খুঁজে পাওয়া উচিত। বিজ্ঞানীরা এই মিল খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, কোনো কোনো ব্যাপারে মিল আছে, কোনো কোনো ব্যাপারে মিল নেই। মিল রয়েছে ধাতুর হিসেবে; যেমন লোহা, তামা, দস্তা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়ম ইত্যাদি ধাতু সূর্য ও পৃথিবীতে মোটামুটি সমান ভাবেই পাওয়া যাচ্ছে। অমিল রয়েছে সেই সব মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে যা থেকে বায়ুমণ্ডল তৈরি হয় ; যেমন, নাইট্রোজেন, আর্গন, হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, নিয়ন ইত্যাদি পদার্থ সূর্যে যতোখানি আছে এবং সেই হিসেবে পৃথিবীতে যতোখানি থাকা উচিত—পৃথিবীতে আছে তার চেয়ে অনেক কম। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে একমাত্র অক্সিজেনের ক্ষেত্রে এসে দেখা যায়, সূর্য ও পৃথিবীর হিসেবে বিশেষ গরমিল নেই। মনে রাখা দরকার যে পৃথিবীর অধিকাংশ অক্সিজেন রয়েছে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—অক্সিজেন একা-একা থাকতে ভালবাসে না এবং বিশেষ থাকেও

না। বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন কি-ভাবে দলছাড়া হয়েছে সে আলোচনায় পরে আসছি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা চলে, যে-বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা হাতের নাগালের বাইরের কোনো বস্তুপিণ্ডকে এমনভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে পারেন—সেই যন্ত্রটির নাম স্পেক্ট্রোমিটার। এই যন্ত্রের সাহায্যে আসলে বিশ্লেষণ করা হয় আলোকে। এই যন্ত্রের চোঙের মধ্যে ঢুকলে কোনো আলোরই আর রেহাই নেই ; বিশেষ এক বর্ণালীতে ছড়িয়ে পড়তে হয় সেই আলোকে ; সেই বর্ণালীর মধ্যে যেমন থাকে রঙ, তেমনি থাকে কালো কালো দাগ। এই রং ও দাগকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারেন, আলোর উৎসে কি-কি উপাদান আছে এবং উৎসটি এগিয়ে আসছে না পেছিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। সূর্য ও পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে কোনো কোনো ব্যাপারে হিসেবের যে গরমিল হচ্ছে, তা থেকে এই সিদ্ধান্ত টানা চলে যে জন্মের পরে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের কিছুটা অংশ খোয়া গেছে। কোন্ অংশ? না, গ্যাসীয় পদার্থের অংশ। কি ভাবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে-ছবিটি কল্পনা করা হয়েছে তা এই :

এক সময়ে পৃথিবী ছিল উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায়। তারপর একটু একটু করে ঠাণ্ডা হয়ে এক সময়ে তরল হয়ে ওঠে। এই উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থা পর্যন্ত আগাগোড়া সময়ে পৃথিবীর উত্তাপ এত বেশি যে হাল্কা ধরনের গ্যাসীয় পদার্থগুলো অনায়াসেই পৃথিবীর টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছিল। আগেই বলেছি, উত্তাপ যতো বাড়বে, গ্যাসীয় পদার্থের বস্তুকণার ছুটোছুটি-ধাক্কাধাক্কি ততো বাড়বে। হিসেব নিয়ে দেখা গেছে ৫০০০° সেন্টিগ্রেড উত্তাপে নাইট্রোজেনের মতো ভারী গ্যাসীয় পদার্থের বস্তুকণার পক্ষেও নিষ্ক্রমণ বেগে ছুট দেওয়া সম্ভব। জন্মের পর থেকে তরল অবস্থায় পৌঁছনো পর্যন্ত পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের উত্তাপ ৫০০০° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে

বেশি ছিল। সুতরাং, অনেকটা নিশ্চয়তার সঙ্গেই একথা বলা চলে যে পৃথিবী যতোদিন উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পৌঁছেছে ততোদিনে পৃথিবীর আদি বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটাই মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে। তারপরে পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হয়, আবার নতুন করে তৈরি হয় জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসীয় পদার্থ। এবং যেহেতু পৃথিবীর উত্তাপ ইতিমধ্যে অনেকটা কমে গেছে, সুতরাং এই নতুন-তৈরি-হওয়া বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর টানে বন্দী হয়ে যায় ; সেই টান ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে থাকে শুধু হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম। তবে পৃথিবীর বর্তমান বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে সে-যুগের বায়ুমণ্ডলের কোনো মিল নেই। সে-যুগে বায়ুমণ্ডলের বেশির ভাগটাই ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প। তারপরে পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হয় ; বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়ে পৃথিবীর ওপরে—তৈরি হয় মহাসমুদ্র।

তবে এই ছবিটির সঙ্গে কিন্তু হালের বিজ্ঞানীদের সকলের সায় নেই। পৃথিবী একসময়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল, তারপরে তরল অবস্থায়, তারপরে কঠিন অবস্থায়—এমনটি নাও হতে পারে। এই বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল ধুলো ও গ্যাসের বিপুল একখণ্ড মেঘ থেকে—সূর্যের উপরিতল থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা বস্তুপিণ্ড থেকে নয়। জন্মের পর থেকেই পৃথিবীর কঠিন অবস্থা।

তাহলে এই বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যাটাও উপস্থিত করা দরকার। কেন তাহলে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড ও সূর্যের উপরিতলের বস্তুপিণ্ডের মধ্যে রাসায়নিক উপাদানগত মিল পাওয়া যাচ্ছে ?

হালের গবেষণায় বিশ্বজগৎ সম্পর্কে একটি আশ্চর্য খবর জানা যায়। নক্ষত্র, নীহারিকা, মহাশূন্যে ছড়ানো ছিটানো ধুলো ও গ্যাসের মেঘ ও বস্তুকণা—সর্বত্রই একই ধরনের রাসায়নিক উপাদান। কতকগুলো মৌলিক পদার্থের পরমাণু প্রায় একই অনুপাতে সর্বত্র বিদ্যমান। এ থেকে বোঝা যায়, বিশ্বজগতের গড়নে একটি উপাদানগত মিল থেকে গিয়েছে। কাজেই ধুলো ও গ্যাসের যে মেঘ থেকে পৃথিবীর

জন্ম তার গড়নও সৃষ্টিছাড়া কিছু হবার কথা নয়।

বিশ্বজগতে যে মৌলিক পদার্থটি সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে তা হচ্ছে হাইড্রোজেন (বিশ্বজগতে মোট যতো পরমাণু রয়েছে তার শতকরা নব্বুই ভাগ)। তারপরে আছে হিলিয়াম (শতকরা নয় ভাগ)। তারপরে যথাক্রমে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন (শতকরা মোটামুটি ০·৩ ভাগ)। অবস্থা যদি পরমাণুর সঙ্গে পরমাণুর যুক্ত হবার পক্ষে প্রতিকূল না হয় তাহলে তুটি হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি হাইড্রোজেন অণু গঠিত হতে পারে। একই ভাবে তুটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে জলের একটি অণু। তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি নাইট্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়ার একটি অণু। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি কার্বন পরমাণু যুক্ত হয়ে মিথেনের একটি অণু। তুটি অক্সিজেন পরমাণু ও একটি কার্বন পরমাণু যুক্ত হয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইডের একটি অণু। এইভাবে নানা ধরনের বায়বীয় পদার্থ তৈরি হতে পারে। আর যদি উত্তাপ খুবই কম হয় তাহলে এই বায়বীয় পদার্থগুলির পক্ষে কঠিন অবস্থায় থাকাও অসম্ভব নয়। বিশ্বজগতের উপাদানে সিলিকন বা অন্যান্য ধাতুর পরমাণু সংখ্যার দিক থেকে খুবই কম। এই কারণে পাথুরে বস্তুর (rocky substance) অণু অতি সামান্য সংখ্যকই গড়ে উঠতে পারে।

এবারে মূল ব্যাখ্যায় আসা যাক।

ধুলো ও গ্যাসের বিপুল একখণ্ড মেঘ সূর্যের চারদিকে আবর্তিত হচ্ছিল। শেষকালে এই মেঘের খণ্ডটির আকার হয়ে ওঠে চ্যাপ্টা একটা চাকতির মতো। সূর্যের আলো ও উত্তাপ এই চাকতির বস্তুপিণ্ড ভেদ করে খুব বেশিদূর পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। ফলে অবস্থাটা দাঁড়ায় এই যে উত্তাপের তারতম্য অনুসারে চাকতির মধ্যে তু-ধরনের এলাকা গড়ে ওঠে। একটি হচ্ছে সূর্যের কাছাকাছি এলাকা, সেখানকার উত্তাপ খুবই বেশি। অপরটি হচ্ছে সূর্য থেকে অনেক দূরের এলাকা, সেখানকার উত্তাপ খুবই কম। এ-অবস্থায়

বস্তুর ধর্ম অনুসারেই বেশি উত্তাপের এলাকায় এসে জড়ো হতে থাকে পাথুরে পদার্থ ও ধাতু এবং কম উত্তাপের এলাকায় হাইড্রোজেন মিথেন অ্যামোনিয়া ইত্যাদি বায়বীয় পদার্থ।

পরবর্তী পর্যায়ে ধুলো ও গ্যাসের মেঘে তৈরি হয়েছিল অসংখ্য গ্রহাণু। এভাবে বস্তুকণা চাপ বাধবার ফলে দুই বস্তুকণার মাঝখানের ফাঁক বড়ো হয়ে গিয়েছিল এবং সূর্যের আলো ও উত্তাপ আরো খানিকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিল। ফলে পাথুরে বস্তু ও বায়বীর বস্তুর মধ্যে যে সীমানাটা বজায় ছিল তার মধ্যেও খানিকটা ওলোটপালোট হয়ে যায়। তারপরে গ্রহাণুগুলো বড়ো হতে হতে শেষ পর্যন্ত যখন গ্রহগুলো তৈরি হয় তখন তাদের মধ্যেও দুটো ভাগ এসে পড়ে। সূর্যের কাছাকাছি এলাকায় তৈরি হয় পৃথিবীর মতো কতকগুলো পাথুরে গ্রহ যাদের বস্তুপিণ্ডে পাথুরে অংশই বেশি। আর সূর্য থেকে দূরের এলাকায় তৈরি হয় বৃহস্পতির মতো কতকগুলো গ্রহ, যাদের বস্তুপিণ্ডে বায়বীয় অংশই বেশি। স্পেক্‌ট্রোমিটারের বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে, সূর্য থেকে দূরের এলাকার গ্রহে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে মিথেন ও অ্যামোনিয়া। সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো আকারে ছোট বটে কিন্তু উপাদানগত গড়নের দিক থেকে বিচার করলে এই গ্রহটিকেও মহাকায় গ্রহদের দলেই ফেলা উচিত।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, কোন্ গ্রহের কি-ধরনের বায়ুমণ্ডল হবে তা নির্ভর করছে কোন্ বিশেষ উত্তাপের এলাকায় গ্রহটির জন্ম হয়েছিল তার ওপরে। এই মতের প্রবক্তারা আরও বলেন যে গ্রহের বায়ুমণ্ডল থাকবে কি থাকবে না, থাকলেও কি-ধরনের থাকবে, তার সঙ্গে গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের কোনো সম্পর্ক নেই। বিষয়টিকে আরেকটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে।

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে যে-পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে, অক্সিজেন আছে তার চেয়ে ১০,০০০ গুণ বেশি। অথচ সূর্যের বস্তুপিণ্ডে বা বিশ্বজগতের অন্যত্র অক্সিজেনের পরিমাণ নাইট্রোজেনের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ

গুণ মাত্র বেশি। এ-ব্যাপারটার ব্যাখ্যা কী? আমরা জানি অক্সিজেন অতিমাত্রায় সক্রিয় পদার্থ, সে-তুলনায় নাইট্রোজেন নিষ্ক্রিয়। পাথুরে বস্তুর একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে অক্সাইড। অন্যদিকে পাথুরে বস্তুতে নাইট্রোজেন প্রায় না-থাকার মতো। এটুকু মেনে নিতে কোনো আপত্তি হবার কথা নয়। এবার যদি মেনে নিই যে পৃথিবীর জন্ম প্রধানত পাথুরে বস্তুর এলাকায় তাহলে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে অক্সিজেনের পরিমাণগত আধিক্যের একটি ব্যাখ্যা অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের দৃষ্টান্ত আরো আছে। যেমন, নিয়ন (neon), ক্রিপ্‌টন (krypton) ও জেনন (xenon)। পৃথিবীতে এই তিনটি গ্যাস পরিমাণের দিক থেকে খুবই কম। এটি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। কারণ নক্ষত্রে ও নীহারিকায় নিয়নের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে কয়েক কোটি গুণ বেশি, ক্রিপ্‌টনের পরিমাণ কয়েক লক্ষ গুণ বেশি, জেননের পরিমাণ কয়েক হাজার গুণ বেশি। এই অস্বাভাবিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে হলেও শেষোক্ত তত্ত্বটিকে মেনে নিতে হয়।

এই তত্ত্বের সমর্থনে আরো একটি জোরালো তথ্য আছে। ১৯৪৪ সালে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী কুইপার (Kuiper) আবিষ্কার করেন যে শনির উপগ্রহ টাইটানের নাকি মিথেন অ্যামোনিয়া সমন্বিত বায়ুমণ্ডল আছে। টাইটানের ভর পৃথিবীর চেয়ে চল্লিশ ভাগ কম। টাইটানের মাধ্যাকর্ষণ অকিঞ্চিৎকর। এমন কি ঠাণ্ডা অবস্থাতেও এই উপগ্রহটির পক্ষে হাইড্রোজেনকে ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। সূর্য থেকে অতি-দূরত্বের জন্যে এই উপগ্রহটির উত্তাপ হিমাঙ্কের চেয়েও ১৫০ ডিগ্রি নিচে। উত্তাপ যদি হিমাঙ্কের কাছাকাছিও হত তাহলে আর মিথেনও উপগ্রহের মাধ্যাকর্ষণের কাছে বাঁধা পড়ত না। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে উপগ্রহটি জন্মের পর থেকেই অতি-শীতল অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ, মেনে নিতে হয় যে মহাকাশে এমন বস্তু-পিণ্ডও রয়েছে যা কোনো কালে হিমাঙ্কের কাছাকাছি মাত্রায়

পৌঁছয়নি। এবং, ফলে, বস্তুপিণ্ডটির পক্ষে মিথেন-অ্যামোনিয়া সমন্বিত একটি বায়ুমণ্ডল ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে। তার মানে, আমরা বলতে পারি, বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি মহাকায় গ্রহের যে মিথেন-অ্যামোনিয়া সমন্বিত বায়ুমণ্ডল রয়েছে তার কারণ মহাকায় গ্রহের বিপুল মাত্রার মাধ্যাকর্ষণ নয়, তার কারণ অন্য। বৃহস্পতি শনি ইত্যাদি মহাকায় গ্রহগুলি সেই ধুলো ও গ্যাসের মেঘমণ্ডলে এমন এক বিশেষ তাপমাত্রার এলাকায় গড়ে উঠেছিল যার ফলে এই ব্যাপারটি সম্ভব হয়েছে।

আরো যুক্তি আছে। আগেই বলেছি, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ অক্সিজেন রয়েছে তা নাইট্রোজেনের পরিমাণের চেয়ে বহুগুণ বেশি। এ-ব্যাপারটি কি করে সম্ভব হল? যদি ধরে নেওয়া হয় যে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় থাকার সময়ে পৃথিবীর সমস্ত নাইট্রোজেন মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে—তাহলে অক্সিজেনই বা থেকে যায় কি করে? অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের তো প্রায় একই পারমাণবিক ওজন। আবার যদি ধরে নেওয়া হয় যে এই একই প্রক্রিয়ায় ক্রিপ্‌টন ও জেনন মহাশূন্যে উধাও হয়ে গিয়েছে—তাহলে এই দুটি গ্যাসের চেয়ে অনেক হাল্‌কা জল বা অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন থেকে যায় কি করে?

এ-সমস্ত প্রশ্নের জবাব শেষোক্ত তত্ত্বটির সাহায্যেই ভালোভাবে দেওয়া চলে। অর্থাৎ, মেনে নিতে হয় যে পৃথিবীর জন্ম উত্তপ্ত গ্যাসীয় অবস্থায় নয়—কঠিন বস্তুকণিকা থেকে। এবং এই বস্তুকণিকাগুলি সূর্য থেকে কতখানি দূরে ছিল তারই ওপরে নির্ভর করেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কোন্ কোন্ বিশেষ উপাদানে গঠিত হবে।

যাই হোক, পৃথিবীর জন্ম যে-ভাবেই হয়ে থাকুক, জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মহাদেশ ও মহাসমুদ্র বেষ্টিত আজকের দিনের পৃথিবীটাকে পাওয়া যায়নি। সেজন্যে কয়েক-শো কোটি বছরের অনেক রূপ-পরিবর্তনের জন্যে অপেক্ষা করা দরকার। শেষ পর্যন্ত যখন আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর সঙ্গে খানিকটা মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল

তখনো অন্যদিকে ছিল মস্ত একটা অমিল। সেই পৃথিবীতে গাছপালার চিহ্নমাত্র ছিল না।

আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সেই দিনের জন্যে যেদিন পৃথিবীর রুক্ষ মাটিতে সবুজের প্রলেপ পড়েছিল। গাছপালার সেই সবুজের মধ্যে ছিল ক্লোরোফিল আর আকাশে ছিল সূর্যের আলো; এই দুয়ের যোগাযোগে কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন ও অক্সিজেনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়, কার্বনের অংশকে আত্মসাৎ করে গাছপালা নিজেই, অক্সিজেনের অংশ বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। এইভাবেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের যোগান চলে এসেছে। কিন্তু যোগান যেমন আছে, খরচও তেমনি। তাছাড়া অক্সিজেন পদার্থটির স্বভাবই এমন যে দলছাড়া থাকতে ভালবাসে না। আর কিছু না পেলে, একটুকরো লোহার সঙ্গেই গলা-জড়াজড়ি করে মরচে হয়ে জেঁকে বসে। আর সঙ্গী নির্বাচনে বাছবিচার বিশেষ নেই। গাছপালা, মাটি-পাথর, জীব-জন্তু—সবার সঙ্গেই অক্সিজেনের গলাগলি ভাব। মাটি-পাথরের সঙ্গে অক্সিজেন মিশলে অক্সিজেন সেখানেই কোনো একটা যৌগিক পদার্থ হয়ে জেঁকে বসে, গাছপালা জীবজন্তুর সঙ্গে মিশলে গাছপালা জীবজন্তুর দেহে দাহন ধরিয়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হয়ে বেরিয়ে আসে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, অক্সিজেনের যোগান এবং খরচ দুটোই সমানে চলে। তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, বায়ুমণ্ডলে বাড়তি অক্সিজেনের যোগান এল কোত্থেকে? বিজ্ঞানীরা বলেন, অতীতে বিপুল পরিমাণ জৈব পদার্থ মাটির নিচে চাপা পড়েছে এবং ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লা ও তেলে। এই বিপুল পরিমাণ জৈব পদার্থের সঙ্গে অক্সিজেনের যোগাযোগ ঘটেনি—কাজেই কিছু পরিমাণ অক্সিজেন বাড়তি থেকে গেছে। পৃথিবীর গহ্বরে যতো কয়লা ও যতো তেল আছে, সমস্ত তুলে এনে যদি পুড়িয়ে ফেলা হয়—তাহলে এই বাড়তি অক্সিজেনের যোগানটুকু নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিভাগ

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে যেমন কতকগুলো স্তর আছে, তেমনি আছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরটিকে বলা হয় ট্রোপোস্ফিয়ার। ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত এই স্তরটি বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত ধুলো, ধোঁয়া, জলীয় বাষ্প, জীবাণু ও কার্বন ডাই-অক্সাইড রয়েছে এই স্তরটিতে। বায়ুমণ্ডলের যা কিছু হুটোপাটি দাপাদাপি—তাও এখানে। বায়ুমণ্ডলের এই সবচেয়ে নিচের স্তরেই আবদ্ধ থাকে মেঘ, ঝড়বৃষ্টি, সাইক্লোন ও ঘূর্ণিবাত্যা।

ট্রোপোস্ফিারের ওপরের স্তরের নাম স্ট্রাটোস্ফিয়ার ; ট্রোপোস্ফিয়ার থেকে শুরু করে ভূপৃষ্ঠ থেকে সত্তর আশি কিলোমিটার উঁচু পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে ধুলো বা ধোঁয়া নেই, জলীয় বাষ্প বা জীবাণু না-থাকার মতো। মেঘের রাজ্য এই স্তরের অনেক নিচে ; সুতরাং এই স্তরটি বৃষ্টির নাগালের বাইরে। ঝড়ের দৌরাত্ম্য এতদূর পর্যন্ত কোনো সময়েই পৌঁছতে পারে না। উত্তাপ এখানে খুবই কম ; হিমাঙ্কেরও অনেক নিচে। কাজেই স্ট্রাটোস্ফিয়ার হচ্ছে এক শীতল প্রশান্তির দেশ।

এই স্ট্রাটোস্ফিয়ারেই ওজোন-গ্যাসের একটি পর্দা আছে, যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। দুটি অক্সিজেন পরমাণু জোট বাঁধলে পাওয়া যায় অক্সিজেনের একটি অণু, তেমনি তিনটি অক্সিজেন পরমাণু জোট বাঁধলে পাওয়া যায় ওজোনের একটি অণু। ওজোন-গ্যাসের এই পর্দাটি রয়েছে ভূপৃষ্ঠ থেকে পনেরো থেকে চল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে। এই পর্দাটি আছে বলেই সূর্যের আলোর বেগুনী পারের রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না।

সূর্যের আলোয় সাতটি রঙ আছে, একথা আমরা সবাই জানি। এই সাতটি রঙ হচ্ছে আলোর সাতটি ঢেউ। এক-একটি এক-এক মাপের—ছোট থেকে বড়ো। ছোটর দিকে আছে বেগুনী, বড়োর দিকে লাল। বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হল্‌দে, কমলা,

লাল—এই হচ্ছে সাতটি রঙের সাতটি ঢেউ। কিন্তু সূর্যের আলোয় এই সাতটি ঢেউ ছাড়াও আরো অনেকগুলো ঢেউ আছে যা চোখে দেখা যায় না। লাল উজিয়ে লাল-উজানী আলো ; ইংরেজিতে ইন্‌ফ্রা-রেড রে। বেগুনী পেরিয়ে বেগুনী-পারের আলো ; ইংরেজিতে আলট্রা-ভায়োলেট রে। এই আলট্রা-ভায়োলেট রে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি হয়ে গেলে মানুষের শরীরের পক্ষে, বিশেষ করে চোখের পক্ষে, খুবই ক্ষতিকর।

এই ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে না কারণ ওজোন-গ্যাসের পর্দা মায়ের আঁচলের মতো আড়াল তুলেছে।

ওজোন-অণুর একটি বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে এই যে, রশ্মি-বিকীরণের ঢেউ যদি একটি বিশেষ মাপের চেয়ে ছোট মাপের হয় তাহলে তাকে ঠেকিয়ে রাখে। সূর্যের আলোর বেগুনী-পারের রশ্মি হচ্ছে এমনি ছোট মাপের ঢেউ ; বায়ুমণ্ডলের ওজোন-পর্দা পেরিয়ে আসবার ক্ষমতা এই রশ্মির নেই।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে ওপরের স্তরের নাম আয়োনোস্ফিয়ার। এই স্তরটির সীমানা স্ট্রাটোস্ফিয়ারের ওপর থেকে শুরু করে উঁচুর দিকে কয়েক-শো কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ানো। তবে যতোখানি জায়গা জুড়েছে ততোখানি ভার নেই। গোটা আয়োনোস্ফিয়ারে যে-পরিমাণ বাতাস আছে তা পৃথিবীর মোট বাতাসের একশো-ভাগের একভাগও নয়। এত অল্প পরিমাণ বস্তু এত বিপুল পরিমাণ জায়গা জুড়ে আছে বলেই আয়োনোস্ফিয়ায়ের ঘনত্ব খুবই কম ; এত অসম্ভব রকমের কম যে পৃথিবীর সবচেয়ে জোরালো ভ্যাকুয়াম যন্ত্রেও এত কম ঘনত্ব তৈরি করা যায় না। এবং এই অসম্ভব-কম-ঘনত্বের স্তরটি অসম্ভব পাতলা হতে হতে শেষ পর্যন্ত মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। এত আস্তে আস্তে মিলিয়েছে যে কোথায় যে আয়োনোস্ফিয়ারের শেষ আর কোথায় যে মহাশূন্যের শুরু তা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করবার উপায় নেই। স্পুৎনিক ও লুনিকের পাঠানো তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার কিলোমিটার

উঁচুতেও গ্যাসের পরমাণু বাঁধা পড়তে পারে। সত্যিকারের মহাশূন্য বলে কিছু আছে কিনা, সে-সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অনেকে।

পৃথিবীর সম্পূর্ণ চেহারাটা আরেকবার চোখের সামনে তুলে ধরা যাক। খোসার ওপরে খোসা সাজিয়ে যেমন পেঁয়াজ, তেমনি খোলসের ওপরে খোলস সাজিয়ে পৃথিবী। পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার কিলোমিটার ব্যাসার্ধের তরল লোহার একটি গোলক, তার ওপরে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার পুরু তরল অথচ নমনীয় কঠিন ব্যাসল্ট, তার ওপরে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার পুরু কঠিন গ্রানাইট, গ্রানাইটের ওপরে পাতলা মাটি, মাটির ওপরে বায়ুমণ্ডলের তিনটি স্তর—ট্রোপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, আয়োনোস্ফিয়ার।



ভূত্বকের বিন্যাস

তাই তো চাঞ্চল্য জাগে মাটির গভীর অন্ধকারে,—
রোমাঞ্চিত তৃণে
ধরণী ক্রন্দিয়া উঠে, প্রাণস্পন্দ ছুটে চারিধারে
বিপিনে বিপিনে।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু অন্তত বোঝা গেল যে পৃথিবীর জন্মবৃত্তান্ত এখনো আমরা পুরোপুরি জেনে উঠতে পারিনি। এখনো পর্যন্ত সবটাই অনুমানের ব্যাপার, কারণ পৃথিবীর যখন জন্ম হয়েছিল তখন সেই প্রক্রিয়াটিকে নিজের চোখে দেখার জন্যে কোনো বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন না। অন্যদিকে, পৃথিবীর জন্মের কয়েক-শো কোটি বছর পরে এমন কি আজকের দিনেও যদি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টির সীমানার মধ্যে অন্য একটি নক্ষত্রের অন্য একটি গ্রহমণ্ডলকে পাওয়া যেত তাহলেও দুই গ্রহমণ্ডলের মিল ও অমিলকে খতিয়ে দেখে গ্রহের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক কিছু ধারণাকে যাচাই করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এমন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করতে পারেননি যার সাহায্যে পৃথিবীর নিকটতম নক্ষণের গ্রহমণ্ডলকে পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। পুরোপুরি অনুমানের ওপরে নির্ভর করতে হয়েছে বলেই, এ-অবস্থায়, সঙ্গত কারণেই, পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা তত্ত্ব উপস্থিত হয়েছে। একেবারে হালের তত্ত্বটি সম্পর্কে কিছুটা আভাস আমরা আগের অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করেছি। হালের বিজ্ঞানীরা অনেকেই এই

তত্ত্বকে পুরোপুরি মেতে নিতে পারেননি। কিন্তু হালের বিজ্ঞানীরা মোটামুটি এ-বিষয়ে সবাই একমত যে সূর্যের গা থেকে (যে-কোনো কারণেই হোক) বস্তুপিণ্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার ফলে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে—এ-কথাটি ঠিক নয়। কারণ তাই যদি হত তাহলে পৃথিবীর উপাদানগত গড়ন হত সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এ আলোচনাও আগের অধ্যায়ে আমরা কিছুটা করেছি।

পৃথিবীর উপাদান

পৃথিবীর গোটা বস্তুপিণ্ডে কোন্ উপাদান কী অনুপাতে আছে তার একটি হিসেব এখানে দেওয়া যেতে পারে। হিসেবটি মোটামুটি এই:

গলিত লোহা	... ...	শতকরা	৩৫·০	ভাগ
ঘনবদ্ধ শিলা	... ...	”	৬৪·৬	”
গ্রানাইট	... ...	”	০·৩৬	”
পাললিক শিলা	... ...	”	০·০১৬	”
সমুদ্র	... ...	”	০·০২৪	”

এই হিসেবটি অবশ্যই মৌলিক পদার্থের হিসেব নয়। কিন্তু এই হিসেব থেকেও একথাটি স্পষ্ট যে পৃথিবীর মোট উপাদানের বেশির ভাগটাই হচ্ছে তথাকথিত ভারী মৌলিক পদার্থ, অর্থাৎ যাদের পারমাণবিক ভার হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের তুলনায় (এই দুটিকে বলা হয় হালকা মৌলিক পদার্থ) খুবই বেশি।

কিন্তু পৃথিবীর একেবারে উপরিতলের যতোটুকু অংশ বিজ্ঞানীদের নাগালের মধ্যে রয়েছে (ভূপৃষ্ঠ থেকে কয়েক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত), তাকে নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করে মৌলিক পদার্থের অনুপাতটি জানা যেতে পারে। পৃথিবীর একেবারে বাইরের দিকের খোলসটিতে মৌলিক পদার্থের যে অনুপাত পাওয়া গিয়েছে তা এই :

অক্সিজেন	... ...	শতকরা	৪৬·৪	ভাগ
সিলিকন	.. ...	”	২৭·৬	”
অ্যালুমিনিয়াম	... ...	”	৮·১	”

লোহা	... ...	,,	৫·১	,,
ক্যালসিয়াম	... ...	,,	৩·৬	,,
সোডিয়াম	... ...	,,	২·৮	,,
পটাসিয়াম	... ...	,,	২·৬	,,
ম্যাগ্‌নেসিয়াম	... ...	,,	২·১	,,
টাইটানিয়াম	... ...	,,	০·৭	,,
অন্যান্য	... ...	,,	০·৯	,,
হাইড্রোজেন	... ...	,,	০·১৩	,,

ওপরের এই হিসেবেও দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর উপাদানে ভারী মৌলিক পদার্থেরই আধিক্য, ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করতে হলে পুরনো তত্ত্বকে বাতিল করতে হয়, যে-তত্ত্বে বলা হয়েছে যে সূর্যের বস্তুপিণ্ড থেকে খানিকটা অংশ ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর উৎপত্তি।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে অপর যে তত্ত্বটি ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে সেটিকে মানতে হলেও দু-একটি প্রশ্নের ঠিক জবাবটি যেন পাওয়া যায় না। যদি মানতে হয় যে ধুলো ও গ্যাসের একখণ্ড মেঘ থেকে কঠিন ও শীতল অবস্থায় পৃথিবীর উৎপত্তি তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপের ব্যাখ্যা কী? এ-তত্ত্বের প্রবক্তারা ব্যাখ্যা অবশ্যই একটি দিয়েছেন। "পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে এমন কিছু কিছু পদার্থ আছে যা তেজস্ক্রিয়। ...তেজস্ক্রিয় পদার্থের ধর্ম এই যে এসব পদার্থের পরমাণুর মধ্যে অনবরত ভাঙাচোরা চলে এবং শেষ পর্যন্ত রাসায়নিক বিচারে তার জাত পালটে যায়। ...আর পরমাণুর এই ভাঙাচোরা চলার সময়ে তেজ বেরিয়ে আসে, যার ফলে সৃষ্টি হয় উত্তাপ। একেবারে গোড়ার অবস্থায় যখন নাকি সেই ধুলোর ও গ্যাসের মেঘে কতকগুলো পিণ্ড বা গ্রহাণু তৈরি হয়েছিল তখন এই উত্তাপ শূন্যে মিলিয়ে যেত। কিন্তু গ্রহাণু যখন শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মতো একটি গ্রহের চেহারা নিতে পারল তখন সেই উত্তাপই শূন্যে মিলিয়ে যাবার পথ না পেয়ে জমা হতে লাগল গ্রহের অভ্যন্তরে। অবশ্য খুবই আস্তে আস্তে জমা হয়েছিল। দু-এক বছরে টের পাবার মতো

কিছু নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর জন্মের পর কয়েক-শো কোটি বছর পার হয়েছে। এই কয়েক-শো কোটি বছরে একটু একটু করে উত্তাপ জমা হতে হতে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ কয়েক হাজার ডিগ্রিতে পৌঁছে যাওয়া কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়।" (মহাকাশের ঠিকানা পৃঃ ৬১-৬২)

পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপের এই ব্যাখ্যা কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানীই মেনে নিতে পারেননি।

পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তর থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো নমুনা সংগ্রহ করা যায়নি বটে কিন্তু অন্য একটি পরোক্ষ উপায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের একটি উপাদানগত নিদর্শন পাওয়া অসম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, উল্কাপিণ্ড (meteorites) এমনি একটি নিদর্শন। উল্কাপিণ্ড হচ্ছে গ্রহেরই টুকরো অংশ। এই উল্কাপিণ্ডকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের একটি অপরিহার্য সিদ্ধান্তের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। তা হচ্ছে এই যে পৃথিবী বস্তুপিণ্ড কোনো না কোনো সময়ে সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল। এবং বিজ্ঞানীরা অনেকেই স্বীকার করেন না যে তেজস্ক্রিয়তাজনিত উত্তাপে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড সম্পূর্ণ গলিত বা তরল অবস্থায় পৌঁছতে পারে।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে এখনো পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি না, পৃথিবীর উৎপত্তি কি-ভাবে হয়েছে। ফলে, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের গলিত তরল অবস্থার কারণটিই বা কি তাও আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে ভূপৃষ্ঠ থেকে গর্ত খুঁড়ে পৃথিবীর গভীর অভ্যন্তর থেকে নমুনা সংগ্রহের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। তাছাড়া, আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই মানুষ সশরীরে চাঁদে গিয়ে চাঁদের বস্তুপিণ্ডটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে আসতে পারবে। আশা করা চলে, পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে সঠিক তত্ত্বটি তখন অনুমান করা সম্ভব হবে।

কাজেই এ-আলোচনা এখানেই শেষ করে আমরা পরবর্তী আলোচনায় যেতে পারি। আমরা ধরে নিচ্ছি, পৃথিবীও বস্তুপিণ্ড

কোনো না কোনো সময়ে সম্পূর্ণ গলিত ও তরল অবস্থায় ছিল। অনুমান করা চলে, ফুটন্ত জলে যেমন নিচে থেকে ওপরে এবং ওপর থেকে নিচে চক্রাকার একটি প্রবাহ থাকে—তেমনি পৃথিবীর তরল বস্তুপিণ্ডও কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত উষ্ণ প্রবাহে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। সেই আলোড়নের ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর উত্তাপ দ্রুত কমে আসছিল, অপরদিকে তেমনি অপেক্ষাকৃত ভারী পদার্থগুলো নেমে আসছিল পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এবং অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা পদার্থগুলো উঠে আসছিল পৃথিবীর উপরিতলের দিকে। ফলে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড স্তরে স্তরে ভাগ হয়ে গেছে। পৃথিবীর কেন্দ্রে গিয়ে জড়ো হয়েছে তরল লোহা, তার ওপরে তরল ব্যাসল্ট, তার ওপরে তরল গ্রানাইট। তারপরেও উষ্ণ প্রবাহ পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিতলে এবং উপরিতল থেকে কেন্দ্রে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। এ-ব্যাপারটা যতোই চলে ততোই শীতল হয় পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড, ততোই তার ঘনত্ব বাড়ে। ক্রমে একসময়ে পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড হয়ে ওঠে পাঁকের মতো থক্‌থকে। সে অবস্থায় উষ্ণ প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসে; পৃথিবীর উত্তাপ আগের মতো দ্রুত কমতে পারে না।

এই উষ্ণ প্রবাহ আরো বেশি স্তিমিত হলে একটা কাণ্ড ঘটে। এতদিন পর্যন্ত উষ্ণ প্রবাহের সঙ্গে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ উঠে আসছিল পৃথিবীর উপরিতলে এবং সেখান থেকে শূন্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু উষ্ণ প্রবাহ স্তিমিত হয়ে আসার ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থা তৈরি হয় যখন পৃথিবীর উপরিতল থেকে যতোখানি উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে, তার চেয়ে অনেক কম উত্তাপ উঠে আসে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে। সেই অবস্থায় পৃথিবীর উপরিতল জমাট বাঁধতে শুরু করে।

পৃথিবীর উপরিতলে এই যে পাতলা একটি স্তর ঠাণ্ডা হতে হতে কঠিন অবস্থায় পৌঁছে যায়—এরই নাম ভূত্বক। গোড়ার দিকে এই ভূত্বকটি ছিল খুবই পাতলা। অভ্যন্তরের গ্যাস ও বাষ্পের প্রচণ্ড চাপে

এই ভূত্বকের নানা জায়গায় ফাটল দেখা দিত আর সেই খোলা মুখ দিয়ে তীব্র স্রোতে বেরিয়ে আসত উত্তপ্ত তরল লাভাস্রোত।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভূত্বকটি আরো পুরু হয়ে ওঠে এবং আরো শক্ত। তবে নিশ্চয়ই সব জায়গাতে সমান পুরু ও সমান শক্ত নয়। কতক-গুলো দুর্বল জায়গা থেকে যাচ্ছিল এবং সেখানে আগের মতোই ফাটল দেখা দিচ্ছিল। কোথাও কোথাও অভ্যন্তরের প্রচণ্ড চাপে ভূত্বকের অনেকখানি এলাকা জুড়ে প্রকাণ্ড একটি অংশ বুদ্‌বুদের মতো ফুলে উঠছিল আর তারপরে ফেটে যাচ্ছিল। আর তারপরে, প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণের পরে যেমন হয়ে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে বেরিয়ে আসছিল অভ্যন্তরের তরল বস্তুপিণ্ড।

অনুমান করতে বাধা নেই, এ-ধরনের প্রলয়ঙ্কর ঘটনাগুলো ভূত্বকের সমগ্র অঞ্চলে সমানভাবে ঘটেনি। ফলে ভূত্বকটি খুবই অমসৃণ হয়ে উঠেছিল।

পৃথিবীর উপরিতলের এই সময়কার চেহারা কল্পনা করা চলতে পারে। জলের ফোঁটার মতো নিটোল গোল নয়; এবড়ো-খেবড়ো, উঁচু-নিচু। কোথাও গ্রানাইটের স্তর উঁচু হয়ে রয়েছে, কোথাও মস্ত গহ্বরের তলদেশে বেরিয়ে পড়েছে তরল ব্যাসল্ট। আর এই অ-মসৃণ গোলকটিকে ঘিরে পাক খাচ্ছে আর ফুঁসে উঠছে ধোঁয়া ও বাষ্প, যা থেকে পরে তৈরি হবে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্রের জল।

ক্রমে পৃথিবীর উপরিতলের উত্তাপ আরো কমে যায়। বায়ুমণ্ডলের বাষ্প বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়তে থাকে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ তখনো পর্যন্ত যথেষ্টই উত্তপ্ত ছিল। ফলে বৃষ্টির জল উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের ছোঁয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার রূপান্তরিত হচ্ছিল বাষ্পে। পৃথিবীর সে-সময়কার ছবি আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও শক্ত। মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টির জল রূপান্তরিত হচ্ছে বাষ্পে, নিচ্ছিদ্র ঘন মেঘে আকাশ অন্ধকার, সূর্যের আলো কোনো সময়েই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারছে না, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রের হুংকারে

বায়ুমণ্ডল আলোড়িত। ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে এমনিভাবেই পৃথিবীর উপরিতল রূপান্তরিত হয়ে চলেছিল।

তারপর একসময়ে ভূত্বক আরো ঠাণ্ডা হয়। তখন আর বৃষ্টির জল সঙ্গে সঙ্গেই বাষ্প হয়ে উড়ে যেতে পারে না। ফলে বৃষ্টির জল এসে জমা হতে থাকে ভূত্বকের গহ্বরগুলোতে। এই হচ্ছে আদিম সমুদ্রের সূত্রপাত। তখনো পর্যন্ত ভূত্বক খুব বেশি ঠাণ্ডা হতে পারেনি। ফলে এই আদিম সমুদ্রের জল ছিল পুরোপুরি ফুটন্ত অবস্থায়। ঘন বাষ্প পর্দার মতো ঝুলে ছিল সেই আদিম সমুদ্রের ফুটন্ত জলের ওপরে।

তারপরে ভূত্বক আরো ঠাণ্ডা হয়। বন্ধ হয় সমুদ্রের জলের টগবগ করে ফোটা। কিন্তু তারপরেও বহুকাল পর্যন্ত সমুদ্রের জল থাকে খুবই উত্তপ্ত। অনুমান করা চলে যে সেই আদিম সমুদ্রের জলও ছিল লবণাক্ত, কারণ পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যে উত্তপ্ত তরল লাভাস্রোত বেরিয়ে আসত তার মধ্যে লবণের অভাব ছিল না।

ভূত্বকটি তখনো পর্যন্ত ছিল খুবই পল্‌কা। অভ্যন্তরের চাপে প্রায়ই নানা জায়গায় ফাটল দেখা দিত। আর সেই ফাটলের মুখ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসত লাভাস্রোত। গড়াতে গড়াতে কখনো কখনো সেই স্রোত গিয়ে মিশত সমুদ্রের জলের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ঘটত প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ। বাষ্পের ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যেত চারদিক। পৃথিবীর সেই আদিম অবস্থা যে কী ভয়ংকর ছিল তা শুধু কল্পনা করা চলে।

পৃথিবী আরো ঠাণ্ডা হয় এবং ভূত্বকের গভীরতা বাড়তে থাকে। বর্তমানে ভূত্বকের গভীরতা পঞ্চাশ কিলোমিটারের কাছাকাছি। অর্থাৎ গ্রানাইটের পুরো স্তরটি কাঠিন্য লাভ করেছে। শুধু গ্রানাইটের স্তরই নয়; সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসল্টের স্তর বেরিয়ে পড়েছিল সেখানে ব্যাসল্টও তরল থাকেনি: জমাট বেঁধে চারপাশ থেকে গ্রানাইটের উঁচু স্তরটিকে এঁটে ধরেছে।

অনুমান করা চলে, পৃথিবীর উপরিতল শীতল ও কঠিন হবার পরে

ভূত্বকের উত্তাপ নির্ভর করেছে সূর্যের উত্তাপ বিকীরণের ওপরে। অর্থাৎ সূর্যের উত্তাপে ভূত্বক যতোটুকু উত্তপ্ত হতে পারে ততোটুকুই তার সম্বল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের বিপুল উত্তাপের যে পরিমাণ অংশ শেষ পর্যন্ত ভূত্বক পর্যন্ত পৌছতে পারে তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে পৃথিবীর উপরিতল কাঠিন্য লাভ করার পরে গত তিনশো কোটি বছরে পৃথিবীর উত্তাপ মাত্র ২০° সেন্টিগ্রেড কমেছে। অর্থাৎ ১° সেন্টিগ্রেড উত্তাপ কমতে সময় লাগে পনেরো কোটি বছর।

আবার, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের পর জানা গেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যতোটুকু উত্তাপ পৃথিবীর উপরিতলে উঠে আসে তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার ফল। তার মানে বলা চলে, ভূত্বক তৈরি হবার পরে গত তিনশো কোটি বছরে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ প্রায় একই রকম থেকে গেছে, প্রায় কিছুই কমেনি।

ভূত্বকের তেজস্ক্রিয়তা

এইমাত্র বলা হল, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যতোটুকু উত্তাপ পৃথিবীর উপরিতলে উঠে আসে, তার বেশির ভাগটাই হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার ফল। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ কিভাবে আপনা থেকেই রূপান্তরিত হয়ে চলে। এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার একটা লক্ষণ হচ্ছে, উত্তাপ বিকীরণ। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ খুবই কম। এক টন গ্রানাইট শিলায় মাত্র ৯ গ্রাম ইউরেনিয়াম ও ২০ গ্রাম থোরিয়াম পাওয়া যেতে পারে। ব্যাসল্ট শিলায় পাওয়া যায় আরো কম; প্রতি টনে মাত্র ৩·৫ গ্রাম ইউরেনিয়াম ও ৭·৭ গ্রাম থোরিয়াম। আবার একথাও মনে রাখা দরকার যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উত্তাপ-বিকীরণও পরিমাণের দিক থেকে খুবই কম। এক টন বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম থেকে যে পরিমাণ উত্তাপ পাওয়া যায় তার সাহায্যে এক কাপ কফি গরম করতে

হলে ত্রিশ বছর সময় লাগবে।

কিন্তু যতো সামান্যই হোক, তেজস্ক্রিয় পদার্থের উত্তাপ বিকীরণের ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করা চলে না। হিসেব করে দেখা গেছে, পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যে-পরিমাণ উত্তাপ ভূত্বকে পৌঁছয় আর ভূত্বকের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে যে-পরিমাণ উত্তাপ বিকীরিত হতে পারে—এ দুটো প্রায় সমান। এ থেকে একটি অবধারিত সিদ্ধান্ত টানা চলে ; পৃথিবীর সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপরিতলের দিকেই রয়েছে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থ একেবারেই নেই। এই সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল তার প্রমাণও নানাভাবে পাওয়া গেছে।

যাই হোক আমরা কিন্তু এতে লাভবান হয়েছি। এত অল্প পরিসরের মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ জড়ো হয়েছে বলেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে হয়তো কোনো কালেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া যেত না।

অভ্যন্তরের উত্তাপ

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর উপরিতলে ফলের খোসার মতো কঠিন একটি আবরণ পড়ার পর থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ খুব বেশি কমেনি। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ হচ্ছে ২০° সে. বা ৬৮° ফা. এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে রওনা হলে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সে. হিসেবে বা প্রতি হাজার ফুটে ১৬° ফা. হিসেবে উত্তাপ বেড়ে চলে। এই হিসেবটা মনে রাখলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার নিচে উত্তাপ হওয়া উচিত ১২০০° সে. বা ২২০০° ফা.। অনুমানটা মিথ্যে নয়। আগ্নেয়গিরি থেকে যে উত্তপ্ত লাভাপ্রবাহ বেরিয়ে আসে তার উত্তাপ এই মাত্রাতেই থাকে।

তাই বলে একথা যেন মনে না করা হয় যে ভূপৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বরাবরই প্রতি হাজার ফুটে ১৬° ফা. হিসেবে উত্তাপ বেড়ে চলেছে।

প্রথম কয়েক কিলোমিটার অতিক্রান্ত হবার পরে উত্তাপ বাড়ে খুবই আস্তে আস্তে ; প্রতি কিলোমিটারে ৩° সে. হিসেবে, বা, বলা চলে, আগে যে হারে বাড়ছিল তার চেয়ে আরো দশ ভাগ কম হারে। অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যতোই এগিয়ে যাওয়া যাবে, ততোই দেখা যাবে যে ওপরের স্তরে আর নিচের স্তরে উত্তাপের তারতম্য কমে কমে আসছে।

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলের উত্তাপ কয়েক শো কোটি বছর ধরে মোটামুটি একই মাত্রায় থেকে গেছে।

ভূত্বকের ভাঁজ

পৃথিবীর মোট বস্তুপিণ্ডের হিসেব যদি নেওয়া হয় তাহলে বলতে হবে, পৃথিবীর উত্তাপ খুব বেশি কমেনি, প্রায় অক্ষয় রয়ে গেছে। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কে একথা খাটে না। যেমন, পৃথিবীর সবচেয়ে বাইরের স্তর গ্রানাইট অনেকখানি উত্তাপ খুইয়ে বসে কঠিন হয়ে গেছে। তার নিচের স্তর ব্যাসল্ট যদিও এখনো পর্যন্ত তরল—কিন্তু এই স্তরটির উত্তাপের ভাণ্ডারও কমের দিকে। ফলে ব্যাসল্ট স্তরের একেবারে ওপরের দিকে পাতলা সরের মতো কাঠিন্য এসেছে ; বিশেষ করে সমুদ্রের তলদেশে যেখানে ব্যাসল্ট স্তরের ওপরে গ্রানাইট স্তর নেই সেখানে তো বটেই। আমরা জানি, বস্তু উত্তপ্ত হলে আয়তনে বাড়ে, শীতল হলে আয়তনে কমে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড সম্পর্কেও নিশ্চয়ই এই নিয়ম খাটবে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের অন্তত কয়েকটি স্তরে উত্তাপ যে অনেক পরিমাণে খোয়া গেছে তার একটি চাক্ষুষ প্রমাণ হচ্ছে আমাদের এই ভূত্বকটি। মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে, ভূপৃষ্ঠ থেকে চারশো কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত এই উত্তাপ খোয়া যাবার এলাকা প্রসারিত। তাহলে অবশ্যই ধরে নিতে হয় যে উত্তাপ খোয়া যাবার সঙ্গে সঙ্গে এই এলাকাটি আয়তনেও কমেছে।

উত্তাপ কি-পরিমাণে কমেছে তার হিসেবটি আগে জানা দরকার।

অন্তত ১২০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তবে নিশ্চয়ই সর্বত্র সমানভাবে নয়। ওপরের দিকে বেশি, নিচের দিকে কম। তার মানে, আমরা ধরে নিতে পারি, ভূপৃষ্ঠ থেকে ৪০০ কিলোমিটার নিচে পর্যন্ত গড়ে উত্তাপ কমেছে ৬০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

এবার দেখা যাক, ৬০৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তাপ কমে যাবার দরুন পৃথিবীর উপরিতলের চারশো কিলোমিটার পুরু স্তরটিতে সংকোচনের পরিমাণ ও ধরন কী হবে। হিসেব থেকে দেখা যায়, সংকোচনের পরিমাণ শতকরা ছ-ভাগ। চারশো কিলোমিটারের শতকরা ছ-ভাগ হচ্ছে ২৪ কিলোমিটার। তার মানে, আমরা বলতে পারি, ৬০০ ডিগ্রি সেণ্টগ্রেড উত্তাপ খুইয়ে ৪০০ কিলোমিটার পুরু স্তরটি হয়ে উঠবে ৩৭৬ কিলোমিটার।

সংকোচনের মাত্রাটি জানা যাচ্ছে। কিন্তু ধরন? সংকোচন কি সর্বত্র সমানভাবে হবে? নিশ্চয়ই নয়, কারণ পৃথিবীর এই একেবারে উপরিতলের বস্তুপিণ্ডও স্তরে স্তরে ভিন্নধর্মী। ভূত্বকের ঠিক নিচেই যে ব্যাসল্ট স্তরটির কথা বলা হয়েছে তার নমনীয় কাঠিন্যে সংকোচন একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু বিপদ বাধবে ভূত্বকটিকে নিয়ে। এই ভূত্বকটি তরলও নয়, নমনীয়ও নয়। অথচ ভূত্বকের ঠিক নিচেই চব্বিশ কিলোমিটারের একটা ফাঁক থেকে যাবে তা তো আর সম্ভব নয়। এই ফাঁক ভরাট হতেই হবে। কি ভাবে ভরাট হবে? আমকে শুকিয়ে আম্‌সি করবার সময়ে যেমন দেখা যায় আমের খোসায় ভাঁজ পড়েছে, তেমনি এই ফাঁক ভরাট করবার জন্যে ভাঁজ পড়বে ভূত্বকে। সারিবদ্ধ এই ভাঁজগুলোকেই আমরা বলি পর্বতমালা।

ভাঁজ-পড়ার ব্যাপারটাকে একটা অঙ্কের হিসেবে ফেলা যেতে পারে। ২৪ কি. মি. ফাঁককে ভরাট করতে হলে, হিসেব করে দেখানো যেতে পারে, পৃথিবীর পরিধি কমবে প্রায় ১৬০ কি. মি.। আবার, পৃথিবীর পরিধি ১৬০ কি. মি. কমে যাবার দরুন ভূপৃষ্ঠের আয়তন কমে যাবে প্রায় পঁচিশ লক্ষ কিলোমিটার। কী ভাবে কমবে? না, ভাঁজ পড়ে।

তাহলে বলা চলে, ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার দরুন এই পঁচিশ লক্ষ কিলোমিটার আয়তনের শিলা ভূপৃষ্ঠ থেকে ঠেলে ওপরের দিকে উঠবে। বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর জন্মের থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে যতো পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছে তার মোট আয়তন এই হিসেবের মধ্যেই পড়ে।

ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ফলেই যে পর্বতমালার সৃষ্টি—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই। কিন্তু পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলেই যে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে—এই ব্যাখ্যা সকলে মানেন না। কারণ দেখা যায় ভূপৃষ্ঠে সাইবেরিয়া বা পূর্ব কানাডার মতো বিরাট বিরাট এলাকা আছে যেখানে পর্বতের চিহ্নমাত্র নেই—অর্থাৎ ভূত্বকে কোনো রকম ভাঁজ পড়েনি। আবার কোনো কোনো এলাকায় ঘনসংবদ্ধ পর্বতমালা—ভূত্বকে ভাঁজের পর ভাঁজ। বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলে যে ফাঁক সৃষ্টি হয় তা ভরাট করবার জন্যেই যদি ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে থাকে—তাহলে সেই ভাঁজ ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমানভাবে পড়ছে না কেন? অবশ্য এ-প্রশ্নের জবাবও আছে। ভাঁজ সমানভাবে পড়ে না কারণ ভূত্বক সর্বত্র সমান জোরালো নয়; স্বাভাবিক নিয়মেই ভাঁজ পড়ে ভূত্বকের দুর্বলতম জায়গাগুলোতে; এজন্যেই ভূত্বকের ভাঁজ-পড়ার মধ্যে এমন একটা বিশৃঙ্খলা।

পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হচ্ছে এবং তার ফলে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ছে—এই ব্যাখ্যা যাঁরা মানেন না, তাঁদের আরো একটা বড়ো যুক্তি আছে। তাঁরা বলেন, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড লক্ষ লক্ষ বছর ধরে প্রায় একই উত্তাপে রয়ে গেছে; পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে যেটুকু উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে উঠে আসে তা হচ্ছে তেজস্ক্রিয়তার ফল; কাজেই, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড শীতল হচ্ছে—কথাটা ঠিক নয়; সুতরাং পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড উত্তাপ খুইয়ে খুইয়ে সংকুচিত হচ্ছে—এই ব্যাখ্যাও পুরোপুরি ঠিক নয়।

তবে যে যাই বলুন, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ড সংকুচিত হচ্ছে—এই ঘটনাকে মেনে নিলে যতো সহজে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা

করা চলে এমন আর কোনো কিছুতে নয়। আর এই ঘটনাকে অস্বীকার করলে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে পাল্টা কোনো ঘটনা হাজির করা যাচ্ছে না। এ-অবস্থায় মন খোলা রেখে এই ব্যাখ্যাটিকে মেনে নেওয়া চলতে পারে।

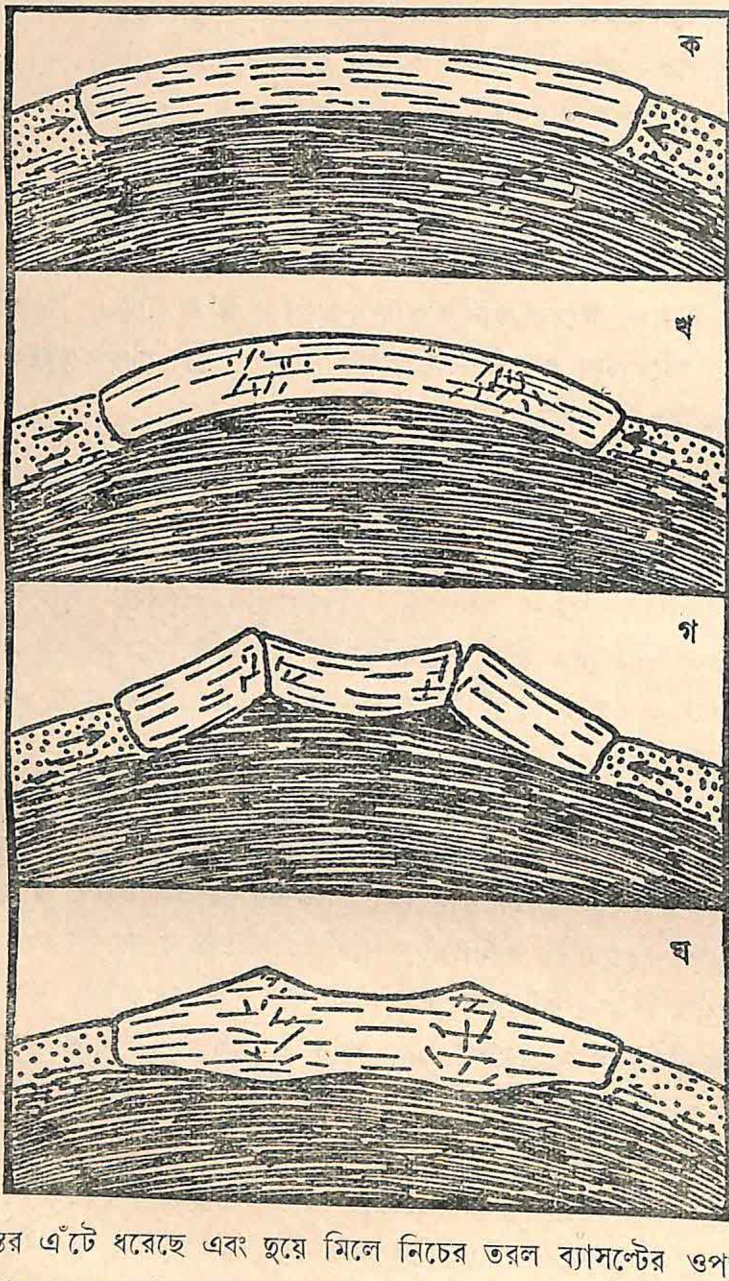
অবশ্য এমন কথা কেউ-ই বলেন না যে পৃথিবীর যেখানে যতো পর্বত আছে—সবই পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সংকোচনজনিত ভাঁজ-পড়ার ফল। অনেক সময় অনেক স্থানীয় কারণেও ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করবার আগে জেনে নেওয়া যাক—ভূত্বকের ভাঁজ ঠিক কি-ধরনের হয়।

ভাঁজের ধরন

আগেই বলেছি, পৃথিবীর উপরিতলে শিলাস্তরের দুটি বিন্যাস—মহাদেশের তলদেশে গ্রানাইট, মহাসমুদ্রের তলদেশে ব্যাসল্ট। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ব্যাসল্টের জোর গ্রানাইটের চেয়ে অনেক বেশি। এক টুকরো গ্রানাইটকে যতো সহজে ভেঙে ফেলা যায়, এক টুকরো ব্যাসল্টকে ততো সহজে নয়।

এবার ছবিটি কল্পনা করা যাক ; পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলে ভূত্বককে ভাঁজ পড়েছে। কোথায় ভাঁজ পড়বে ? ভাঁজ পড়বে ভূত্বকের দুর্বলতম জায়গায়। ভূত্বকের দুর্বলতম জায়গা হচ্ছে যেখানে মহাদেশের গ্রানাইটের সঙ্গে মহাসমুদ্রের ব্যাসল্টের জোড় লেগেছে। এজন্যেই দেখা যায়, মহাদেশের উপকূলরেখায় যতো বেশি পর্বত ও আগ্নেয়গিরি এমন আর কোথাও নয়। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসমুদ্রকে ঘিরে আগ্নেয়গিরির এক বেষ্টনী আছে, যাকে বলা হয় 'অগ্নিবলয়' (ring of fire)।

ভূত্বকের ভাঁজ-পড়ার ব্যাপারটাকে আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে হলে পরের পৃষ্ঠার ছবির দিকে তাকাতে হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে চারটি পৃথক ছবিতে দেখানো হয়েছে। ক-চিহ্নিত ছবিতে দেখা যাবে, মহাদেশের কঠিন গ্রানাইট স্তরকে মহাসমুদ্রের কঠিন ব্যাসল্ট



স্তর এঁটে ধরেছে এবং দুয়ে মিলে নিচের তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। মনে রাখা দরকার যে মহাদেশের কঠিন গ্রানাইট স্তর এবং মহাসমুদ্রের কঠিন ব্যাসল্ট স্তর—এ দুয়ে মিলেই

ভূত্বক। এই ভূত্বকটি যখন কুঁকড়ে যেতে চেষ্টা করে—তখনকার অবস্থা দেখানো হয়েছে খ-চিহ্নিত ছবিতে। এই অবস্থায়, ভূত্বকটি আগে যতোখানি জায়গা জুড়ে ছিল, এখন তার চেয়ে কম জায়গা জুড়ে থাকতে চাইছে; ফলে মহাসমুদ্রের কঠিন ব্যাসল্ট স্তরের প্রবল একটা চাপ পড়ে মহাদেশের কঠিন গ্রানাইট স্তরের ওপরে। কঠিন গ্রানাইট স্তরটি এই চাপ সহ্য করতে না পেরে ধনুকের মতো বেঁকে যায়। দ্বিতীয় ছবিতে এই অবস্থা দেখানো হয়েছে। কিন্তু আগেই বলেছি, সমগ্র ভূত্বকটি রয়েছে তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায় এবং যে-কোনো ভাসমান বস্তুর মতো এই ভূত্বকেরও ভারসাম্য বজায় রাখার প্রশ্ন আছে। একটি ভাসমান বস্তুর খানিক অংশ ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে গেলে সেই ভারসাম্য টলে ওঠে এবং সেই অবস্থা বজায় থাকতে পারে না। ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে ভাসমান বস্তুটির খানিকটা অবস্থান্তর হবেই। তৃতীয় ও চতুর্থ ছবিতে এই অবস্থান্তরের গোড়ার ও শেষের পর্যায় দেখানো হয়েছে। চতুর্থ ছবির দিকে তাকালেই বোঝা যাবে, সমতল মহাদেশের ওপরে সৃষ্টি হয়েছে পর্বতমালা। প্রক্রিয়াটিকে যদিও বইয়ের এক পৃষ্ঠায় পর-পর চারটি ছবি এঁকে দেখানো হল, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে, এবং প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে আরো অনেক বেশি জটিলতা দেখা দেয়।

যেমন, ছবিতে যতো সহজভাবে দেখানো হয়েছে, বাস্তবে ভূত্বকের ভাঁজ অত সহজ নয়। একটা টান-করে-পাতা টেবিলক্লথের দু-প্রান্তে হাত রেখে হাতদুটোকে যদি ক্রমশ কাছাকাছি সরিয়ে আনা যায় তাহলে দেখা যাবে, টেবিলক্লথে ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে। গোড়ার দিকে ভাঁজগুলোর মধ্যে কোনো জটিলতা থাকবে না, জলের ঢেউয়ের মতো পর-পর সাজানো থাকবে। কিন্তু তারপরে হাত-দুটো যতোই কাছাকাছি সরে আসবে ততোই জটিলতা দেখা যাবে ভাঁজের মধ্যে। আগে ভাঁজগুলোর মধ্যে যে একটা জ্যামিতিক ছন্দ ছিল তা চুরমার হয়ে যাবে; কোথাও বা ভাঁজের ওপরে ভাঁজ

উঠবে, তার ওপরে হয়তো আরেকটা ভাঁজ; বা প্রথম দু-একটা ভাঁজ মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে এবং তার ওপরে আবার নতুন ভাঁজ উঠবে—অর্থাৎ ভাঁজে-ভাঁজে মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে ফুটে উঠবে এক বিচিত্র ভঙ্গিমা, অনেকটা খেয়ালী শিশুর হাতের চাপড় খাওয়া একতাল মাটির মতো।

ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূত্বকের ভাঁজকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে মোটামুটি দুটি মৌল শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একটির নাম তাঁরা দিয়েছেন ভাঁজ (fold), অপরটির নাম চ্যুতি (fault)।

শিলাস্তরের ঢেউয়ের মতো ওঠা-নামাকে বলা হয় ভাঁজ। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই সাক্ষ্য দেবেন যে শিলাস্তরের ওঠা-নামা জলের ঢেউয়ের মতো ছন্দ বজায় রেখে চলে না। নানা ধরনের ও নানা ভঙ্গিমার ভাঁজ দেখা যেতে পারে। এই ধরন ও ভঙ্গিমা অনুসারে ভাঁজকে আবার চারটি উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

কিন্তু ভূত্বকের সংকোচন যদি খুবই তীব্র মাত্রায় পৌঁছয় তাহলে ভাঁজটির মধ্যেও জটিলতা দেখা দেয়। হয়তো দেখা যাবে, ভাঁজের শীর্ষদেশ (vault) এমনই একটা খাড়া লাফ দিতে চেয়েছিল যে তার ফলে ভারসাম্য বজায় থাকেনি; ভাঁজের মধ্যে ফাটল দেখা দিয়েছে; আর ভাঁজের শীর্ষদেশটি হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পার্শ্বদেশের (limb) ওপরে। এ-অবস্থায় গোটা ছবিটি আর ভাঁজ থাকে না, হয়ে ওঠে চ্যুতি। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, শিলাস্তরে নির্ভেজাল ভাঁজ খুবই কম। ভাঁজ ও চ্যুতি মিলিয়ে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

কঠিন শিলাস্তরে ভাঁজ পড়াটাই হয়তো অনেকের কাছে এখনো অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। কিছুকাল আগে এমন কি ভূ-বিজ্ঞানীদের মনেও এই অবিশ্বাস ছিল। তখন তাঁরা ব্যাপারটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ভূত্বকের সমস্ত ভাঁজই পড়েছিল ভূত্বকের কঠিন শিলাস্তর গড়ে ওঠবার ঠিক আগের অবস্থায়। কিন্তু হালের বিজ্ঞানীরা হাতেকলমে প্রমাণ করেছেন যে প্রচণ্ড চাপে কঠিনতম শিলাতেও ভাঁজ পড়তে পারে। তাছাড়া নিশ্চিত প্রমাণও তো

পাওয়া গিয়েছে যে ভাঁজের ফলে সৃষ্ট এখনকার অনেক পর্বতের চূড়োই একসময়ে সমুদ্রের নিচে ছিল।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ভূত্বক সংকুচিত হলে যতো কিছু ভাঙাচোরা তা সবই কি শুধু গ্রানাইট স্তরে? ব্যাসল্ট স্তরে কি এই বিপুল ভাঙাচোরার কোনো সাক্ষ্যই থাকে না? আগেই বলেছি, ব্যাসল্টের চেয়ে গ্রানাইট অনেক বেশি দুর্বল; এবং সবল ও দুর্বলের ঠেলাঠেলিতে মার খেতে হয় দুর্বলকেই। তবে সবলের গায়েও কি আঁচড় পড়ে না? নিশ্চয়ই পড়ে। মহাসমুদ্রের তলদেশের ব্যাসল্ট স্তরেও ফাটল আছে, খাদ আছে, উঁচু উঁচু চুড়ো আছে। মহাসমুদ্রের তলদেশও মহাদেশের মতোই অ-মসৃণ। তবে সমুদ্রতলের অমসৃণতা যতোটা না ভূত্বকের সংকোচনের ফলে, তার চেয়ে বেশি অন্যান্য কারণে। সে-আলোচনায় আমরা পরে আসব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভূত্বকের সংকোচন হবার সময়ে কঠিন ব্যাসল্টের স্তর কঠিন গ্রানাইটের স্তরকে ঠেলা দেয়। কতটা জোরে ঠেলা দেয় তারও একটা মাপ বার করে নেওয়া যেতে পারে। আগেই বলেছি, পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলে পৃথিবীর ব্যাস কমেছে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। শতকরা হিসেবে মোটামুটি ০·৫ ভাগ। অর্থাৎ, পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত ভূত্বকের গ্রানাইট স্তর যতোখানি ঠেলা খেয়েছে তার ফলে একটি গ্রানাইট গোলকের ব্যাস শতকরা আধ-ভাগ কমে যেতে পারে।

এবার পরীক্ষাগারে একটি গ্রানাইট-গোলক নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা যাক্, কতখানি চাপে গ্রানাইট-গোলকটি ভেঙে যায়। দেখা গেছে যতোখানি চাপে গ্রানাইট-গোলকটির ব্যাস শতকরা আধভাগ কমে, তার পাঁচভাগের একভাগ চাপেই গ্রানাইট-গোলকে ভাঙন ধরে। এ থেকে এ সিদ্ধান্ত টানা চলে যে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত পাঁচবার ভূত্বকের গ্রানাইট স্তরে বিপুল ভাঙাচোরার এক-একটি পর্ব পার হয়েছে। আবার যদি একথা মনে রাখা যায় যে ভূত্বকের গ্রানাইট-স্তরের কোনো কোনো জায়গা খুবই দুর্বল, নির্ধারিত মাপের

চেয়েও আরো অনেক কম মাপের ঠেলাতেই সে-সব জায়গায় ভাঙন ধরতে পারে—তবে এই পাঁচ সংখ্যাটিকে দ্বিগুণ করে নেওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ, পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে দশবার ভূত্বকে পর্বতমালা তৈরি হয়েছে। পরে আমরা দেখব, এই সিদ্ধান্ত মোটামুটি সঠিক। ভূত্বকের শিলাস্তরে দশটি বিপ্লবেব সুস্পষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যায়; এই পৃথিবী দশবার পর্বতাকীর্ণ হয়েছে, দশবার সমতল।

আমরা আলোচনা করছিলাম ভূত্বকের ভাঁজ নিয়ে। সে-আলোচনা শেষ করা যাক।

ইওরোপের আল্প্স পর্বতমালা এবং এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা তৈরি হয়েছে ভূত্বকে এমনি কতকগুলো ভাঁজ পড়ার ফলে। খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার যে এক-একটি ভাঁজ পড়তে সময় লেগেছে লক্ষ লক্ষ বছর। যেমন, বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, হিমালয়-তৈরির প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল অন্তত ছ-কোটি বছর আগে এবং হয়তো এখনো শেষ হয়নি। আল্প্স পর্বতমালাও বয়সের দিক থেকে এর চেয়ে নবীন নয়। হিমালয় পর্বতমালার ভাঁজ-গুলোকে সমান করে দিলে ভারত ও সাইবেরিয়ার দূরত্ব আরো অন্তত সাড়ে-ছশো কিলোমিটার বেড়ে যাবে।

ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার আরো অনেক সাক্ষ্য আছে; যেমন, উত্তর আমেরিকার আপালেশিয়ান ও রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, সুইজারল্যাণ্ডের জুরা, ইত্যাদি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠের কয়েকটি বিশিষ্ট পর্বতমালা হচ্ছে ভূত্বকের ভাঁজ। এই ভাঁজগুলো ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় একই সময়ে পড়তে শুরু করেছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয়ই বলা চলে যে এই ভাঁজ-পড়ার কারণগুলো বিচ্ছিন্ন নয়—কোনো একটা মূল কারণে এতসব ওলোট-পালোট। সেই মূল কারণটি হচ্ছে ভূত্বকের সংকোচন। সংকোচন কেন—এ-প্রশ্নের জবাবে মতভেদ থাকতে পারে, তবে যে-জন্যেই হোক, ছ-কোটি বছর আগে আমাদের

এই ভূত্বক কুঁকড়ে খানিকটা ছোট হয়ে যেতে চেয়েছিল বলেই আজকের পৃথিবী এত অসমতল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, গিরিশৃঙ্গ-মালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না।

পর্বতের তলদেশ

গিরিশৃঙ্গকে বাইরে থেকে দেখে মনে হয় যেন এক পুঞ্জীভূত স্পর্ধা পৃথিবীর এই সমতল মাটি ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে মাথা তুলেছে। এই বিপুল বস্তুপিণ্ড যেন খানিকটা অবহেলার সঙ্গেই পৃথিবীর মাটিকে ছুঁয়ে আছে মাত্র—বনস্পতির মতো মাটির গভীরে শিকড় বিস্তার করেনি।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদেরও এই ধারণা ছিল। হাজার হাজার ফুট উঁচু গিরিশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে হতে পারত, শিলার পরে শিলা স্তূপ হয়ে হয়ে এক বিরাট বিপুল স্ফীতির রূপ নিয়েছে এবং এই স্ফীতি পৃথিবীর উপরিতলের নিতান্তই বাইরের দিককার ব্যাপার। কৃত্রিম পাহাড় তৈরি করতে হলে যেমন মাটি খুঁড়তে হয় না, সমতল জমির ওপরেই মাটি আর পাথরের স্তূপ খাড়া করে তা তৈরি হতে পারে—তেমনি মনে হয়েছিল, গিরিশৃঙ্গও বুঝি সমতল জমির ওপরে শুধু ভরটুকু রেখে খাড়া হয়ে আছে ; জমির ওপরকার এই স্ফীতির জন্যে জমির নিচে কোনো অবস্থান্তর হয়নি।

সাম্প্রতিক কালে জানা গেছে যে এই ধারণা ভুল। একটি পর্বতের যেটুকু অংশ জমির ওপরকার স্ফীতি হিসেবে চোখে পড়ে, তার চেয়ে অনেক বেশি অংশ থাকে জমির নিচে। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে পর্বতের বেশির ভাগ অংশই থাকে জমির নিচে। বনস্পতি যেমন জমির ওপরে খাড়া হয়ে থাকবার জন্যে জমির নিচে বহুদূর পর্যন্ত শেকড় বিস্তার করে, তেমনি পর্বতের তলদেশও জমির নিচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে বনস্পতির শেকড় মাটিকে আঁকড়ে ধরে আর পর্বতের তলদেশ তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায়

থাকে। কিন্তু গোড়ার কথাটা প্রথমে বলে নেওয়া যাক।

পর্বতের যে একটা গভীর তলদেশ আছে তা আবিষ্কৃত হয় মাধ্যাকর্ষণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে। আমরা জানি, প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব একটি টান আছে এবং বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু অন্য প্রত্যেকটি বস্তুকে টানছে। এই টানকেই আমরা বলি মহাকর্ষ। যে বস্তু যতো বড়ো, তার টানও ততো বেশি। যেমন, পৃথিবী মানুষকে টানছে, আবার মানুষও পৃথিবীকে টানছে ; কিন্তু মানুষের তুলনায় পৃথিবী এত বড়ো যে মানুষের টানের তুলনায় পৃথিবীর টানটাও প্রচণ্ড রকমের বেশি। সুতরাং মানুষের টানে পৃথিবী এতটুকু টলে না কিন্তু পৃথিবীর টানে মানুষ জমির সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। একটি পেণ্ডুলামকে ঝুলিয়ে দিলে পেণ্ডুলামটি যে খাড়া ভাবে ঝুলতে থাকে তার কারণ কি ? কারণ, পৃথিবীর এই মাধ্যাকর্ষণের টান। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান আসছে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে, কাজেই পেণ্ডুলামটিকেও পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে মুখ করে খাড়াভাবে ঝুলে থাকতে হয়।

এবার কল্পনা করা যাক, একটি পর্বতের একপাশে একটি পেণ্ডুলাম ঝুলিয়ে দেওয়া হল। আশা করা চলে, পেণ্ডুলামটি এবারে আর পুরোপুরি খাড়া অবস্থায় থাকবে না ; কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান যেমন পেণ্ডুলামটিকে টানবে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে, তেমনি পর্বতের বিপুল বস্তুপিণ্ডের টান পেণ্ডুলামটিকে টানবে পর্বতের কেন্দ্রের দিকে এবং দু-দিকের এই দুই টানের মাঝখানে পড়ে পেণ্ডু-লামটি খানিকটা হেলে যাবে।

বিজ্ঞানীরা কাগজে-কলমে হিসেব করে দেখলেন, কোন্ পর্বত পেণ্ডুলামকে কতটা হেলিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখা গেল, ব্যাপারটা তা ঘটছে না। যেমন, এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গের বেলায় দেখা গেল, পেণ্ডুলামটি হিসেবের চেয়েও তিনভাগ কম হেলে পড়েছে।

এমনটি কেন হবে ?

সবচেয়ে সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, পর্বতের বস্তুপিণ্ডকে বাইরের থেকে দেখে যতোটা বিপুল মনে হয় আসলে তা নয়, পর্বতের ভেতরে অনেকটা অংশই ফাঁপা। অর্থাৎ, পর্বত যেন মাটির ওপরে বসানো আধখানা ডিমের খোলার মতো; যতোখানি জায়গা জুড়ে আছে, ততোখানি বস্তু নেই। কাজেই, যতোখানি টান হওয়া উচিত বলে হিসেব করা যায়, বাস্তবে ততোখানি টান হয় না।

এই ব্যাখ্যা ভুল। ভূত্বকের গড়ন ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই এ-সিদ্ধান্ত করলেন।

আসল ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, জমির ওপরকার স্ফীতিটুকু পর্বতের মোট বস্তুপিণ্ডের একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; জমির নিচে পর্বতের এক বিপুল তলদেশ আছে এবং সেই তলদেশটি রয়েছে তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায়।

কথাটার অর্থ ভালো করে বোঝা দরকার। জলের ওপরে হিমশৈল যখন ভেসে থাকে তখন জলের ওপরে জেগে থাকে মাত্র তার ন-ভাগের একভাগ, ন-ভাগের আট-ভাগ অংশ ডুবে থাকে জলের ভেতরে। শুধু হিমশৈল নয়, প্রত্যেক ভাসমান বস্তুই খানিকটা গা ডুবিয়ে ভাসে। কতখানি গা ডুবিয়ে ভাসবে তার হিসেবটা পাওয়া যায় আর্কিমিডিসের সূত্র থেকে। হিমশৈল ন-ভাগের আট-ভাগ গা ডুবিয়ে ভাসে, কারণ এতখানি না ডোবা পর্যন্ত স্থানান্তরিত জলের ওজন হিমশৈলের মোট ওজনের সমান হয় না। তেমনি আমরা জানি, আমাদের এই ভূত্বকটিও তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায় আছে—এবং আর্কিমিডিসের সূত্রের হিসেবমতো খানিকটা গা ডুবিয়ে ভাসছে। কিন্তু যেখানেই ভূত্বকের ওপরে পর্বতের স্ফীতি ওঠে সেখানেই ভূত্বকটি ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্যে অনেকখানি বেঁকে গিয়ে তরল ব্যাসল্টের মধ্যে অনেকখানি ডুবে যায়। অর্থাৎ ভূত্বকের ওপরে-নিচে পাল্লা দিয়ে যেন দুটি পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। যেমন হিমশৈলের জলের ওপরে জেগে-থাকা অংশটুকুই সব নয়, তেমনি পর্বতেরও জমির ওপরে জেগে থাকা

অংশটুকু নিতান্তই অংশমাত্র, এবং এই অংশটুকুর ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে জমির নিচে এক বিপুল তলদেশ একটা ওল্টানো পর্বতের মতো তরল ব্যাসল্টের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে তো পর্বতের পাশে এসেও পেণ্ডুলামের পুরোপুরি খাড়া থাকা উচিত, একটুও হেলে পড়া উচিত নয়। কিন্তু খানিকটা যে হেলে পড়ে এটা বাস্তব সত্য। এ ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যে বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে পর্বতের তলদেশে ভূত্বকের এই বিকৃতি সত্ত্বেও পুরোপুরি ভারসাম্য আসেনি, কারণ ভূত্বকেরও একটা কাঠিন্য ও অনমনীয়তা আছে, যা খানিকটা বাড়তি ওজনকে সহ্য করতে পারে। এই বাড়তি ওজনটুকুই পেণ্ডুলামকে হেলিয়ে দিচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে মানুষের তৈরি কৃত্রিম পাহাড় অনেক আছে ; যেমন, মিশরের পিরামিড। এসব ক্ষেত্রে পাহাড়ের ওজন পুরোপুরি বহন করছে ভূত্বক—তরল ব্যাসল্টে ভারসাম্য বজায় রাখার কোনো প্রশ্ন নেই। দেখা গেছে, কৃত্রিম পাহাড়ের কাছে পেণ্ডুলাম যতোটা হেলে পড়ে তা হিসেবের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আবার ভূত্বকের এই কাঠিন্য ও অনমনীয়তা আছে বলেই ভূত্বকের নিচের দিকের ওল্টানো পর্বতটি ভূত্বকের ওপরের দিকের খাড়া পর্বতের হুবহু প্রতিচ্ছবি হয় না। ওল্টানো পর্বতটি একটা দলা পাকানো পিণ্ডের মতো তরল ব্যাসল্টের মধ্যে গা ডুবিয়ে আছে ; তার না আছে শৃঙ্গ, না আছে উপত্যকা—শুধু একটা নিরবয়ব অস্তিত্ব।

ভঙ্গুর ভূত্বক

পর্বতের অটল ঔদ্ধত্য ও ঋজু কাঠিন্য আমাদের কাছে বড়ো রকমের একটা বিস্ময়। হিমালয়কে নিয়ে আমরা যতো কাব্য রচনা করেছি এমন আর কোনো কিছু নিয়ে নয়। হিমালয়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা ভাষা খুঁজে পাই না, হিমালয়ের বিপুল গরিমার

সামনে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। শুধু আমাদের দেশের হিমালয় নিয়ে নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের কাব্যে ও সাহিত্যে পর্বত-বন্দনা একটা বড়ো স্থান অধিকার করে আছে। পর্বত আমাদের কাছে প্রাচীনতার প্রতীক, চির-স্থায়িত্বের প্রতীক, অনমনীয়তার প্রতীক। সমতল জমি নদীর স্রোতের একটা ধাক্কাতেই ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ে, বৃষ্টির জলে গলে গলে যায়, ঝোড়ো বাতাসে উড়তে শুরু করে; সে জায়গায় পর্বতকে দেখে মনে হয়, সমস্ত ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাতকে উপেক্ষা করে শাশ্বত একটা বিদ্রোহের মতো চির-উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে।

পর্বত সম্পর্কে এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদের কথা শুনলে চমকে উঠতে হবে। তাঁরা বলেন, সমতল জমির চেয়েও পর্বত অনেক বেশি ক্ষয়িষ্ণু। প্রতি মুহূর্তে পর্বতের ক্ষয় হচ্ছে, প্রতি মুহূর্তে পর্বতের শিলায় শিলায় প্রচণ্ড এক ধ্বংসকার্য অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। আমাদের এই হিমালয়েরই বা আয়ু কতদিন? কয়েক কোটি বছর মাত্র। আবার কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই হিমালয় রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। পৃথিবীর ইতিহাসের কাছে হিমালয় তো একেবারেই অর্বাচীন, মাত্র ছ-কোটি বছর তার বয়স— এবং আর কয়েক কোটি বছর পরে তার বিলুপ্তিও অবশ্যম্ভাবী; পৃথিবীর ইতিহাসে হিমালয়ের মতো পর্বত আরো অনেকবারই মাথা তুলেছে, এবং প্রত্যেকবারেই শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। এইভাবে পর্বতসৃষ্টি ও সমতলীভবনের দশটি যুগ পার হয়ে এসেছে আমাদের এই পৃথিবী। এই পৃথিবীতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়, ধ্বংস ও সৃষ্টির বিপুল এক ক্রিয়াকাণ্ড এই পৃথিবীর উপরিতলকে বারে বারে বন্ধুরতার নানা রঙে সাজিয়েছে, বারে বারে সমতলত্বের সাদা রঙ দিয়ে মুছে দিয়েছে।

ধ্বংস ও সৃষ্টির এই বিপুল ক্রিয়াকাণ্ডটির সঙ্গে এবারে আমাদের পরিচিত হতে হবে।

সমগ্র একটি পর্বত কি-ভাবে রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যায় তা বুঝতে হলে আমাদের দৃষ্টিকে আরো ছোট জায়গায় সরিয়ে আনতে হবে। আমরা তাকাব একটি শিলার দিকে, যা পর্বতের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। একটি অখণ্ড শিলা কি-ভাবে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়—এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে ধারণা করে নিতে হবে প্রথমে।

রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় একটি শিলা যদি বছরের পর বছর পড়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে, কয়েক বছরের মধ্যেই সেই শিলার সতেজ সজীব ভাবটি যেন আর নেই; শিলার রঙ পাল্‌টে গেছে, সর্বাঙ্গ ঝাঁঝরা হয়ে গেছে, শিলার গা থেকে টুকরো টুকরো অংশ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে। এইভাবে শিলাটি একটু একটু করে ক্ষয় হতে থাকে। আরো কয়েক বছর পরে দেখা যাবে, অখণ্ড শিলাটি আর নেই, একস্তূপ ধুলোয় পরিণত হয়েছে। সেই ধুলো বাতাসে উড়তে শুরু করে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়, এবং সুদীর্ঘ কাল পরে দেখা যায়—শিলার চিহ্নমাত্র নেই, এককালে যে শিলাকে হয়তো দশজন লোকেও নড়াতে পারত না, তা একটিপ নস্যির মতো হাওয়ায় উড়ে গেছে।

এই প্রক্রিয়ার নাম বিচূর্ণীভবন (weathering)।

বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া বিশেষভাবে নির্ভর করে বাতাসের ওপরে। বাতাসের আর্দ্রতা যদি বেশি হয়, তাহলে দেখা যাবে, শিলার ওপরে বাতাসের জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক ক্রিয়া চলছে। কিছুকালের মধ্যেই শিলার ওপরে ছোপ-ছোপ দাগ পড়ে, শিলাটি ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং একসময়ে অখণ্ড শিলাটি বালির মতো খসে পড়ে। যেখানে বাতাসের আর্দ্রতা কম, সেখানে দেখা যাবে, কিছুকালের মধ্যেই শিলাতে ফাটল ধরেছে এবং একসময়ে হাতুড়ির বাড়ি মেরে গুঁড়িয়ে দেবার মতো অখণ্ড শিলাটি পরিণত হয় একস্তূপ ধুলোয়।

বিচূর্ণীভবন যেভাবেই হোক না কেন, শেষ পরিণতি সেই একই—গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যাওয়া।

সূর্যের উত্তাপ এবং বৃষ্টির জলও এ-ব্যাপারে খানিকটা সহায়তা করে। শিলার মধ্যে দিয়ে উত্তাপের চলাচল ভালোভাবে হতে পারে না। এজন্যেই সূর্যের উত্তাপে যখন কোনো শিলার বাইরের দিক খুবই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখনো ভেতরের দিকটা থাকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা। আবার রাত্রিবেলা বাইরের দিক যতো বেশি ঠাণ্ডা হয়, ভেতরের দিক থাকে তার চেয়ে কম ঠাণ্ডা। শিলার ভেতরে এবং বাইরে উত্তাপের এই তারতম্য হবার ফলে এক অংশ যতোটা আয়তনে বাড়ে বা যতোটা সংকুচিত হয়, অপর অংশ তার চেয়ে কম আয়তনে বাড়ে বা কম সংকুচিত হয়। ফলে শিলাখণ্ডের ভেতরে ও বাইরে সবসময়েই একটা টানাপোড়েন চলে এবং এই টানাপোড়েনের চূড়ান্ত ফল হিসেবে শিলাখণ্ডের বাইরের দিক থেকে একটুকরো চটা খসে পড়ে। তারপরে সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি আবার নতুনভাবে শুরু হয়ে যায়। এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে শিলাখণ্ডটি পরিণত হয় ধুলোর স্তূপে।

যেখানে রাত্রিবেলার উত্তাপ হিমাঙ্কে নেমে আসে, অর্থাৎ রাত্রিবেলা জল জমে বরফ হয়ে যায়—সেখানে জলের সাহায্যেও এই ভাঙাচোরার ব্যাপারটা চলতে পারে। শিলাখণ্ডে যদি কোনো গহ্বর থাকে তবে সেই গহ্বরে জল জমে এবং রাত্রিবেলা সেই জল বরফ হয়ে যায়। আমরা জানি, জল বরফ হলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে গহ্বরটি আগে থেকেই জলে ভরাট ছিল ; কাজেই বরফ হবার পরে বাড়তি আয়তনের জায়গা পাওয়া যায় না। ফলে প্রচণ্ড এক চাপ সৃষ্টি হয় গহ্বরের চারদিকের দেওয়ালে। দিনের পর দিন এই ব্যাপার চলতে থাকে। শেষকালে একদিন প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটার মতো শিলাখণ্ডটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়।

সমুদ্রের ঢেউ তটভূমিতে আছড়ে পড়ে মস্ত মস্ত শিলাখণ্ডকে বালির খেলাঘরের মতো ভেঙেচুরে একাকার করে দেয়—তা আমরা অনেকেই চোখের ওপরে দেখেছি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই পৃথিবীর সর্বত্র অহরহ বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া চলছে। মস্ত মস্ত শিলাখণ্ড হয়ে উঠছে ধুলোর স্তূপ। এবং একটি

একটি করে শিলাখণ্ড ধুলোর স্তূপ হতে হতে শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের মতো সুবিপুল পর্বতমালাও রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। অতীতে আরো দশবার এই ব্যাপার ঘটেছে, ভবিষ্যতে আরো বহুবারই এই ব্যাপার ঘটবে। পৃথিবীর ইতিহাসে পর্বতমালার অস্তিত্ব নিতান্তই ক্ষণিক। এমন কি হিমালয়ের মতো পর্বতমালারও।

ক্ষয়

বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি চলে অপর একটি প্রক্রিয়া—যাকে বলা হয় ক্ষয় (erosion)।

বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়ায় শিলাখণ্ড পরিণত হয় ধুলোর স্তূপে। তারপর সেই ধুলোর স্তূপ বাতাসে উড়তে শুরু করে, বৃষ্টির জলে ধুয়ে যায়, এবং অন্যান্য নানা উপায়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। ঘরের মেঝেতে ধুলো জমলে যেমন ঝাঁট দিয়ে বা জল ঢেলে পরিষ্কার করা হয়—এও অনেকটা সেই ধরনের ব্যাপার। বিশেষ করে বাতাস ও বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠের ধুলোর স্তূপকে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দিচ্ছে না—অনবরত উড়িয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এই ধুলোর স্তূপ বাতাসে ভাসতে ভাসতে বা বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে হাজির হয় সমুদ্রে। কথাটার মানে এই নয় যে বৃষ্টির জলের প্রত্যেকটি ফোঁটা বা বাতাসের প্রত্যেকটি ঝাপ্‌টা একরাশ ধুলোকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি সমুদ্রের দিকে পাড়ি দেয়। কিন্তু প্রত্যেকটি মানুষকে যেমন শেষ পর্যন্ত শ্মশানে আসতে হয়, তেমনি বৃষ্টির জলের প্রত্যেকটি ফোঁটাকে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছতে হয় সমুদ্রে। যে জলের ফোঁটাটি আমাদের বাড়ির সামনে বদ্ধ ডোবায় এসে পড়ল তা কি সেখানেই চিরকাল আটক থাকে? সূর্যের তাপে একদিন না একদিন আবার সেই ফোঁটাটিকে বাষ্প হয়ে আকশে উড়তে হয় কিংবা মাটির ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আবার হয়তো সে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে এবং শেষ পর্যন্ত অন্য একটা ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসে—অর্থাৎ কোনো না কোনো ভাবে তাকে এসে পৌঁছতেই হয় সমুদ্রে। সমুদ্রে এসেই

যে তার স্থিতি—তা নয়। আবার সে বাষ্প হয়ে আকাশে ওড়ে, আবার বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে, আবার এসে হাজির হয় সমুদ্রে। এই-ভাবেই প্রত্যেকটি জলের ফোঁটার অবিরাম ভূপৃষ্ঠ-পরিক্রমা চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভূপৃষ্ঠের মহাদেশগুলোকে ধুয়ে-মুছে সাফ করার কাজ। তেমনি বাতাসের ঝাপ্‌টার সঙ্গে ধুলোর স্তূপ সমুদ্রে এসে যদি নাও পড়ে তো কোথাও না কোথাও ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়বেই ; তারপর সেই ছড়ানো ছিটানো ধুলোর কণাগুলো হয় আরেকটা ঝাপ্‌টায় আবার আকাশে গা ভাসাবে কিংবা বৃষ্টির জলে ধুয়ে-মুছে যাবে।

মনে রাখা দরকার যে জল যখন বাষ্প হয়ে আকাশে ওড়ে তখন তাকে ধূলিকণার মায়া ত্যাগ করেই যেতে হয়। কিন্তু যে জল পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনা হয়ে নেমে আসে, যে জল মাঠ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনো একটা নালা বা খালের আশ্রয় পায়—তা সঙ্গে করে নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণ ধুলো, সেই ধুলোগোলা জল নানা আঁকাবাঁকা পথে নদীতে এসে মেশে এবং নদীর স্রোতের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত হাজির হয় সমুদ্রে।

ভূপৃষ্ঠের ওপরে এই দুটি প্রক্রিয়া হাত ধরাধরি করে চলেছে। বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়। প্রথম প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় এই চূর্ণবিচূর্ণ ধুলো এসে পড়ছে সমুদ্রে। আমাদের পায়ের নিচের ধুলোমাটির যে আস্তরটি রয়েছে তা এই বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ারই সাক্ষ্য। এই আস্তরটি আছে বলেই আমাদের এই পৃথিবী পত্রে-পল্লবে ফুলে-ফলে এত সুন্দর, সোনালী ফসলে এত শ্রীময়ী। অথচ একদিকে যেমন বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে ধুলোমাটির সঞ্চয়, তেমনি অপর দিকে ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় তা প্রতি মুহূর্তে বিলীয়মান। এই দুটি প্রক্রিয়া মোটামুটি হাত ধরাধরি করে চলে বলেই ভূপৃষ্ঠে ধুলোমাটির আস্তরটি বিলুপ্ত হয়নি।

পৃথিবীর মাটি নিশ্ছিদ্র নয়—একথা আমরা সবাই জানি। মাটির অসংখ্য ছিদ্রপথে জল আর বাতাস হাজির হয় মাটির আস্তরের নিচে

শিলাস্তরে। তখন সেখানে বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে এবং শিলাস্তর ক্রমেই ভেঙে-গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে যায়। আবার একই সময়ে মাটির ওপরে চলে ক্ষয়; প্রতি মুহূর্তে মাটির সঞ্চয়, জলে বাতাসে ভাসতে-ভাসতে উড়তে-উড়তে যাত্রা করে সমুদ্রের দিকে। এই সঞ্চয় আর ক্ষয়ের মধ্যে একটা সমতা বজায় থাকে বলেই ভূপৃষ্ঠ আজো তার শ্যামলতা খুইয়ে বসেনি।

ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটির সবচেয়ে বড়ো বাহন হচ্ছে গড়ানে জল। বৃষ্টির জল, ঝরনার জল, নদীর জল—ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য ধারাপথে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর সেই গড়ানে জলের সঙ্গে মিলে মিশে চলেছে ধুলো আর পাথর। আবার চলার পথেও তা ভাঙতে ভাঙতে চলে। পাথরের সঙ্গে পাথরের ঘষা লেগে, পাথরের সঙ্গে জমির ঘষা লেগে এবং আরো নানাভাবে ভাঙনের কাজ চলে। এককালে যা ছিল একটি অখণ্ড শিলা তা এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে একেবারে ধুলো হয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়।

বাতাসের সঙ্গে উড়ে আসা ধুলোবালির ঝাপ্টা হিংস্র একটা আঁচড়ের মতো পাহাড়ের গায়ে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দেয় আর পাহাড়ের গা থেকে চটা খসে খসে পড়ে।

ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র এক বিপুল ভাঙনের পালা চলেছে। কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কোনো কিছুই চিরস্থির নয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে কত মহাদেশ যে নিশ্চিহ্ন হয়েছে, কত পর্বত যে ধুলোয় মিশে গেছে তার ঠিকঠিকানা নেই।

এই ভাঙন ও ক্ষয়ের সর্বগ্রাসী চেহারা সম্পর্কে একটা ধারণা হতে পারে যদি সমুদ্রের লবণতার একটা হিসেব নেওয়া যায়। আগেই বলেছি, সমুদ্রের সমস্ত নুন আসে জমিধোয়া বৃষ্টির জল থেকে। বৃষ্টির জল যখন ধুলোবালি ভাসিয়ে নিয়ে আসে তখন ধুলোবালির মধ্যেকার নুনের ভাগটুকু গলে গিয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়, বাকি অংশ জলে গা ভাসিয়ে থাকে ও জলকে ঘোলাটে করে তোলে। সেই নুনগোলা ঘোলাটে জল এসে পড়ে সমুদ্রে। হিসেব করে দেখা গেছে, বর্তমানে

সমুদ্রের জলে নুনের পরিমাণ হচ্ছে ২,০০,০০,০০০ ঘন-কিলোমিটার। অর্থাৎ সমুদ্রের জল থেকে সমস্ত নুন বার করে নিয়ে যদি ভূপৃষ্ঠের জমির ওপরে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সেই নুনের স্তূপের গভীরতা হবে ৪৫০ ফুট। কিন্তু ভূপৃষ্ঠ থেকে যতো ধুলো-বালি জলের সঙ্গে ভেসে আসে তার মধ্যে নুনের ভাগ হচ্ছে মাত্র কুড়িভাগের একভাগ। এ থেকে মোট ক্ষয়ের পরিমাণ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে।

সরাসরি মাপ নিয়ে দেখা গেছে, এক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই নদীর জলের সঙ্গে প্রতি বছর ৮০ কোটি টন ধুলোমাটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে।

গঙ্গানদীর জলের সঙ্গে গিয়ে পড়ছে (ভারত মহাসাগরে) প্রতি বছরে ১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ঘনমিটার পরিমাণ।

এই সর্বগ্রাসী ভাঙন ও ক্ষয়ের জন্যেই ভূপৃষ্ঠে এত বৈচিত্র্য ও এত রূপভঙ্গিমা। ভূপৃষ্ঠ যে এত মসৃণ তাও এজন্যেই। সমুদ্র বা নদীর ধার থেকে যখন একটি নুড়ি কুড়িয়ে নিই তখন তার মসৃণতা দেখে অনেক সময়ে অবাক হতেও ভুলে যাই আমরা। অথচ কত বছর ধরে কী বিপুল ভাঙন ও ক্ষয়ের একটি প্রক্রিয়া দক্ষ শিল্পীর মতো এই একটি নুড়িকে মসৃণ করে তুলেছে—তা পুরোপুরি কল্পনা করার সাধ্যও আমাদের নেই। পাহাড়ের চুড়োয় উঠে যখন চারদিকের জ্যামিতিক ছন্দ দেখে আমরা মুগ্ধ হই—তখনো এই রূপকারটির কথা একবারো আমাদের মনে পড়ে না। আর শুধু কি মসৃণতা, শুধু কি ছন্দ—ভূপৃষ্ঠে এত যে ভঙ্গিমা, এত যে গঠনগত বৈচিত্র্য, তাও এই রূপকারেরই আশ্চর্য শিল্পকর্মের নিদর্শন।

ভূপৃষ্ঠে এই ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় মুহূর্তের বিরাম নেই বলেই ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ সমতল হয়ে ওঠে। কথাটা এবার ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে। খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে জল যতোটা তোড়ে নেমে আসে এমন আর কোথাও নয়। সমতল জমিতে নেমে আসার পর

জল বয়ে চলে তির তির করে—তার পাগলামি ক্ষ্যাপামি কিছুই থাকে না। কাজেই খাড়া পাহাড়ে যতো বেশি ভাঙন ও ক্ষয় হয়, সমতল জমিতে তা হয় না। ক্ষয়ের পরিমাণ সমতল জমির চেয়েও খাড়া পাহারে বেশি। এই ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি সুদীর্ঘকাল কাল ধরে চলার পর খাড়া পাহাড়টি সমতল হয়ে যায়।

তবে যতো সহজে বলা গেল ততো সহজে নয়। আগেই বলেছি, ভূত্বকের ভাঁজ পড়ে যেখানেই পর্বত তৈরি হয়, সেখানেই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে ভূত্বকটি বেঁকে যায় এবং নিচের তরল ব্যাসল্ট স্তরে তৈরি হয় একটি ওল্টানো পর্বত। এইভাবে তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান ভূত্বকের ভারসাম্য বজায় থাকে। এখন, ভূত্বকের ওপরের দিকের পর্বতটি যদি ক্রমেই আয়তনে ছোট হতে থাকে তাহলে ভূত্বকের নিচের দিকের ওল্টানো পর্বতটিও ক্রমেই গা ভাসিয়ে উঠবে—যেমন জাহাজের খোল থেকে মাল খালাস করলে জাহাজ আরো খানিকটা ভেসে ওঠে। এইভাবে একদিকে যতোই ক্ষয় হবে, অপরদিকে ততোই ভেসে উঠবে। কাজেই ভূত্বকের ওপরের দিকের পর্বতটিকে পুরোপুরি ক্ষয় করতে হলে আসলে ক্ষয় করতে হবে দ্বিগুণ আয়তনের একটি পর্বতকে। অর্থাৎ ভূত্বকের ওপরের দিকের খাড়া অংশটুকু পর্বতের অংশমাত্র, পর্বতের তলদেশ ভূত্বকের নিচের দিকে বহুদূর পর্যন্ত নেমে গেছে। আজ যদি পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপায়ে হিমালয় পর্বতমালাটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব হয়, তাহলে দেখা যাবে, কয়েক লক্ষ বছরের মধ্যেই দ্বিতীয় আরেকটি হিমালয় পর্বতমালা এই একই জায়গায় মাথা তুলেছে—যদিও প্রথমটির তুলনায় আয়তনে অনেকটা ছোট। কারণ. পর্বতমালার গোড়া ভূত্বকের নিচে থেকে গিয়েছিল। কিন্তু ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে হিমালয় পর্বতমালাটি যখন নিশ্চিহ্ন হবে তখন তার গোড়াটুকুও অবশিষ্ট থাকবে না; সেক্ষেত্রে এই একই জায়গায় আবার পর্বতমালা তৈরি হতে পারে যদি ভবিষ্যতের কোনো এক

যুগে এই বিশেষ জায়গাতেই আবার ভূত্বকের ভাঁজ পড়ে—নইলে কিছুতেই নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় একদিকে চলে মহাদেশের এলাকায় ভূত্বকের ক্ষয়. অপরদিকে মহাসমুদ্রের এলাকায় ভূত্বকের সঞ্চয়। নদীর জলের সঙ্গে যতো ধুলোমাটি সমুদ্রে এসে পড়ে তা চিরকালই গা ভাসিয়ে থাকতে পারে না—একসময়ে না একসময়ে থিতিয়ে পড়তে হয়। এইভাবে সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর স্তর ধুলোমাটি জমাতে থাকে এবং প্রচণ্ড চাপে একসময়ে এই স্তরগুলো রূপান্তরিত হয় পাললিক শিলায়। ভূত্বকের এই এক-দিকের ক্ষয় এবং অপরদিকের সঞ্চয় চলতে চলতে শেষকালে একটা সময় নিশ্চয়ই আসে যখন ভূত্বকের ভারসাম্য টলে ওঠে—তখন ভূত্বকের স্থানীয় বিন্যাসে আবার একটা ওলোট-পালোট হয়ে যায়। হয়তো ভূত্বকের সেই বিশেষ এলাকায় নতুন একটা ভাঁজ পড়ে; ফলে হয়তো বিস্তীর্ণ এক ভূখণ্ড সমুদ্রের তলদেশ থেকে ঠেলা খেয়ে দ্বীপের মতো ভেসে ওঠে, হয়তো সারি সারি ঢেউয়ের মতো নতুন এক পর্বতমালা আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আরো কত কি যে হয় কাগজে-কলমে তার ফিরিস্তি দেওয়া সম্ভব হয়, ভূপৃষ্ঠের রূপবৈচিত্র্যেই এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার সবচেয়ে বড়ো সাক্ষ্য।

শুনলে অবাক হতে হবে যে আমাদের এই হিমালয় পর্বতটি তৈরি হয়েছে পাললিক শিলায়। অর্থাৎ এখন যেখানে সুউচ্চ হিমালয়, সেখানে এককালে ছিল সমুদ্র। ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ফলে সেই সমুদ্র কোথায় সরে গেছে—আর সে-জায়গায় বিপুল গরিমায় মাথা তুলেছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশিখর।

কিন্তু একদিকে যেমন ভূত্বকের ভাঁজে ভূপৃষ্ঠ উঁচু-নিচু হয়ে ওঠে, তেমনি অপরদিকে বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ের অবিরাম প্রক্রিয়ায় সমস্ত উঁচুনিচু সমতল হয়ে যায়। এই হিমালয় একদিন নিশ্চিহ্ন হবে, আজকের পৃথিবীতে যেখানে যতো পাহাড়-পর্বত আছে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—ভূপৃষ্ঠ হয়ে উঠবে রবারের বলের মতো সমতল।

তারপর আবার একসময়ে ভূত্বকের সংকোচনের ফলে ভাঁজ পড়বে, আবার তৈরি হবে পর্বতমালা ও উপত্যকা—ভূপৃষ্ঠ আবার বিচিত্র ভঙ্গিমায় ও ছন্দে লীলায়িত হয়ে উঠবে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূপৃষ্ঠ যতো তাড়াতাড়ি সমতল হয়ে ওঠে, ততো তাড়াতাড়ি ভূত্বকের ভাঁজ পড়ে না। পৃথিবীর জন্মের পরে কয়েক-শো কোটি বছরে ভূত্বকে বার দশেক ভাঁজ পড়েছে, অর্থাৎ বার দশেক ভূপৃষ্ঠে পর্বত তৈরি হয়েছে। কিন্তু সে-সব পর্বত নির্মূল হতে খুব বেশি সময় লাগেনি ; আজকের দিনে চোখের সামনে আমরা যে-সব পর্বত দেখি তা হচ্ছে শেষবারের ভাঁজের সাক্ষ্য এবং আগামী কয়েক কোটি বছরের মধ্যে এইসব পর্বতও নির্মূল হয়ে যাবে ; তারপরে নতুন পর্বতমালা তৈরি হবার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ভাঁজের জন্যে। ইতিমধ্যে স্থানীয় কারণে এখানে-ওখানে দু-একটা ছোট-খাটো ভাঁজ পড়তে পারে কিন্তু সারা ভূপৃষ্ঠ জুড়ে একটা বড়ো রকমের ভাঁজ-পড়ার পালা আসে দীর্ঘ দীর্ঘকাল পরে পরে। ততোদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ সমস্ত ভঙ্গিমা হারিয়ে জরাগ্রস্ত হয়ে থাকবে। এবং ভূপৃষ্ঠের এই জরাগ্রস্ত অবস্থাটাই দীর্ঘস্থায়ী, বলতে গেলে প্রায়-স্থায়ী ; শুধু মাঝে মাঝে বৃষ্টির পরে রোদজ্বলা আকাশে পাখি ডেকে ওঠার মতো এক যৌবনোচ্ছল গিরিভঙ্গিমায় ভূপৃষ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে। আমরা বাস করছি এমনি এক মুখর যৌবনের যুগে।

আবার স্থানীয় কারণে ভুত্বকে ভাঁজ পড়ার ব্যাপারটাও তুচ্ছ করার মতো নয়। গয়না তৈরি করতে হলে প্রথমে সোনা গলিয়ে ছাঁচে ঢালতে হয়। সেখানে গয়নার আদলটা আসে বটে কিন্তু রূপ আসে না। সেই রূপকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে অনেক সময় নিয়ে অনেক ধৈর্যের সঙ্গে সেই গয়নাকে ছেনি-বাটালি দিয়ে কাটাকুটি করতে হয়, পালিশ করতে হয় ঘষে ঘষে। তেমনি ভূপৃষ্ঠকে রূপবতী করে তোলার কাজ করে প্রকৃতির দুই অমোঘ ছেনি-বাটানি—জল আর বাতাস—বিচূর্ণীভবন আর ক্ষয়।

আগ্নেয়গিরি মানুষের কাছে চিরকালের ভয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্‌টালে দেখা যায়, বহু জনপদ বহু শহর-গ্রাম আগ্নেয়গিরির দুরন্ত অগ্নিস্রোতে ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে। বহু মানুষের বহু যুগের চেষ্টায় গড়ে ওঠা সমৃদ্ধিশালী নগরী আগ্নেগিরির অগ্নি-ফুৎকারে ফানুসের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পম্পেই নগরীর কথা আমরা সবাই জানি, এই নগরীর শেষের কয়েকটি দিন বিশ্বসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। আগ্নেয়গিরিকে মানুষের আরো ভয় এজন্যে যে আগ্নেয়গিরি কখন কোথায় কোন্ ফাটল দিয়ে রুদ্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে তা আগে থেকে জানবার উপায় নেই। "সমুদ্রমেখলা অরণ্যকুন্তলা তুষারকিরিটিনী" এই পৃথিবী যখন অকস্মাৎ অগ্নিস্রাবী নিশ্বাসে ভীষণা-ভয়ংকরী হয়ে ওঠে তখন হাজার স্তব রচনা করেও তাকে শান্ত করা যায় না। সেই অগ্নি-নিশ্বাস বহুবিস্তৃত এক এলাকায় সর্বনাশের স্বাক্ষর রেখে যায়। আর এই সর্বনাশ আসে কোনো রকম হুঁশিয়ারি না দিয়ে—যে কোনো জায়গায় যে-কোনো সময়ে।

এমন কি এই বিশ শতকেও এই সর্বনাশ বহুবার বহুভাবে দেখা দিয়েছে। বহুকালের সুপ্ত আগ্নেয়গিরি যদি নতুন আক্রোশে জেগে ওঠে তবে সেটা ঘটনা হিসেবে অবাক হবার মতো নয়। অবাক হতে হয় যদি সহসা চষা ক্ষেতের মাটি ফুঁড়ে আগ্নেয়গিরি মাথা তোলে। এমনি অবাক হবার মতো ঘটনাও ঘটেছে। মেক্সিকোর এক গ্রামের একটি চাষী-পরিবার পুরুষানুক্রমে এক টুকরো জমি চাষ করে আসছিল। সেই জমির মাঝখানে ছিল একটা গর্ত, যার তলা দেখা যেত না। বছরের পর বছর জঞ্জাল ফেলা সত্ত্বেও গর্তটা ভরাট হয়নি। ১৯৪৩ সালের ২০শে ফেব্রুআরি আচমকা সেই গর্ত থেকে দমকে দমকে আগুন বেরিয়ে আসতে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ভূমিকম্প; গর্তের চারপাশে ছাই জমতে জমতে উঁচু একটা পাহাড় তৈরি হয়ে যায়; ২১শে ফেব্রুআরি সেই পাহাড়ের গা বেয়ে উত্তপ্ত

তরল লাভাস্রোত নেমে আসে। এইভাবে একেবারে নতুন একটি আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়। একেবারে নতুন জায়গায় আগ্নেয়গিরির জন্ম হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত গত ছ-সাত হাজার বছরের মধ্যে আর মাত্র ছ-টি আছে। এই সাতটিকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর অন্য সমস্ত আগ্নেয়গিরি প্রাগৈতিহাসিক কালের।

আগ্নেয়গিরির এই তরল লাভাস্রোত কোত্থেকে আসে?

আগেই বলেছি, পৃথিবীর ব্যাসল্ট স্তরটি আছে তরল অবস্থায়। কিন্তু এমন এক প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছে যে ব্যাসল্ট স্তরটি শুধু জাতের বিচারেই তরল, গুণাগুণের দিক থেকে নমনীয় কঠিন। এবার কল্পনা করা যাক্, ভূত্বকের নিচের দিকে কোথাও একটা ফাটল রয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মেই এই ফাটলের মধ্যে তরল ব্যাসল্টের একটি স্তম্ভ উঠে আসবে, কারণ ব্যাসল্ট স্তরের ওপরে রয়েছে প্রচণ্ড চাপ ; ঠিক যেমন বায়ুমণ্ডলের চাপে ব্যারোমিটারের নলে পারার স্তম্ভ উঠে আসে। আবার স্তম্ভটি যতোই ওপরের দিকে উঠবে ততোই চাপ কমবে স্তম্ভটির ওপরে ; যতোই চাপ কমবে ততোই ব্যাসল্টের স্তম্ভটি গুণাগুণের দিক থেকেও হয়ে উঠবে সমতল। শেষ পর্যন্ত সেই তরল উত্তপ্ত ব্যাসল্টের প্রবাহ কোনো আগ্নেয়গিরির গহ্বর দিয়ে প্রচণ্ড আক্রোশে বেরিয়ে আসবে। এই তরল উত্তপ্ত প্রবাহকেই আমরা বলি লাভা।

তবে এই লাভা-প্রবাহ সব সময়েই যে বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে তা নয়। এমনও দেখা যায়, তরল উত্তপ্ত লাভাস্রোত ওপরের দিকে উঠে আসতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ভূপৃষ্ঠের নিচে মস্ত এক এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে একসময়ে ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে ওপরের মাটির স্তর ধুয়ে-মুছে যায় এবং তখন সেই বাধাপ্রাপ্ত লাভাস্রোতের হদিশ মেলে। কিন্তু ততোদিনে সেই লাভাস্রোত ঠাণ্ডা হতে হতে শিলীভূত হয়ে গেছে।

এজন্যেই পৃথিবীর এমন বহু এলাকায় শিলাভূত লাভার সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে এখন কোনো আগ্নেয়গিরি নেই। ভারতের দাক্ষিণাত্য

অঞ্চলের মাটি তৈরি হয়েছে শিলীভূত লাভায়। সুতরাং, অনুমান করা চলে, দূর অতীতের কোনো এক সময়ে এই অঞ্চলে আগ্নেয়গিরির তাণ্ডবলীলা চলেছিল ; ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা অঞ্চলে। কালক্রমে সেই গলিত লাভা ঠাণ্ডা হতে হতে শিলীভূত হয়েছে, কালক্রমে সেই শিলীভূত লাভা ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়েছে। এইভাবে তৈরি হয়েছে দাক্ষিণাত্যের কালোমাটি। এমনি কালোমাটির অঞ্চল পৃথিবীর আরো নানা জায়গায় আছে।

আগ্নেয়গিরির গহ্বর থেকে শুধু যে গলিত লাভা বেরিয়ে আসে তা নয়, প্রচণ্ড এক-একটা বিস্ফোরণ ঘটার মতো ধুলো আর আগ্নেয় কণার কালো মেঘও পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। সেই মেঘ থিতিয়ে পড়ে আস্তে আস্তে এবং ধুলো ও আগ্নেয় কণার পুরু স্তর জমে ওঠে মাটির ওপরে।

এমনিভাবে আমাদের এই পৃথিবীর মাটির প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে অনেক কালের অনেক ইতিহাস জড়িয়ে আছে। প্রতিটি শিলাখণ্ডে পাঠ করা যেতে পারে শিলাখণ্ডের উৎস ও বিবর্তনের এক বিচিত্র কাহিনী। কে কোন্ দেশের মানুষ তা যেমন মানুষের চেহারা দেখে বলে দেওয়া যায়, তেমনি কোন্‌টি কোন্ জাতের শিলা তা বলে দেওয়া যায় শিলার গড়ন দেখে। শিলাখণ্ডের রেখায় ও ভঙ্গিমায় লেখা থাকে সেই শিলাখণ্ডের জন্মবৃত্তান্ত। যেমন, পাললিক শিলায় থাকে জলের ঢেউয়ের আল্‌পনা, শিলীভূত লাভায় থাকে ঘন বিন্যাস আর কাঁচের মতো স্বচ্ছ ক্ষুদে ক্ষুদে দানা। গলিত লাভায় হয়তো একটি বুদ্‌বুদ ফুলে উঠে ফেটে পড়তে চাইছিল—আর ঠিক এমনি সময়ে হয়তো জমাট বেঁধে গিয়েছিল ফাটো ফাটো বুদ্‌বুদটি। শিলাখণ্ডে বুদ্‌বুদ থাকা মানেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হওয়া যে শিলাখণ্ডটি তৈরি হয়েছে গলিত লাভা থেকে। এ-ধরনের শিলাকে আমরা বলি আগ্নেয় শিলা (igneous rock)

আগ্নেয় শিলা

আগ্নেয় শিলা দু-ভাবে তৈরি হতে পারে। মাটির ওপরে আর মাটির নিচে। ভূগর্ভের লাভাস্রোত যেখানে আগ্নেয়গিরির গহ্বর দিয়ে মাটির ওপরে উঠে এসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে--সেখানে বাইরের হাওয়ায় থাকার জন্যে সেই লাভা অল্প সময়েই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু ভূগর্ভের লাভাস্রোত যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মাটির ওপরে উঠে আসতে পারে না এবং মাটির নিচেই ছড়িয়ে পড়ে—সেখানে সেই লাভা বদ্ধ জায়গায় আটক থাকার জন্যে ঠাণ্ডা হয় খুবই আস্তে আস্তে। এভাবে কোথাও তাড়াতাড়ি কোথাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হবার জন্যে একই তরল পদার্থ ভিন্নভাবে দানা বাঁধে। কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানী ভুল-বোঝাবুঝি এড়াবার জন্যে তরল পদার্থটির স্থানভেদে ভিন্ন নামকরণ করেছেন। মাটির ওপরে 'লাভা', মাটির নিচে 'ম্যাগ্‌মা'। আমরাও এই দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করব। মনে রাখা দরকার যে দুটি পৃথক নাম দেওয়া সত্ত্বেও তরল পদার্থটি কিন্তু সেই একই থেকে যাচ্ছে। যেমন একই ছেলের বাড়িতে পরিচয় ডাকনামে, স্কুলে পরিচয় ভালো নামে।

তাহলে আমরা বলতে পারি, লাভা ঠাণ্ডা হয় খুবই তাড়াতাড়ি আর ম্যাগ্‌মা ঠাণ্ডা হয় খুবই আস্তে আস্তে। অর্থাৎ গলিত লাভা কাঠিন্য লাভ করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে কিন্তু গলিত ম্যাগ্‌মা কাঠিন্য লাভ করতে সময় নেয় কল্পনাতীত রকমের দীর্ঘ—হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর। তাছাড়া ঠাণ্ডা হবার সময়ে গলিত লাভার ওপরে চাপ থাকে খুবই কম, কারণ তা মাটির ওপরে রয়েছে ; আর গলিত ম্যাগ্‌মার ওপরে চাপ থাকে খুবই বেশি, কারণ তা রয়েছে পুরু এক স্তর মাটির নিচে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার এই বিভিন্নতার জন্যে গলিত লাভা দানা বাঁধে একভাবে, গলিত ম্যাগ্‌মা দানা বাঁধে ভিন্নভাবে। গলিত লাভার দানাগুলো হয় খুবই ছোট ছোট, খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না এবং প্রায় বৈচিত্র্যহীন ; গলিত ম্যাগ্‌মার দানাগুলো হয় বড়ো বড়ো এবং নানা ধাঁচের ও নানা ধরনের।

আগ্নেয় শিলার কাঠিন্যলাভের প্রক্রিয়ার মধ্যে এত বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আছে বলেই আগ্নেয় শিলা নানা ধরনের হতে পারে। আগ্নেয় শিলার মধ্যে যে পদার্থটি সবচেয়ে বেশি তা হচ্ছে অক্সিজেন, তারপরে সিলিকা, তারপরে লোহা ও ম্যাগ্নেসিয়াম। আগ্নেয় শিলার কাঠিন্যলাভের নানা পর্বে এই চারটি পদার্থের মধ্যে নানা ধরনের মেশাল ঘটে। এক-একটি বিশেষ ধরনের মেশাল থেকে তৈরি হয় এক-একটি বিশেষ জাতের আগ্নেয় শিলা। ভূত্বকের উপরিতল থেকে শুরু করে গভীরতার স্তরে স্তরে এমনি নানা জাতের আগ্নেয় শিলার অস্তিত্ব আছে।

১৫০০ সালের পরে যে-সব আগ্নেয়গিরি কোনো না কোনো সময়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাদের মোট সংখ্যা ৪৮৬। এই ৪৮৬টি আগ্নেয়-গিরির মধ্যে ৪০৩টিই রয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে। বাকি ৮৩টি আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে। যদি আরো প্রাচীন আগ্নেয়গিরিগুলোকে হিসেবের মধ্যে ধরা যায় তাহলে আগ্নেয়গিরির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫২২।

এই হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি একটি বিশেষ এলাকায় ভিড় করে রয়েছে। এই এলাকাটি হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর। অন্যত্র খুবই কম। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে একটিও আগ্নেয়গিরি নেই। এশিয়ায় রয়েছে একমাত্র কামচটকায় ও উত্তর-পূর্ব চীনে। ইওরোপে একমাত্র ইতালিতে। আফ্রিকায় অল্প কয়েকটি মাত্র।

আগ্নেয়গিরি তিন ধরনের হতে পারে: জীবন্ত (active), সুপ্ত (dormant) ও মৃত (extinct)। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে, যে আগ্নেয়গিরি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে সেটি জীবন্ত, অগ্ন্যুৎপাত ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে মৃত, থাকলে সুপ্ত।

আগ্নেয়গিরি চিরকালই মানুষের কাছে একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। আগ্নেয়গিরির গহ্বরের ভেতরে নামার কল্পনাও কেউ করতে পারত না। কিন্তু বিশ শতকে এই কল্পনাতীত ব্যাপারটিও সম্ভব হয়েছে।

পথ দেখিয়েছেন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে হাওয়াই দ্বীপের একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরির গহ্বরে তারা সশরীরে নেমেছিলেন এবং গলিত লাভার তাপমাত্রার মাপ নিয়েছিলেন ও নমুনা সংগ্রহ করেছিলেন। এই দুঃসাহসিক গবেষণার ফলে আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে অনেক তথ্য সুনিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছে এবং অনেক বিতর্কের অবসান হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, আগ্নেয়গিরি সম্পর্কে গবেষণার সত্যিকারের অগ্রগতি হয়েছে এই বিশ শতকেই। পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা ভিসুভিয়স ও স্ট্রোম্বলি আগ্নেয়গিরির গহ্বরেও নেমেছিলেন। ভিসুভিয়সের গ্রাসে একজন বিজ্ঞানীকে প্রাণও দিতে হয়েছে। স্ট্রোম্বলির গহ্বরে ২৫০ মিটার পর্যন্ত নামতে পারা গিয়েছিল। তবে সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযানের কৃতিত্ব একজন জাপানী ভূ-বিজ্ঞানীর। তিনি নেমেছিলেন ৩৭০ মিটার পর্যন্ত। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের কাণ্ডকারখানা তিনি যে শুধু নিজের চোখে দেখেছিলেন তাই নয়, তার আলোকচিত্রও তুলে এনেছিলেন। আর দুরূহতম অভিযানটির কৃতিত্ব একদল সোভিয়েত বিজ্ঞানীর। তাঁরা নেমেছিলেন কামচটকার ক্লিয়ুচেভস্কায়া আগ্নেয়গিরির গহ্বরে।

আগ্নেয়গিরির উপকার ও ক্ষতি

বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়ায় আগ্নেয় শিলা থেকে যে মাটি তৈরি হয় তা খুবই উর্বর। তাছাড়া আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত ছাই জমির পক্ষে খুবই ভালো সার। অবশ্যই পরিমাণে এমন বেশি নয় যে মাঠের ফসল ঢাকা পড়তে পারে। আর, বলা বাহুল্য, আগ্নেয়গিরি থেকে নানা ধরনের গ্যাস পাওয়া যায় যা সরাসরি কাজে লাগানো সম্ভব।

আগ্নেয়গিরির ক্ষতিসাধনের ক্ষমতা যে কত বেশি তার নজির ইতিহাসে আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পও হয়ে থাকে। এই ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট নিমেষের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত ছাই ও আগ্নেয়গিরির

লাভাস্রোত বিস্তীর্ণ এলাকাকে ঢেকে ফেলতে পারে এবং জীবনের সমস্ত চিহ্ন মুছে দিতে পারে। সমুদ্রের নিচের আগ্নেয়গিরি প্রচণ্ড ঢেউ সৃষ্টি করে থাকে আর এই ঢেউ উপকূলকে বিধ্বস্ত করে। মোটামুটি হিসেব যা পাওয়া যায় তাতে দেখা যাচ্ছে, ১৫০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দরুন প্রাণহানি ঘটেছে ১,৯০,০০০ লোকের। ভূমিকম্প, বন্যা ও টাইফুনে প্রাণহানির সংখ্যা অবশ্যই এর চেয়ে বেশি।

০

পরিবর্তিত শিলা

সাদা কাগজের ওপরে পেন্‌সিলের লেখাকে রবার ঘষে মুছে দিলেও অনেক সময়ে সেই মুছে-ফেলা লেখার কিছু কিছু অংশ পড়া যেতে পারে। তালপাতায় লেখা পুরনো পুঁথির পৃষ্ঠাতেও সময় সময়ে এমনি মুছে-ফেলা লেখার দাগ পাওয়া গেছে এবং সেইসব দাগের পাঠ উদ্ধার করে সংগ্রহ করা হয়েছে অতীতের অনেক বিবরণ। তেমনি কোনো কোনো শিলায় অনেক কিছু পরিবর্তনের পরেও আদি অবস্থার চিহ্ন একেবারে মুছে যায় না। সেইসব চিহ্ন থেকে ভূ-বিজ্ঞানীরা অনেক কিছু খবর সংগ্রহ করেছেন।

এই পৃথিবীর সর্বত্রই সব সময়ে কোনো না কোনো ভাবে কিছু না কিছু পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এই পরিবর্তন ঘটে বিশেষ ভাবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে। যেমন নদীর জলের সঙ্গে সব সময়েই ধুলোমাটি এসে পড়ছে সমুদ্রের জলে। সেই ধুলোমাটি সব সময়েই একটু একটু করে থিতিয়ে পড়ছে সমুদ্রের তলদেশে। সেখানে সব সময়েই তৈরি হচ্ছে একটির পর একটি পলিস্তর। এভাবে যতোই স্তরের পর স্তর পলি জমে ততেই চাপ বাড়ে নিচের স্তরের ওপরে ; এই প্রচণ্ড চাপে পলিস্তরের রূপান্তর ঘটে ; যা এককালে ছিল মাখনের মতো নরম ধুলোমাটি, তা হয়ে ওঠে পাললিক শিলা (sedimentary rock)। তেমনি মাটির অনেক নিচে এক অদৃশ্য অন্তরালে কোথাও হয়তো আগ্নেয় শিলার জমাট কাঠিন্য পুঞ্জীভূত

হয়ে ছিল; কিন্তু একদিন না একদিন ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে এই আগ্নেয় শিলা অবারিত হয় ভূত্বকের উপরিতলের জল আর বাতাসের কাছে এবং তখন সেই ভাঙন ও ক্ষয় আগ্নেয় শিলার কাঠিন্যকেও রেহাই দেয় না; ধুলো হয়ে হয়ে ঝরে পড়ে সেই আগ্নেয় শিলা, বাতাসে আর জলে গা ভাসিয়ে সেই ধুলোর স্তূপ হাজির হয় সমুদ্রে; থিতিয়ে পড়ে সমুদ্রের তলদেশে, তৈরি হয় পাললিক শিলা। কিন্তু সেই পাললিক শিলার বিন্যাসে ও রেখায় আদি আগ্নেয় শিলার কোনো চিহ্নই কি থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে। এবং যতো অস্পষ্টই হোক ভূ-বিজ্ঞানীর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে তা ধরা পড়ে যায়।

তা সত্ত্বেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিলাখণ্ডের পরিবর্তন এমনও হতে পারে যে তার আদি রূপের সঙ্গে কোনো দিক দিয়েই কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু চেহারার দিক থেকে পরিবর্তন নয়, রাসায়নিক মেজাজের দিক থেকেও। এ-ধরনের শিলাকে বলে পরিবর্তিত শিলা (metamorphic rock)। বলা বাহুল্য, পরিবর্তিত শিলার আদি রূপটি হচ্ছে আগ্নেয় শিলা বা পাললিক শিলা। কিন্তু পরিবর্তনটা এত সর্বাত্মক যে পরিবর্তিত শিলার মধ্যে আগ্নেয় শিলা বা পাললিক শিলার চিহ্নাবশেষ বিশেষ কিছু থাকে না।

একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

মনে করা যাক ভূত্বকের কোনো এক স্তরে রয়েছে পাললিক শিলা এবং ভূ-গর্ভ থেকে গলিত ম্যাগ্‌মার একটা প্রবাহ এসে সেই পাললিক শিলার গায়ে লেগেছে। এই অবস্থায় উত্তপ্ত গলিত ম্যাগ্‌মার উত্তাপ সঞ্চারিত হবে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে। পাললিক শিলার যে স্তরের সঙ্গে ম্যাগ্‌মার সরাসরি ছোঁয়াচ লেগেছে সেখানে উত্তাপের প্রবাহ হবে সবচেয়ে বেশি। সেখান থেকে যতোই দূরে সরে যাওয়া যাবে, ততোই উত্তাপ কমবে। তাছাড়া গলিত ম্যাগ্‌মার গ্যাস ও বাষ্প পাললিক শিলার ছিদ্রপথে ছড়িয়ে পড়বে বহুদূর পর্যন্ত। এই গ্যাস ও বাষ্পের সঙ্গে পাললিক

শিলার বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ অতি সহজেই হতে পারে।

যদি এমন হয় যে পাললিক শিলার স্তরটিতে আছে চুনাপাথর। তাহলে চুনাপাথরের বিভিন্ন উপাদানের যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটবে তার ফলে তৈরি হবে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিলা। চুনাপাথর হয়ে উঠবে মার্বেল পাথর; ম্যাগ্‌মার সিলিকার সঙ্গে চুনাপাথরের ক্যালসিয়ামের সংযোগে তৈরি হবে ক্যালসিয়াম সিলিকেট; তাছাড়াও তৈরি হবে অনেকগুলো খনিজ পদার্থ। আবার পাললিক শিলার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মাপের উত্তাপ থাকার জন্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার মধ্যেও বিভিন্নতা দেখা যাবে। এমনি ব্যাপার চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত সেই ম্যাগ্‌মাও থাকবে না, পাললিক শিলাও থাকবে না—থাকবে রূপান্তরিত শিলা এবং অনেকগুলো খনিজ পদার্থ।

কিন্তু তাই বলে একথা মনে করলে ভুল হবে যে রূপান্তরের এই প্রক্রিয়াটি ঘটছে নিতান্তই এলোমেলো ভাবে, কোনো রকম নিয়ম-শৃঙ্খলা না মেনে। বরং ঠিক উল্টো। রূপান্তরের প্রত্যেকটি পর্ব একটি নির্দিষ্ট অনুক্রম মেনে চলে। রূপান্তরিত শিলাকে বিশ্লেষণ করে ভূ-বিজ্ঞানীরা তাই অনেক কিছু জানতে পারেন। বিশেষভাবে জানা যায়, রূপান্তর প্রক্রিয়া ঘটার সময়ে পাললিক শিলার কোন্ স্তরে কতখানি উত্তাপ পৌঁছতে পেরেছিল। এদিক থেকে কোনো কোনো পরিবর্তিত শিলাকে তুলনা করা হয় তাপমান যন্ত্রের সঙ্গে। কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ বছর আগে মাটির দুর্নিরীক্ষ্য অন্তরালে যে বিচিত্র ক্রিয়াকাণ্ড ঘটেছিল—তার একটা পুরো ছবি যেন এই তাপমান যন্ত্রের রেখায় রেখায় আপনা থেকেই আঁকা হয়ে থাকছে।

তেমনি অনেক সময়ে দেখা যায় কোনো রকম রাসায়নিক সংযোগ না হওয়া সত্ত্বেও শিলা পরিবর্তিত হয়েছে। একখণ্ড শিলার ওপরে প্রচণ্ড এক হাতুড়ির ঘা মারলে শিলাখণ্ডটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। কিন্তু মাটির নিচে কোনো একটি শিলাখণ্ডের ওপরে

যখন প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং হাজার হাজার বছর ধরে সেই চাপ থেকে যায়, তখন কিন্তু শিলাখণ্ডের মধ্যে ভাঙন না এসে আসে পরিবর্তন। এ-ধরনের পরিবর্তিত শিলার সন্ধান পাওয়া যায় পার্বত্য অঞ্চলে। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠে পর্বত তৈরি হয় ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে। আবার ভূত্বকে ভাঁজ পড়ার ফলে প্রচণ্ড একটা চাপ তৈরি হয় আর এই চাপ হাজার-হাজার লক্ষ-লক্ষ বছর ধরে বজায় থাকে। এ-অবস্থায় শিলাস্তরে কত যে পরিবর্তন আসে তার ঠিকঠিকানা নেই। যে কোনো পর্বতের তলদেশ থেকে শীর্ষদেশ পর্যন্ত শিলাস্তরের নমুনা সংগ্রহ করলে এই বিচিত্র পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার পুরো ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করা যাবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভূত্বকে ভাঙন ও ক্ষয়ের পাশাপাশি চলেছে নবজন্ম ও রূপান্তর। একদিকে ভাঙছে, অপরদিকে গড়ে উঠছে। একদিকে হচ্ছে ক্ষয়, অপরদিকে সঞ্চয়। এই ভাঙন ও গড়া, ক্ষয় ও সঞ্চয়ের মোট ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে ভূগর্ভের নানা খনিজ সম্পদ, নানা ধরনের পাথর, নানা রঙের সমাবেশ, নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্য। ভূত্বকের যেখানে যা কিছু কোমলতা ও কাঠিন্য, যা কিছু শ্যামলিমা ও রুক্ষতা, যা কিছু ভঙ্গিমা ও ঋজুতা, যা কিছু রঙ ও রেখা—সমস্তই এই ভাঙা-গড়া আর ক্ষয়-সঞ্চয়ের চক্রাবর্তনের ফলে। এখানে চক্রাবর্তন শব্দটির ব্যবহার শুধু কথার কথা নয়। পুরো ছবিটিকে চোখের সামনে তুলে ধরতে পারলে দেখা যাবে, এক সর্বব্যাপ্ত চক্রাবর্তন এই বহুবিচিত্র ভূত্বককে আলোড়িত আবর্তিত করে চলেছে। কোথাও এর বিরতি নেই, কোথাও এর স্থিতি নেই। ভূত্বকের অসংখ্য ছিদ্রপথে ভূগর্ভ থেকে উঠে আসছে গলিত ম্যাগ্‌মা ও লাভা। তৈরি হচ্ছে আগ্নেয় শিলা। সেই আগ্নেয় শিলা ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হাজির হচ্ছে সমুদ্রে। তৈরি হচ্ছে পাললিক শিলা। আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে আগ্নেয় শিলা ও পাললিক শিলা থেকে তৈরি হচ্ছে রূপান্তরিত শিলা। সেই রূপান্তরিত শিলাও ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, জলে গা

ভাসিয়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে—আবার তৈরি হচ্ছে পাললিক শিলা। এখানেই শেষ নয়। ভূত্বকের ভারসাম্য টলে ওঠে। ফলে একদিন না একদিন সমুদ্রতলের পাললিক শিলা মাথা তোলে জলের ওপরে। এবং ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় ক্ষয়। আবার ধুলো হয়ে যায়, আবার সমুদ্রযাত্রা করে, আবার শিলীভূত হয়। এমনি ভাবে এক বিরতিহীন চক্রাবর্তন চলে আসছে।

অর্থাৎ, একদিকে স্তূপীকৃত হচ্ছে শিলার ওপরে শিলা, অপরদিকে বিচূর্ণিত হচ্ছে শিলাস্তূপ ; বিচূর্ণিত হয়ে ধুলো হয়ে যাচ্ছে। সেই ধুলো থেকেই তৈরি হচ্ছে পরবর্তী যুগের নতুন শিলাস্তর। তারপর আবার বিচূর্ণীভবন ও শিলীভবন।

এ থেকে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাললিক শিলার এক-একটি স্তর তৈরি হচ্ছে এক-একটি বিশেষ যুগে। ফলে পাললিক শিলার এক-একটি বিশেষ স্তরে এক একটি বিশেষ যুগের সাক্ষ্য থেকে যাচ্ছে। অর্থাৎ পাললিক শিলার এক একটি স্তরকে তুলনা করা যেতে পারে বাঁধানো বইয়ের এক-একটি পৃষ্ঠার সঙ্গে। পৃষ্ঠাগুলোকে পরপর সাজাতে পারলে পৃথিবীর পুরো ইতিহাসকে পাঠ করা সম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই ইতিহাস-পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলো বড়ো বেশি ওলোট-পালোট হয়ে গেছে ; ভূত্বকের ভাঙা-গড়ার চক্রাবর্তনে বড়ো বেশি ভগ্নাংশ হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই ছড়ানো-ছিটোনো অংশগুলো থেকেই পৃথিবীর অতীত ইতিহাসের বিবরণ সংগ্রহ করেছেন। বলা বাহুল্য, সম্পূর্ণ বিবরণ এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। বিশেষ করে দূর অতীতের পৃষ্ঠাগুলো এত বেশি খণ্ডিত ও আংশিক যে তা থেকে সে-সব যুগের খানিকটা আভাস মাত্র পাওয়া যায়—তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু মানুষের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে প্রকৃতির নিজস্ব ভাষায় লেখা শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করে আংশিকভাবে হলেও পৃথিবীর ইতিহাসকে সে জানতে পেরেছে। শিলালিপিতে লেখা সম্পূর্ণ ইতিহাস-পুস্তকটি যেদিন সাজিয়ে তুলতে পারা যাবে সেদিন আর অজানা কিছু থাকবে না।

ভাবলে অবাক হতে হয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর আগে পৃথিবীর কোন্ আদিম সমুদ্রে কোন্ আদিম প্রাণী অন্ধ জীবনযাপন করেছিল—সে বিবরণও আজ সিনেমার পর্দায় দেখা ছবির মতো প্রত্যক্ষ করা চলে। পৃথিবীর কোনো রহস্যই আজ আর দুর্জ্ঞেয় নয়। শিলালিপির স্তরে স্তরে পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের জবাব লেখা আছে। একদিন না একদিন মানুষের কাছে সম্পূর্ণ রহস্যটি উদ্ঘাটিত হবেই।

খনিজ ভাণ্ডার

পৃথিবীর মাটি বছরে বছরে আমাদের ফসল উপহার দেয়; আবার সেই মাটির গর্ভেই থরে থরে সাজানো থাকে অজস্র খনিজ সম্পদ। মনে হতে পারে, এই পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলবার জন্যেই পৃথিবীর মাটি এত উর্বরা ও সম্পদশালিনী।

বিশেষ করে যে তিনটি পদার্থ না হলে আমাদের জীবনধারণ অচল—লোহা, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম—সেই তিনটি পদার্থই খনিজ। প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর এই বিপুল খনিজ ভাণ্ডার তৈরি হল কি-ভাবে? কেনই বা একেক অঞ্চলে একেক বিশেষ ধরনের খনি?

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, জৈব জগতের বিচিত্র রূপান্তরের ফলেই সম্ভব হয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ সঞ্চয়। অবশ্য এটা দু-এক বছরের ব্যাপার নয়, প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর সময় লেগেছে।

সবচেয়ে চলতি দৃষ্টান্তটাই প্রথমে ধরা যেতে পারে। সমুদ্রের প্রবাল দ্বীপ। প্রবাল কীটের শারীরিক গড়নটাই এমন যে সেখানে চুনজাতীয় পদার্থ জমা হয়ে হয়ে চলে। তারপর যখন সমুদ্রের একই জায়গায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রবাল কীট বংশানুক্রমে জন্মায় ও মরে—তখন সমুদ্রের তলদেশে সেই বিশেষ জায়গায় জমতে শুরু করে মৃত প্রবালকীটের স্তূপ। ক্রমে তা উঁচু হয়ে ওঠে এবং একসময়ে চুনাপাথরের তৈরি একটা দ্বীপ হয়ে মাথা

তোলে জলের ওপরে। সমুদ্রের স্রোতে বা পাখির মুখে উদ্ভিদের বীজ এসে পড়ে সেই দ্বীপে; বীজ পল্লবিত হয়; নিবিড় এক অরণ্যানীর গালিচা মুড়ি দিয়ে শ্যামল হয়ে ওঠে দ্বীপটি। এমনি ভাবে জীবজগতের অত্যন্ত তুচ্ছ ও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর এক অংশের লক্ষবৎসরব্যাপী জীবননির্বাহের সাক্ষ্য অপরূপ সৌন্দর্য ও সম্পদ সৃষ্টি করে চলেছে।

জীবজগতে প্রবালকীটের মতো প্রাণী এত অজস্র আছে যে ফিরিস্তি দিয়ে তা শেষ করা যাবে না। লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি। এসব প্রাণীর অনন্য লক্ষ্য হচ্ছে, যতো দীর্ঘকাল সম্ভব প্রাণধারণ করা এবং যতো অধিক সংখ্যায় সম্ভব বংশবৃদ্ধি করা। এক বিচিত্র জীবনচক্রে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি প্রাণী আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই প্রাণীজগতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এদের জৈব কাঠামোর মধ্যে কোনো না কোনো পদার্থের বাড়তি সঞ্চয় থাকবেই। বিশেষ করে ধাতব পদার্থের। অর্থাৎ, পারিপার্শ্বিক জলবায়ুর মধ্যে কোনো বিশেষ ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব যে-পরিমাণে আছে, কোনো বিশেষ জৈব কাঠামোর মধ্যে আছে তার চেয়েও বেশি পরিমাণে। যেমন, সমুদ্রচর প্রাণী অয়েস্টার-এর (ঝিনুক বা শুক্তি) শরীরে সমুদ্রের জলের চেয়ে দু-শো গুণ বেশি পরিমাণ তামার সঞ্চয় থাকে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো লৌহখনিগুলোর কয়েকটি তৈরি হয়েছে বিশেষ এক ধরনের জীবাণুর দেহাবশেষ থেকে।

এবং এই বৈশিষ্ট্য উদ্ভিদজগতেরও। উদ্ভিদ এক আশ্চর্য ক্ষমতা-বলে বাতাস থেকে কার্বন সংগ্রহ করে নিজের দেহের পুষ্টিসাধন করে। উদ্ভিদকে বলা চলে পুঞ্জীভূত কার্বন। তেমনি, কার্বনের সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু কিছু বাড়তি পদার্থের সঞ্চয়ও উদ্ভিদদেহে থাকা অসম্ভব নয়। এসব বাড়তি পদার্থ অনুকূল পরিবেশে অনায়াসেই খনিজ সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারে।

উদ্ভিদ ও প্রাণী মিলিয়েই আমাদের এই জৈব জগৎ। জৈব জগতের বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব নিয়ে পরে আমরা আলোচনা করব;

এখানে জৈব জগতের বিপুলতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করে নেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানীদের হিসেবে, বর্তমানে পৃথিবীতে দশ-লক্ষ কোটি টন জৈব পদার্থের অস্তিত্ব আছে। দশ-লক্ষ কোটি সংখ্যাটিকে কাগজে-কলমে লিখতে হলে একের পরে তেরোটি শূন্য বসাতে হবে। ধরে নেওয়া যাক যে গত পঞ্চাশ কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে সব সময়েই এই পরিমাণ জৈব পদার্থের অস্তিত্ব ছিল। তাহলে হিসেব করা যেতে পারে, গত পঞ্চাশ কোটি বছরে মোট কী পরিমাণ জৈব পদার্থ এই ভূপৃষ্ঠে জীবনচক্রে আবর্তিত হয়েছে। দশ-লক্ষ কোটি টনকে পঞ্চাশ কোটি দিয়ে গুণ করলে যে বিপুল সংখ্যাটি পাওয়া যায়, তাই হচ্ছে জৈব পদার্থের মোট পরিমাণ (গড় আয়ু এক বছর ধরে)। পাঁচের পর একুশটি শূন্য বসিয়ে এই সংখ্যাটি লিখতে হবে।

পৃথিবীর ওজনকে টনের হিসেবে লিখতে হলে ছয়ের পরে একুশটি শূন্য বসে। তার মানে, গত পঞ্চাশ কোটি বছরের মোট জৈব পদার্থের ওজন আর পৃথিবীর ওজন প্রায় সমান। আর যদি শুধু ভূত্বকের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে জৈব পদার্থের এই ওজন ভূত্বকের ওজনের একশো-সত্তর গুণ বেশি।

এ থেকেই অনুমান করা চলতে পারে, ভূত্বকের খনিজ ভাণ্ডার তৈরি করার ব্যাপারে জৈব পদার্থের ভূমিকা কতখানি। জীবনচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পৃথিবীর জল-মাটি-বাতাস থেকে এক-একটি বিশেষ পদার্থের আহরণ ও পুঞ্জীভবন চলতে থাকে ; এই পুঞ্জীভবন ঘটে এক-একটি জৈব কাঠামোকে আশ্রয় করে। তারপর জীবনচক্রের অনিবার্য নিয়মে জৈব কাঠামোটি এই পৃথিবীর মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং কোথাও কোথাও পুঞ্জীভূত পদার্থ রূপান্তরিত হয় খনিজ ভাণ্ডারে। পরবর্তীকালে সেই একই পদার্থ আবার অন্য এক জৈব কাঠামোকে আশ্রয় করে।

গত পঞ্চাশ কোটি বছরের জৈব পদার্থের ওজনের হিসেব নিয়ে দেখা গেল পৃথিবীর ওজনের সঙ্গে তা পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু

তা তো আর হতে পারে না। আসলে পৃথিবীর জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত তার পদার্থ-ভাণ্ডারের মোট সঞ্চয় বিশেষ বাড়ে-কমেনি। তবে পদার্থের রূপান্তরটা হয়েছে বহুবিচিত্র ও বহুব্যাপক। কখনো তা মাটি-জল-বাতাসে মিশে থেকেছে, কখনো কোনো জৈব কাঠামোকে পুষ্ট করেছে, কখনো কোনো খনিজ ভাণ্ডারে পুঞ্জীভূত হয়েছে। যেমন, কোনো কৃত্রিম ফোয়ারার নল থেকে বছরের পর বছর যে পরিমাণ জল বেরিয়ে আসে তার মোট পরিমাণ বিপুলতার দিক থেকে সমুদ্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলেও আসল হিসেবে বড়ো জোর একটা পাঁচশো গ্যালনের জলাধার মাত্র। এক্ষেত্রে জলের মোটপরিমাণ কোনো সময়েই বাড়ে-কমে না, কিন্তু সেই জলেরই এমন একটা বিরামহীন প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়েছে যে পরিমাণগত বিপুলতার ধারণা সৃষ্টি হতে পারে।

তেমনি পৃথিবীর খনিজ-ভাণ্ডার তৈরি হতে হলে জীবনচক্রে পদার্থের আবর্তনটাই জরুরি প্রয়োজন। বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ ও জীবজগৎ বিপুল পরিমাণ পদার্থকে আপন আপন দেহে সঞ্চয় করে চলেছে। জৈব জগতের অনিবার্য নিয়মেই একদিন না একদিন দেহ প্রাণহীন হয়; তখন প্রাণহীন দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল পরিমাণ পদার্থের সঞ্চয় আবার মিশে যায় পৃথিবীর মাটি জল আর বাতাসের সঙ্গে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্তূপীকৃত প্রাণহীন জৈব-দেহের পুঞ্জীভূত পদার্থ রূপান্তরিত হয় খনিজ ভাণ্ডারে। পৃথিবীর অধিকাংশ খনিজ ভাণ্ডার এভাবেই তৈরি।

খনিজ সম্পদের মধ্যে আমাদের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে কয়লা ও তেল। বিজ্ঞানীদের মতে, এই দুটি খনিজ সম্পদ তৈরি হবার পেছনেও সেই একই কারণ—জীবনচক্রের আবর্তন।

কোটি কোটি বছর আগে একদা এই পৃথিবীর মাটি নিবিড় অরণ্যে ছেয়ে গিয়েছিল। উদ্ভিদজগতের সে এক অভাবনীয় সমৃদ্ধির যুগ। এই সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল উপকূলবর্তী জলা জায়গায়। যে কোনো কারণেই হোক এই উদ্ভিদ চাপা পড়ে গিয়েছিল মাটির

নিচে। তারপর হাজার-লক্ষ-কোটি বছর ধরে সেই মাটির ওপরে নতুন মাটির স্তর পড়েছে এবং প্রচণ্ড এক চাপের মধ্যে থাকতে হয়েছে সেই উদ্ভিদকে। ওদিকে মাটির নিচের অক্সিজেনের যোগান এতবেশি হয়নি যে প্রয়োজনমতো অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে সেই উদ্ভিদ ছাই হয়ে যেতে পারত। এই বিশেষ পরিবেশে উদ্ভিদ রূপান্তরিত হয় কয়লায়। পৃথিবীর যেখানে যতো কয়লার খনি আছে তা কয়েক কোটি বছর আগেকার বিপুল এক উদ্ভিদ-জগতেরই সাক্ষ্য।

এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার পর্বে পর্বে উদ্ভিদদেহে কী কী রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাও বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন। এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার জন্যে প্রয়োজন অল্প উত্তাপ ও খুব বেশি রকমের চাপ। আমরা জানি মাটির নিচে যতো বেশি গভীরতায় যাওয়া যায় ততোই উত্তাপ ও চাপ বাড়ে। কাজেই, উদ্ভিদের কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় অবস্থা মাটির নিচে এমনিতেই তৈরি ছিল। রূপান্তর-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবার জন্যে এছাড়া প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ একটি সময়ের ব্যবধান। তাও পাওয়া গেছে। আজকের দিনের প্রত্যেকটি কয়লার টুকরোর পেছনে এমনি কতকগুলো অবস্থা তৈরি হবার ও প্রয়োজন সিদ্ধ হবার ইতিহাস জড়িত হয়ে আছে।

পেট্রোলিয়ামের খনি সম্পর্কেও এই একই কথা। তবে পেট্রোলিয়াম তৈরি হয়েছে উদ্ভিদ ও জীব—এই দু-ধরনের জৈব পদার্থ থেকেই। শুধু উদ্ভিদ থেকেও নয় বা শুধু জীব থেকেও নয়।

সম্ভবত পেট্রোলিয়াম তৈরি হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে ভূপৃষ্ঠে অগভীর লোনা জলের বিস্তৃত এলাকা ছিল। আর সেই জলাভূমিতে ছিল আগাছা, শ্যাওলা, জলজ ঝোপঝাড় ইত্যাদির এক ঘন সমাবেশ। জলচর জীবের দেহাবশেষ মিশেছিল সেই উদ্ভিদের সঙ্গে। এই সমস্ত জলজ উদ্ভিদ ও জলচর জীবের দেহে তেলের সঞ্চয় থাকে। এই তেলটুকুই শেষ পর্যন্ত নিংড়ে বেরিয়ে আসে এবং মাটির ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জমা হয় ভূগর্ভের কোনো একটা কূপে। এই কূপটিই

হচ্ছে পরবর্তী কালের তেলের খনি।

অবশ্য, মনে রাখা দরকার যে জলজ উদ্ভিদ ও জলচর জীবের দেহাবশেষ থেকে তেল নিংড়ে বার করার কাজটুকু সমাধা হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। এজন্যেও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। প্রকৃতির পরীক্ষাগারে আর যে জিনিসেরই অভাব থাক, সময়ের অভাব কখনো ঘটেনি। ছোটখাটো পর্বান্তরের জন্যেও সেখানে অপেক্ষা করতে হয়েছে লক্ষ বা কোটি বছর। সুতরাং, অন্যান্য নানা ব্যাপারের মতো, পেট্রোলিয়াম তৈরি হবার জন্যেও প্রয়োজনীয় দীর্ঘ সময়ের অভাব ঘটেনি।

কিন্তু মানুষের আয়ু স্বল্প হলেও অভাববোধ স্বল্প নয়। কোটি কোটি বছর ধরে প্রকৃতি তার নিজস্ব ভাণ্ডারে যতো কিছু খনিজ সম্পদের সঞ্চয় রেখেছিল, মানুষ কয়েক পুরুষের মধ্যেই তা প্রায় নিঃশেষিত করেছে। এবং এত পেয়েও সে খুশি নয়। প্রকৃতির ভাণ্ডারে আর কোনো গুপ্ত সঞ্চয় আছে কিনা তা খুঁজে বার করার চেষ্টায় আজও চলেছে তার ক্লান্তিহীন উদ্যম।

মহাদেশের ছাড়াছাড়ি

ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন ৫১ কোটি বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে জলভাগের আয়তন ৩৬·১ কোটি কিলোমিটার বা মোট আয়তনের শতকরা ৭০·৮ ভাগ। বাকি শতকরা ২৯·২ ভাগ স্থল। অর্থাৎ, দেখা যাচ্ছে স্থলভাগের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশের চেয়ে অনেক কম।

ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ কয়েকটা বড়ো বড়ো টুকরোয় ভাগ হয়ে নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। এক একটি টুকরো এক একটি মহাদেশ; যেমন, (১) এশিয়া, (২) ইওরোপ, (৩) আফ্রিকা, (৪) উত্তর আমেরিকা, (৫) দক্ষিণ আমেরিকা, (৬) অস্ট্রেলিয়া, ও (৭) কুমেরুদেশ।

তেমনি অবস্থান অনুসারে ভূপৃষ্ঠের জলভাগকেও কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে এক একটি নাম দেওয়া হয়েছে। যেমন, (১) এশিয়া ও আমেরিকার মাঝখানে প্রশান্ত মহাসাগর, (২) আমেরিকা,

ইওরোপ ও আফ্রিকার মাঝখানে আটলান্টিক মহাসাগর, (৩) অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে, এশিয়ার দক্ষিণে, আফ্রিকার পূর্বে এবং কুমেরুদেশের উত্তরে ভারত মহাসাগর, (৪) সুমেরু বৃত্তের মধ্যে উত্তর মহাসাগর এবং (৫) কুমেরু বৃত্তের মধ্যে দক্ষিণ মহাসাগর।

পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে তাকালে কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা যাবে। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি, দক্ষিণ গোলার্ধে জলভাগ বেশি। আবার উত্তর মেরুতে রয়েছে সমুদ্র, দক্ষিণ মেরুতে মহাদেশ। হিসেব নিলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠের শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ এলাকায় সমুদ্রের বিপরীত দিকে সমুদ্র, শতকরা একভাগের কিছু বেশি এলাকায় মহাদেশের বিপরীত দিকে মহাদেশ এবং বাদবাকি সমস্ত এলাকায় মহাদেশের বিপরীত দিকে সমুদ্র।

ভূপৃষ্ঠের জলভাগ ও স্থলভাগের মধ্যে এমনি কতকগুলো সম্পর্ক আছে বলেই মনে হয়, ব্যাপারটা নিতান্তই এলোমেলো নয়, কোথাও একটা কিছু নিয়মের বন্ধন আছে।



ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণা, ভূপৃষ্ঠের সমস্ত স্থলভাগ এককালে অখণ্ড ছিল। যে কোনো কারণেই হোক, সেই অখণ্ড স্থলভাগে ফাটল দেখা দেয় এবং টুকরো টুকরো অংশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে। ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ যে এককালে অখণ্ড ছিল তা অন্যভাবেও প্রমাণ করা যায়। একটি অখণ্ড পৃষ্ঠাকে যদি সাত-টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলা হয় তাহলে সেই টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে সেই অখণ্ড পৃষ্ঠাটি আবার তৈরি করা যেতে পারে; টুকরোগুলোকে যদি ঠিক ঠিক

জায়গায় বসানো হয় তাহলে এমন ভাবে জোড় মিলে যাবে যে কোথাও এতটুকু ফাঁক থাকবে না। তেমনি ভূপৃষ্ঠের সাতটি মহাদেশের টুকরো নিয়েও জোড় মেলানো যেতে পারে। পাশের ছবির দিকে তাকালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

তবে মনে রাখা দরকার যে ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ তৈরি হবার পরে প্রায় তিনশো কোটি বছর পার হয়েছে। এই তিনশো কোটি বছরের মধ্যে দশবার ভূত্বকে ভাঁজ পড়েছে, দশবার ভূপৃষ্ঠে পর্বত তৈরি হয়েছে, দশবার ভূপৃষ্ঠ সমতল হয়েছে। ভাঙন ও ক্ষয়ের চক্রাবর্তনে ভূপৃষ্ঠে আরো কত যে পরিবর্তন হয়েছে তার ঠিকঠিকানা নেই। সুতরাং সহজেই অনুমান করা চলে, প্রায় তিনশো কোটি বছর আগে মহাদেশগুলোর উপকূলরেখা যেমন ছিল, আজ আর তেমনটি নেই। কাজেই মহাদেশের টুকরোগুলো নিয়ে পুরোপুরি জোড় মেলানো সম্ভব নয়। কিন্তু যতোটুকু মিলেছে তাতেই প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা চলে, ভূপৃষ্ঠের এই সাতটি মহাদেশের টুকরো এককালে অখণ্ড অবস্থায় ছিল।

এবার তাহলে আলোচনা করা চলতে পারে, মহাদেশের টুকরো-গুলোর মধ্যে এতটা ছাড়াছাড়ি হবার কারণ কী? আগেই বলেছি ছাড়াছাড়ি হওয়ার ব্যাপারটা নিতান্ত এলোমেলো ভাবে হয়নি। তার মধ্যে বিশেষ একটা নিয়ম আছে। কী সেই নিয়ম?

আমরা জানি, মহাদেশগুলো রয়েছে তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভাসমান অবস্থায়। সুতরাং, জাহাজ যেমন স্রোতের টানে জলের ওপরে ভেসে চলে, তেমনি মহাদেশগুলোর পক্ষেও তরল ব্যাসল্টের ওপরে ভেসে চলাটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

কিন্তু জলের ওপরে ভাসমান অবস্থায় জাহাজের প্রপেলার যদি নাও চলে তো স্রোতের টানে জাহাজ ভেসে চলতে পারে। তেমনি তরল ব্যাসল্টের ওপরে মহাদেশের টুকরোগুলোকে ভেসে চলতে হলে কোথাও একটা কিছু টান থাকা চাই। এই টান কি-ভাবে তৈরি হয়েছিল?

হাঙ্গেরির একজন ভূ-বিজ্ঞানী বললেন যে, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তনের ফলে এমনি একটা টান তৈরি হতে পারে। আমরা জানি, পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খায় ; অতীতে পাক খেত আরো দ্রুত ; জন্মের পরেই পাক খেত চার ঘণ্টায় একবার। সময়ের হিসেব নিলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি বিন্দু একই সময়ে পুরো একটি পাক খাওয়া শেষ করে। কিন্তু বেগের হিসেব নিলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠের প্রত্যেকটি বিন্দুর বেগ সমান নয়। যেমন মেরু অঞ্চলে পাক খাওয়ার বেগ খুবই কম, বিষুব-অঞ্চলে পাক খাওয়ার বেগ খুবই বেশি। মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চল পর্যন্ত বেগের এই ক্রমবর্ধমানতার জন্যে মেরু-অঞ্চল থেকে বিষুব-অঞ্চলের দিকে একটা টান তৈরি হয়। এই টানে যে-কোনো ভাসমান বস্তু বিষুব-অঞ্চলের দিকে ভেসে চলতে পারে।

ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেন, এই বিশেষ টান থাকার জন্যেই মহাদেশের টুকরোগুলোর মধ্যে এত বেশি ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।

অবশ্য, এই ছাড়াছাড়ি হওয়ায় ব্যাপারটা যদি শেষ পর্যন্ত চলতে পারত তাহলে মহাদেশগুলোর অবস্থান অন্য রকম হয়ে যেত। ঠিক কি রকমটি হত তা একটা ছবি এঁকে দেখানো হল।



ছবির দিকে একবার তাকিয়েই বোঝা যাবে, মহাদেশগুলোর বর্তমান অবস্থানের সঙ্গে এই কাল্পনিক ছবির কোনো মিল নেই। তার মানে, ছাড়াছাড়ি হবার প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হবার আগেই থেমে গিয়েছে।

থেমে যাবার কারণ কী?

জলের ওপরে ভাসমান জাহাজের উপমাটিকে আরেকবার স্মরণ করতে হবে। অনেক সময়ে মেরু অঞ্চলের সমুদ্রে বরফে জমে গিয়ে জাহাজ আটক হয়ে পড়ে; নিচের স্রোতের টান যতো বেশিই হোক না কেন সেই জাহাজের আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না।

তেমনি মহাদেশের ভাসমান টুকরোগুলোও আটক হয়ে পড়তে পারে। টুকরোগুলো যতোই দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে ততোই দুই টুকরোর মাঝখানের ফাটল বড়ো হয়, ততোই নিচের তরল ব্যাসল্ট স্তরের বেশি বেশি অংশ বেরিয়ে পড়ে—এবং ততোই তাড়াতাড়ি নিচের তরল ব্যাসল্ট স্তরের বেরিয়ে-পড়া অংশ ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে কাঠিন্য লাভ করে। এই অবস্থায় ব্যাসল্ট স্তরের অংশগুলো মহাদেশগুলোকে সেঁটে ধরে চারপাশ থেকে—ফলে মহাদেশগুলোর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়।

পৃথিবী এখনো পাক খেয়ে চলেছে। অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠের বিষুবীয় টান এখানো রয়ে গেছে এবং এখনো মহাদেশগুলোকে টানাটানি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাদেশগুলো ব্যাসল্ট স্তরের কাঠিন্যপ্রাপ্ত অংশের মধ্যে এমনভাবে এঁটে বসেছে যে বিষুবীয় টান থাকা সত্ত্বেও তাদের বিশেষ কিছু নড়াচড়া নেই। নড়াচড়া একেবারেই নেই, একথা কোনো ভূ-বিজ্ঞানী জোর করে বলতে চান না। হয়তো থাকতেও পারে, কিন্তু তা এতই কম যে, লক্ষণীয় কোনো পরিবর্তন হবার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে।

তবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন একমাত্র বিষুবীয় টানের জন্যেই নয়। সমুদ্র কতবার সরে গিয়েছে, কতবার এগিয়ে এসেছে; মহাদেশ কতবার ডুবে গিয়েছে, কতবার ভেসে উঠেছে; পর্বতের চুড়ো কতবার আকাশের দিকে মাথা তুলেছে, কতবার ধুলোর সঙ্গে মিশে গিয়েছে। পৃথিবীর বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলে এবং ভাঙন ও ক্ষয়ের চক্রাবর্তনে কতবার ভূত্বকে ভাঁজ পড়েছে, কতবার টলে

উঠেছে ভূত্বকের ভারসাম্য। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারেই ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসে ঘটে গিয়েছে বিপুল পরিবর্তন।

ভূপৃষ্ঠের বর্তমান বিন্যাস অনেক ভাঙাচোরা, অনেক টানাপোড়েনের যোগফল। তা যেমন জটিল, তেমনি বিচিত্র। সেজন্যে, অনেক সময়ে, কোন্ বিশেষ কারণের জন্যে কোন্ বিশেষ পরিবর্তন—তা সহজে বোঝা যায় না। ভূ-বিজ্ঞানীরাও এখনো পর্যন্ত অঙ্কের মতো ছক্ কেটে বলে দিতে পারেননি, কোন্ বিশেষ কারণের জন্যে কোন্ বিশেষ পরিবর্তন। তবে পরিবর্তনের কারণগুলো সবই বর্তমান এবং কোনো না কোনো ভাবে ভূপৃষ্ঠে অবিরাম পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

সমুদ্র

আগে বলেছি, পৃথিবীর জলভাগের আয়তন ৩৬·১ কোটি বর্গ কিলো-মিটার বা মোট আয়তনের শতকরা ৭০·৮ ভাগ। তার মানে পৃথিবীর বেশির ভাগটাই জল বা মহাসমুদ্র। বিচ্ছিন্ন বা টুকরো টুকরো নয়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত এক অখণ্ড জলরাশি। ভৌগোলিক সুবিধের জন্যে কোথাও আমরা তার নাম দিয়েছি মহাসমুদ্র, কোথাও সাগর, কোথাও উপসাগর। মানচিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, তিনটি অতিকায় বাহুর মতো প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর ও ভারত মহাসাগর এই পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে।

সমুদ্রের জলরাশির মোট পরিমাণ হচ্ছে ১৩৭ কোটি ঘন কিলো-মিটার। তার মানে সমুদ্র যদি সব জায়গায় সমান গভীর হত তাহলে তার গভীরতা হত ৩৮০০ মিটার। একই ধরনের হিসেব থেকে বলা চলে যে স্থলভাগ যদি সব জায়গায় সমান উঁচু হত তাহলে সেই উচ্চতা হত ৮৪০ মিটার। এ থেকে আরো একটি হিসেব বার করা চলে। ভূপৃষ্ঠ যদি উঁচু-নিচু না হত, অর্থাৎ মহাদেশের উচ্চতা ও সমুদ্রের গভীরতাকে মিলিয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠকে যদি করে তোলা যেত

পুরোপুরি সমতল, তাহলে স্থলভাগ বলে আর কিছু থাকত না—সারা ভূপৃষ্ঠ হয়ে উঠত ২৪৪০ মিটার গভীর এক মহাসমুদ্র। এ থেকেও ধারণা করা যাবে, ভূপৃষ্ঠে স্থলভাগটা নগণ্য, জলভাগটাই প্রায় সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে।

হালের গবেষণায় আরো একটি আশ্চর্য ব্যাপার জানা গিয়েছে। গভীর সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে অজস্র পর্বতমালা। এই পর্বতমালার একটি শাখাকে পাওয়া যায় আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝ-বরাবর। এই শাখাটি দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারত মহাসাগরে এসে দুটি উপশাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি উপশাখা চলে গিয়েছে লোহিত সাগরের মুখ পর্যন্ত। অন্যটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ঘেঁষে শেষ পর্যন্ত এসে মিশেছে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে। হাওয়াই দ্বীপের কাছে এই পর্বতমালার কোনো কোনো শিখর এমন কি মাউন্ট এভারেস্টের চেয়েও উঁচু। সব মিলিয়ে গভীর সমুদ্রের তলদেশ আমাদের চোখের দেখার ভূপৃষ্ঠের চেয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সমুদ্রের গভীরতা সব জায়গায় সমান নয়। মোটামুটি হিসেবে বলা চলে, তিন হাজার থেকে ছ হাজার মিটারের মধ্যে।

আর সমুদ্রের জল সবসময়েই আলোড়িত, আবর্তিত ও বিক্ষুব্ধ। ঝড়-বাতাস, পৃথিবীর অক্ষ-আবর্তন, বিভিন্ন স্তরে সমুদ্রজলে ঘনত্বের পার্থক্য এবং জোয়ার-ভাঁটা—সব মিলে সমুদ্রে নানা বিভিন্নমুখী স্রোতোধারার সৃষ্টি হয়ে থাকে। সমুদ্রের উপকূল-ভাগে বড়ো রকমের ধ্বস নামার ফলেও সমুদ্রের তলদেশ বহুদূর পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠার কারণ ঘটে। ধ্বস নামা মানেই অনেকখানি পরিমাণে ঘোলাজল সৃষ্টি হওয়া। ঘোলা জল পরিষ্কার জলের চেয়ে ভারী। কাজেই ঘোলাজল নিচে নামে ও মাটি-কাদার সংস্পর্শে এসে আরো বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। তারপরে এই ঘোলাজল পর্বতের চুড়ো থেকে হিমবাহের নেমে আসার মতোই গভীর সমুদ্রের দিকে নামতে শুরু করে। আর বেগও হয় প্রচণ্ড—মিনিটে এক থেকে দুই কিলোমিটার পর্যন্ত। এই ঘোলাজলের ধাক্কায় সমুদ্রের তলদেশের কেব্‌ল্ ছিঁড়ে

যাওয়ার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।

সমুদ্র সম্পর্কে সবচেয়ে বড়ো জানার খবর এই যে সমুদ্রের জল শুধুই জল নয়, একটা দ্রবণ (solution)। অর্থাৎ অনেক রকমের পদার্থ সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় রয়েছে। হালের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে জানা গিয়েছে যে মেণ্ডেলিয়েফের তালিকায় যা-কিছু পদার্থের নাম আছে সমস্তই কিছু না কিছু পরিমাণে আছে সমুদ্রের জলে। দ্রবণের পরিমাণ যতো কমই হোক, সমুদ্রের জলের পরিমাণ এতই বেশি যে শেষ পর্যন্ত মোট পরিমাণটা হেলাফেলা করার মতো নয়। অর্থাৎ আমাদের চেনা-জানা যতো রকমের খনিজ পদার্থ আছে তার সবচেয়ে বড়ো আকর হচ্ছে এই সমুদ্র। ভবিষ্যতের মানুষকে তাই এই সমুদ্রের দিকেই আরো বেশি নজর দিতে হবে এবং এই সমুদ্র থেকেই সংগ্রহ করতে হবে বেঁচে থাকার উপাদান। বিজ্ঞানীদের ধারণা, মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সমুদ্র সম্পর্কে তার জ্ঞানের ওপরে ও সমুদ্রের বিপুল সম্পদরাশিকে ভোগ্য করে তোলার ক্ষমতার ওপরে। অথচ সমুদ্র সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো পর্যন্ত খুবই কম। আসল কথাটা এই যে সমুদ্র যদিও এতকাল আমাদের চোখের সামনেই ছিল কিন্তু সমুদ্র সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তৎপরতা রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে ব্যাপকভাবে শুরু হতে পেরেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালেই।

সমুদ্রের মাছ অধিকাংশই আমিষভোজী। অর্থাৎ সমুদ্র হচ্ছে নির্বিচার এক হানাহানির এলাকা। সেখানে বড়োরা ছোটদের ভক্ষণ করে থাকে। ছোটরা আরো ছোটদের। আর একেবারেই যারা ছোট তারা খুব সম্ভবত উদ্ভিদভোজী।

গভীর সমুদ্রে যে-সমস্ত মাছ চলাফেরা করে তাদের গা থেকে এক ধরনের আলোর ছটা বেরিয়ে আসে। এই কারণে গভীর সমুদ্র অন্ধকার নয়। এমনিতে এমন কি স্বচ্ছতম জলেও সূর্যের আলো একশো মিটারের বেশি গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের নিচে শ-সাতেক মিটার নামতে পারলে এমন এলাকায় পৌঁছনো যাবে যেখানে চারদিক 'কৃত্রিম' আলোয় উদ্ভাসিত। গভীর

সমুদ্রের দশ-ভাগের ন-ভাগ মাছই আলোক-উদ্ভাসী। সমুদ্রের তলদেশের এই আলো চাঁদের আলোর চেয়েও ফুটফুটে। আগামী একশো বছরের মধ্যে মানুষ হয়তো গোরু-ছাগল পালন করার মতো কয়েক জাতের আলোক-উদ্ভাসী জীবকেও পালন করতে শিখবে। সে-সময়ে খুব সম্ভবত শহরের রাস্তাঘাটে এই জৈবিক আলোরই ব্যবস্থা করা হবে।

যাই হোক, সে-সব অনেক পরের কথা। ইতিমধ্যে সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞানীরা একটি অসাধ্যসাধন করেছেন। কিছুকাল আগে পর্যন্ত সমুদ্রের তলদেশে সশরীরে হাজির হওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে করা হত (জুলে ভার্নে যাই লিখুন না কেন)। কারণ সমুদ্রের জলে প্রতি দশ মিটার গভীরতায় চাপ বাড়ে ৬·৩৫ কিলোগ্রাম হিসেবে। এ-অবস্থায় যান্ত্রিক আয়োজন ছাড়া কোনো ডুবুরীর পক্ষেই হাজার মিটারও ডুব দেওয়া সম্ভব নয়। এই যান্ত্রিক আয়োজনটি সম্প্রতি সম্ভব হয়েছে। মার্কিন নৌ-বাহিনীর ব্যাথিস্কেপ 'ত্রিয়েস্ত' পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো এক জায়গায় ৩৫,৮০০ ফুট (প্রায় সাত মাইল বা এগারো কিলোমিটার) গভীরে নেমেছিল। নৌ-বাহিনীর লেঃ ওয়াল্‌শ্‌ ও ডাঃ পিকার্ড যাত্রী হয়েছিলেন এই ব্যাথিস্কেপে। জুলে ভার্নের উপন্যাসের নায়করা ছাড়া আর কেউ আজ পর্যন্ত সমুদ্রের এতবেশি গভীরে নামতে পারেননি। তাছাড়া পারমাণবিক তেজে চালিত এমন ডুবোজাহাজও তৈরি হচ্ছে যার সাহায্যে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে গভীর সমুদ্রে অবস্থান ও বিচরণ করা অসম্ভব নয়।

১৯৬০ সালের মার্চ মাসে একটি আন্তর্জাতিক ওসীনোগ্রাফিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। পঁয়তাল্লিশটি দেশ থেকে এগারো-শো বিজ্ঞানী এই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। এই কংগ্রেসে যে-সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনা ভারত মহাসাগর সম্পর্কে। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে এই মহাসাগরে বিশেষ সামুদ্রিক গবেষণা চালানো হবে।

সোভিয়েত সামুদ্রিক গবেষণা-জাহাজ 'ভিতিয়াজ'-এর পরিক্রমা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভূ-অভ্যন্তরের হদিশ

অন্যদিকে চেষ্টা চলেছে সমুদ্রের তলদেশ থেকে গর্ত খুঁড়ে ভূ-অভ্যন্তরের নমুনা সংগ্রহ করার। সোভিয়েত ও মার্কিন দেশে এ-সম্পর্কে ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

অন্য সব কথা ছেড়ে দিলেও, মানুষকে শেষ পর্যন্ত নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই পৃথিবীর গভীরতর অভ্যন্তরের দিকে হাত বাড়াতে হবে। কারণ বেঁচে থাকার জন্যেই মানুষের আরো অনেক বেশি খনিজ উপকরণ দরকার, আরো অনেক বেশি তেজের উৎস। এদিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগটি আমাদের কাছে এক অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবে দেখা দিতে পারে। এবং এই কারণেই ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয়তার ওপরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিজ্ঞানীরা খুবই জোর দিচ্ছেন। এর ফলে (১) ভূ-অভ্যন্তরের ক্রিয়াকলাপ ও গড়ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হবে, (২) খনিজ আকর তৈরি হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য আমরা জানতে পারব, (৩) নতুন নতুন খনিজ আকর ও তেজের উৎস আবিষ্কৃত হবে, (৪) পৃথিবীর চৌম্বকত্বের রহস্য জানা যাবে (এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, লুনিকের মারফৎ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে চন্দ্রের চৌম্বকত্ব নেই), (৫) খনিজ আকর তৈরি হবার আগেই বিশুদ্ধ ধাতুটিকে উদ্ধার করা সম্ভব কিনা, সে-সম্পর্কে গবেষণা শুরু করা যাবে, (৬) কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় খনি তৈরি করা সম্ভব হবে, (৭) নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হবে, (৮) ভূ-অভ্যন্তরের পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হবে, এবং (৯) পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য একটি তত্ত্ব খাড়া করা যাবে। এই ফিরিস্তি অবশ্যই আরো বাড়ানো যেতে পারে।

বিজ্ঞান ও টেক্‌নোলজি এখন এতই উন্নত যে পৃথিবীর অভ্যন্তরের

হদিশ নিতে পারার মতো যান্ত্রিক আয়োজনও এই মুহূর্তেই সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

(১) ড্রিলের সাহায্যে গর্ত করে যাওয়া। এই গর্ত ডাঙ্গার জমি থেকে করা যেতে পারে, বা সমুদ্রের তলদেশ থেকেও। মার্কিন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে ড্রিলের সাহায্যে দুটি গর্ত করেছেন। বর্তমানে সোভিয়েত ও মার্কিন উভয় দেশেই এ-ব্যাপারে ব্যাপক তোড়জোড় চলেছে।

(২) সীমাবদ্ধ মাপের মধ্যে লম্বাভাবে ও তেরচাভাবে গভীরতর খনি খুঁড়ে যাওয়া।

(৩) ভূগর্ভ রকেট বা এ-ধরনের নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। এখনো পর্যন্ত আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আট কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত ড্রিল করা সম্ভব হয়েছে। আরও গভীরে যেতে হলে পাথর গুঁড়ো করার নতুন কোনো পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। এই পদ্ধতি অবশ্যই হবে পুরোপুরি যান্ত্রিক ও স্বয়ংক্রিয়।

সীমাবদ্ধ মাপের গভীরতার খনি খোঁড়ার কথা বলা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে কুড়ি থেকে পঁচিশ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীরে যাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এই গভীরতায় যেতে হলে শারীরিক নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা দরকার। হালে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণের জন্যে যে-সমস্ত যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে এবং উত্তাপ-নিরোধক যে-সমস্ত পোশাক ব্যবহৃত হচ্ছে তার সাহায্যেই এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কাজেই এ-অবস্থায় স্থলভে একটি গবেষণাগার গড়ে তোলাও অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই গবেষণাগার থেকে সরাসরি ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে গবেষণা পরিচালিত হবে, এখানকার প্রচণ্ড উত্তাপকে সরাসরি কাজে লাগানো যাবে এবং নতুন নতুন খনিজ পদার্থকে সরাসরি শোধন প্রক্রিয়া মারফৎ উদ্ধার করা যাবে।

মহাকাশে যেমন রকেটের যাতায়াত শুরু হয়েছে, তেমনি ভূগর্ভের বিপুল বিস্তৃতিতেও অদূরে ভবিষ্যতে শুরু হবে রোবোটের আনাগোনা। এই রোবোটকেও অবশ্যই পৃথিবীর অভ্যন্তরে পথ করতে

হবে কঠিন গ্রানাইট পাথরের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু এই পাথরকে সে গুঁড়িয়ে ফেলবার চেষ্টা করবে না, তার চেয়ে আরো অনেক অনায়াসে গলিয়ে ফেলবে বা ধোঁয়া করে উড়িয়ে দেবে। এই রোবোট মানুষের হুকুমমতো আনাগোনা করবে, নির্দিষ্ট গভীরতায় নেমে গিয়ে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে আসবে। ভবিষ্যতে এমন দিনও আসতে পারে যখন রোবোট-চালিত জাহাজ ভূপৃষ্ঠের একদিক থেকে রওনা হয়ে ভূ-অভ্যন্তরের মধ্যে দিয়ে সরাসরি ভূপৃষ্ঠের অন্য দিকে গিয়ে পৌঁছবে।

পৃথিবীর সন্ধানে

১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট যে আঠারোটি মাস পার হয়েছে সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সন্ধানে বিপুল এক অভিযানে নেমেছিলেন। এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছিল আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বিজ্ঞান বর্ষ (International Geophysical Year)। পৃথিবীর সাতষট্টিটি দেশের দশ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী এই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন ব্যাপক সহযোগিতা ইতিপূর্বে আর কখনো সম্ভব হয়নি।

এই অভিযানকে তেরোটি গবেষণাক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছিল। যেমন : (১) হিমবাহ ও বরফবিজ্ঞান (Glaciology), (২) সমুদ্রবিজ্ঞান (Oceanography), (৩) আবহবিজ্ঞান (Meteorology), (৪) সৌরদেহের ক্রিয়াপ্রক্রিয়া (Solar Activity), (৫) মেরুজ্যোতি ও নৈশাকাশদীপ্তি (Aurora and Airglow), (৬) মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays), (৭) আয়নমণ্ডল সংক্রান্ত পদার্থবিজ্ঞান (Ionospheric Physics), (৮) ভূ-চৌম্বকতত্ত্ব (Geomagnetism), (৯) মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব (Gravity), (১০) ভূকম্পনতত্ত্ব (Seismology), (১১) তেজস্ক্রিয়তাসংক্রান্ত গবেষণা (Radioactivity Studies), (১২) অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও পৃথিবীর বিভিন্ন পরিমাপ-সংক্রান্ত

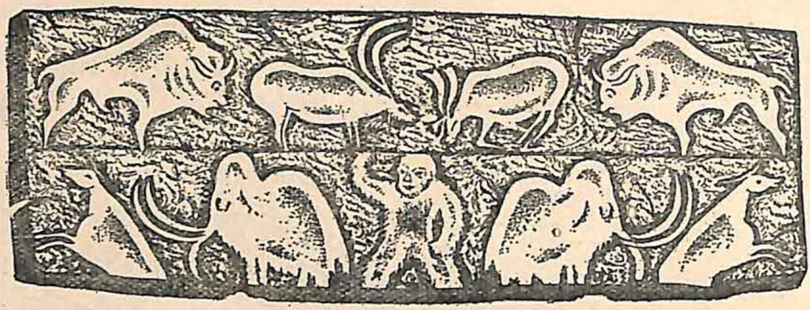
গবেষণা (Latitudes, Longitudes and Measurements of the Earth), এবং (১৩) রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে উর্ধ্বাকাশ সংক্রান্ত গবেষণা (Rocket and Satellite Exploration of the Upper Atmosphere)।

ফিরিস্তি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষের উদ্দেশ্য ছিল এই পৃথিবী ও সূর্য ও মহাকাশকে আরো ভালোভাবে জানা। কাজটি মোটেই সহজ নয়। এজন্যে প্রয়োজন ছিল পৃথিবীর সমস্ত এলাকা জুড়ে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা ও সমস্ত সংগৃহীত তথ্যকে একটি কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করা। আন্তর্জাতিক ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষে এই উদ্দেশ্যে দু-হাজারেরও বেশি গবেষণাগার তৈরি হয়েছিল।

সূর্যের সঙ্গে আমাদের এই পৃথিবীর খুবই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রতি এগারো বছর পরে-পরে সৌরমণ্ডলের উপরিভাগে কতকগুলো কালো কালো দাগ ফুটে ওঠে। এই দাগগুলোকে বলা হয় সৌরকলঙ্ক (sunspot)। এগুলো কিন্তু কোনো গর্ত নয়। সৌরমণ্ডলের উপরিভাগে কতকগুলো জায়গার তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম—তাই এই জায়গাগুলোকে কালো দেখায়। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করে দেখেছেন, সৌরকলঙ্কের আবির্ভাবে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে বড়ো রকমের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই কারণেই ভূপদার্থবিজ্ঞান বর্ষে পৃথিবীর সন্ধানে অভিযানটি শুরু হয়েছিল এমনি এক সৌর-কলঙ্কের আবির্ভাবের সময়ে।

ভূপদার্থ বিজ্ঞান বর্ষের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও দুঃসাহসিক পরিকল্পনা ছিল কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি সম্পর্কে। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ছিয়ানব্বইটি কৃত্রিম উপগ্রহ ও তিনটি কৃত্রিম গ্রহ তৈরি হয়েছে। দুজন সোভিয়েত ও দুজন মার্কিন নভোচারী ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেয়েছেন এবং মহাকাশ-অভিযান সম্পর্কে অজস্র নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।*

* 'মহাকাশের ঠিকানা'য় এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।



শিলালিপি

আমি বাস করি
তোমার ভাঙা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।

ভূপৃষ্ঠ কখনো ছিল পর্বতমালায় সমাকীর্ণ, কখনো সমতল। আমাদের বাস এমন এক যুগে যখন ভূপৃষ্ঠে পর্বতসাজের নতুন এক পর্ব উপস্থিত। এ-সময়ে ভূপৃষ্ঠ যতো বেশি উঁচু-নিচু হয়ে ওঠে, এমন আর কখনো নয়। ফলে, ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটিও চলে পুরোদমে।

এই ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটির রূপ একেক সময়ে একেক রকম। ভূপৃষ্ঠ যখন উঁচু-নিচু হয়ে ওঠে তখন এই প্রক্রিয়াটি খুবই দ্রুত ও ব্যাপক ; সে-সময়ে সমুদ্রের জলে যে ধুলোমাটি এসে পড়ে, তার দানাগুলো হয় খুবই মোটা ও অমসৃণ। আবার ভূপৃষ্ঠ যখন সমতল হয়ে যায়, তখন এই প্রক্রিয়াটি খুবই ধীর ও সীমাবদ্ধ ; সে-সময়ে সমুদ্রের জলে এসে পড়া ধুলোমাটির দানাগুলো হয় খুবই মিহি ও মসৃণ।

আমরা জানি, সমুদ্রের জলের এই ধুলোমাটি ক্রমে থিতিয়ে পড়ে, ক্রমে হয়ে ওঠে পাললিক শিলা। অতএব অবস্থা বিশেষে কখনো পাললিক শিলার দানাগুলো হয়ে ওঠে মোটা কখনো মিহি। এ থেকে ভূপৃষ্ঠের কোন্ বিশেষ অবস্থায় কোন্ বিশেষ দানার পাললিক শিলা তৈরি হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা চলে।

ভূপৃষ্ঠে যেদিন থেকে সমুদ্র তৈরি হয়েছে, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়া, সেদিন থেকেই সমুদ্রের তলদেশে স্তরের পর স্তর পলি থিতিয়ে পড়ছে, সেদিন থেকেই তৈরি হয়ে চলেছে পাললিক শিলা। এই স্তরবিভক্ত পাললিক শিলাকে স্তরীভূত শিলাও (stratified rock) বলা হয়। স্তরীভূত শিলার একেকটি স্তর তৈরি হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসের একেকটি বিশেষ যুগে। কাজেই স্তরীভূত শিলার বিশেষ একটি স্তর থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের বিশেষ এক যুগ সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে পারাটা একেবারে অসম্ভব নয়। স্তরীভূত শিলার এক একটি স্তর হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠা। সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলার স্তরে স্তরে নিশ্চয়ই পৃথিবীর পুরো ইতিহাসটি লেখা হয়ে আছে। শুধু পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে পড়ে নেবার অপেক্ষা।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদের কাছে এই পৃষ্ঠা ওল্‌টানোর কাজটাই সবচেয়ে দুরূহ। সমুদ্রের তলদেশ থেকে এই পৃষ্ঠাগুলো অখণ্ড অবস্থায় তুলে আনবার কোনো উপায় জানা নেই। ফলে পৃথিবীর ইতিহাসের বহু পৃষ্ঠা এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। কিন্তু ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে মাঝে মাঝে এই ইতিহাস-পুস্তকের দু-একটা টুকরো পৃষ্ঠা ঠেলা খেয়ে জলের ওপরে ভেসে ওঠে এবং ভূ-বিজ্ঞানীদের নাগালের মধ্যে এসে যায়। এ রকম টুকরো টুকরো অনেকগুলো পৃষ্ঠার পাঠ উদ্ধার করে পৃথিবীর ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব হয়েছে,—যদিও তার মধ্যে এখনো পর্যন্ত অনেক ফাঁক ও অপূর্ণতা।

শিলালিপির পাঠ উদ্ধার করার ব্যাপারে অসুবিধে অনেক। একটি বাঁধানো বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো পর-পর সংখ্যা দিয়ে চিহ্নিত থাকে ; ওলোট-পালোট হয়ে যাবার কোনো ভয় সেখানে নেই। কিন্তু শিলাস্তরের পৃষ্ঠাগুলো জলের ওপরে ভেসে ওঠার সময়ে কোন্‌টা কোথায় এসে পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সেলাই-খুলে-যাওয়া কোনো বইয়ের পৃষ্ঠাগুলো যদি হাওয়ায় উড়তে শুরু করে—

তাহলেও এমনি লণ্ডভণ্ড ব্যাপার হতে পারে।

আবার শিলাস্তরের ক্ষেত্রে শুধু তো লণ্ডভণ্ড হওয়া নয়, অন্য একটা ব্যাপারও ঘটে। দু-একটা পৃষ্ঠা বেমালুম লোপাট হয়ে যায়। যেমন, ধরা যাক্, জলের ওপরে ভেসে-ওঠা কোনো একটি শিলাখণ্ডকে পরীক্ষা করে পৃথিবীর সাতটি যুগের সাতটি স্তর পাওয়া গেল। এই সাতটি স্তর কি পর-পর সাতটি যুগের? তাই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয় না। আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠে অবিরাম ভাঙাচোরা চলেছে: মহাদেশ তলিয়ে যায়, সমুদ্রের তলদেশ ঠেলা খেয়ে ভেসে ওঠে। ফলে একই শিলাখণ্ডের অবস্থান কখনো জলে, কখনো স্থলে। নানা কারণে ভূত্বকে ভাঁজ পড়ে, ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠকে ওলোট-পালোট করে দিয়ে যায়, আরো নানা কারণে ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশই স্থির অবিচল থাকতে পারে না। শিলাখণ্ডটি প্রথমে ছিল সমুদ্রের তলদেশে; তখন সেটির ওপরে নতুন নতুন পাললিক শিলার স্তর জমেছে। তারপরে ছিল জলের ওপরে; তখন ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় সেটির ওপর থেকে একটির পর একটি স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শিলাখণ্ডটি আবার যখন তলিয়ে যায় তখন সেটির ওপরে আবার নতুন করে শিলাস্তর জমে। কিন্তু মহাদেশ-বাসের সময়ে শিলাখণ্ডটির ওপর থেকে যে কটি স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আর ফিরে পাওয়া যায় না। কাজেই সাতটি স্তরবিশিষ্ট কোনো শিলাখণ্ডকে হাতে পাওয়া মাত্রই বলা চলে না যে এই সাতটি স্তর পর-পর সাতটি যুগের। হয়তো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই সাতটি স্তরের মধ্যে অন্তত সাতটি যুগের ফাঁক রয়ে গিয়েছে।

আবার বিশ্লেষণ করার ব্যাপারটাও খুব সহজ নয়। আগেই আলোচনা করেছি, একযুগের শিলাস্তরের সঙ্গে অপর যুগের শিলাস্তরের পার্থক্যটা হবে মিহি আর মোটায়। কাজেই কোনো একটি বিশেষ শিলাখণ্ডে পর-পর যতগুলো স্তরই থাকুক, তার বিন্যাসের মধ্যে বিশেষ কোনো নতুনত্ব পাওয়া যায় না। একটি স্তর হয়ে ওঠে মিহি, ঠিক তার পরের স্তরটি মোটা। এমনি পর পর।

তাহলে কোন্ স্তরটি কোন্ বিশেষ যুগের সাক্ষ্য তা জানার উপায় কী ?

উপায় দুটি।

একটি উপায়—ফসিল। জীবজগতের বিশেষ একটা বিবর্তন আছে। এক-এক ধরনের জীব বাস করেছে এক-এক যুগে। কোন্ জীব কোন্ বিশেষ যুগে বাস করছে তা জীবের শারীরিক গড়ন দেখেই বলা সম্ভব। কাজেই শিলাস্তরে যদি কোনো ফসিলের ছাপ পড়ে থাকে তাহলে অনায়াসেই বলে দেওয়া যায়, শিলাস্তরটি কোন্ যুগের।

কিন্তু আমরা জানি, পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘ সময় পার হয়েছে যখন জীবের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। এ অবস্থায় পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাবের আগেকার যুগগুলোর শিলাস্তরের হদিশ পাবার উপায়টা কী ?

উপায়—তেজস্ক্রিয়তা। শিলাস্তরে যদি ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম থাকে তাহলে তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্বের সাহায্যে অনায়াসেই বলা সম্ভব শিলাস্তরটির বয়স কত।

কিন্তু সব শিলাস্তরেই ইউরেনিয়াম বা থোরিয়াম নেই। কাজেই তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্বের সাহায্যে সব শিলাস্তরের বয়স মাপা যায় না। এ সমস্ত কারণে পৃথিবীর ইতিহাসে জীবের আবির্ভাবের আগেকার যুগগুলো সম্পর্কে খুব স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব হয়নি।

তা সত্ত্বেও এই খণ্ড খণ্ড শিলালিপিকে সাজিয়ে যে ইতিহাস-পুস্তকটিকে খাড়া করা হয়েছে তা যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। মানুষের লিখিত ইতিহাস প্রকৃতির এই ইতিহাস-পুস্তকের কাছে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার। প্রতি বছরে পাললিক শিলার যে স্তর জমে তাকে যদি এই ইতিহাস-পুস্তকের একটি পৃষ্ঠা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলেও প্রায় দুশো কোটি পৃষ্ঠা পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং সহজেই অনুমান করা চলে, এই ইতিহাস-পুস্তকটি তৈরি করার কাজ একজন-দুজনের নয়, বহু ভূ-বিজ্ঞানীর দীর্ঘ সময়ের

অনলস অধ্যবসায়ের ফল।

এই দুশো কোটি পৃষ্ঠার মধ্যে গোড়ার দিকের বেশ কিছু পৃষ্ঠার বিশেষ কোনো হদিশই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ভাঙন ও ক্ষয়ের চক্রাবর্তনে এই পৃষ্ঠাগুলো হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিংবা ভূত্বকের এমন এক গভীরতায় তলিয়ে গেছে যা কোনো কালেই উদ্ধার হবে না।

আবার শেষের দিকের একশো কোটি পৃষ্ঠার মধ্যে প্রতিটি পৃষ্ঠাই আমাদের পক্ষে যে খুব জরুরি তা নয়। কারণ, আমরা জানি, এই পৃথিবীতে খুব ছোটখাটো পরিবর্তন হতেও সময় লাগে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর। কাজেই আমরা যদি শুধু পরিবর্তনগুলোর হদিশ পেতে চাই তাহলে একসঙ্গে কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠা উল্‌টিয়ে যেতে হবে। যেমন, আজকের দিনের কোনো ঐতিহাসিক একালের একটি বছরের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রায় প্রতিটি দিনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ভবিষ্যতের কেনো এক সময়ে গোটা বছরটির ইতিহাস একটি মাত্র লাইনেই লেখা হয়ে যাবে। তারও পরের যুগে গোটা বিশ শতকের ইতিহাস লিখতেও এক লাইনের বেশি খরচ করা হবে না। অর্থাৎ ইতিহাস যতো প্রাচীন হয় ততোই আমরা শুধু তার বড়ো বড়ো ঘটনাগুলোর দিকে নজর দিই—দৈনন্দিন বিবরণ বাতিল হয়ে যায়।

তেমনি শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকের ক্ষেত্রেও গোড়ার দিকের পৃষ্ঠাগুলো দ্রুত উল্‌টিয়ে গেলে ক্ষতি নেই। আমরা বিশেষ ভাবে নজর দেব শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরের দিকে।

পৃথিবীর ইতিহাসের এই শেষ পঞ্চাশ কোটি বছরকে তিনটি বড়ো অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এই তিনটি অধ্যায়ের নাম: (১) পুরাজীবীয় (Palaeozoic), (২) মধ্যজীবীয় (Mesozoic), (৩) নবজীবীয় (Cainozoic)। এই তিনটি অধ্যায়ের নামকরণ থেকে একটি কথা বোঝা যায়: এই সময়ে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব রয়েছে এবং কোন্ ধরনের জীব কোন্ সময়ে ভূপৃষ্ঠে বাস

করেছে তার ওপরে ভিত্তি করেই এক-একটি অধ্যায় চিহ্নিত। মোটামুটি বলা চলে, ভূপৃষ্ঠে চোখের দেখায় চিনতে পারার মতো জীবের আবির্ভাব গত পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে। সুতরাং এই পঞ্চাশ কোটি বছরের ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নবজীবীয় যুগটি পৃথিবীর ইতিহাসে সাম্প্রতিকতম যুগ। তবে মনে রাখা দরকার যে সাম্প্রতিক বলতে দু-দশ বছরের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো ঘটনাই দু-দশ বছরে ঘটেনি। কাজেই এক-একটি যুগ শেষ হতে যে কোটি কোটি বছর সময় লেগেছে তা খুবই স্বাভাবিক। নবজীবীয় যুগটি শুরু হয়েছিল প্রায় সাত-কোটি বছর আগে এবং এখনো চলছে। আজকের দিনে ভূপৃষ্ঠের যা কিছু ভঙ্গিমা ও বৈচিত্র্য, সবই বিশেষ করে এই যুগেরই সৃষ্টি।

তেমনি মধ্যজীবীয় যুগটি শুরু হয়েছিল প্রায় উনিশ কোটি বছর আগে। তার আগের পুরাজীবীয় যুগটি শুরু হয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

এক-একটি যুগের আবির্ভাব পৃথিবীর ইতিহাসে এক-একটি বড়ো রকমের বিপ্লব। প্রত্যেক যুগের শুরুতেই ভূত্বকে বড়ো বড়ো ভাঁজ পড়েছে। তৈরি হয়েছে সুউচ্চ পর্বতমালা, লোপ পেয়েছে অগভীর সমুদ্র, তলিয়ে গেছে ও ভেসে উঠেছে নতুন নতুন ভূখণ্ড।

গত পঞ্চাশ কোটি বছরে এমনি ধরনের চারটি বিপ্লবের স্বাক্ষর রয়েছে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে। ভূ-বিজ্ঞানীরা এই চারটি বিপ্লবের বিবরণ খুঁটিয়ে সংগ্রহ করেছেন। তবে এই চারটি বিপ্লবের আগেও যে আরো অনেকগুলো বিপ্লব ঘটেছিল এমন অনুমান করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

প্রত্যেকটি যুগকে ভূ-বিজ্ঞানীরা আবার কয়েকটি কালে ভাগ করে নিয়েছেন। যেমন, পুরাজীবীয় যুগটির ছ-টি কাল: (১) ক্যাম্‌ব্রিয়ান, (২) অর্ডোভিসিয়ান, (৩) সিলিউরিয়ান, (৪) ডেভোনিয়ান, (৫) কার্বনিফেরাস এবং (৬) পার্মিয়ান। মধ্যজীবীয় যুগটির আছে তিনটি

কাল; নবজীবীয় যুগটির দুটি। আবার কালকে ভাগ করা হয়েছে কতকগুলো পর্বে। নবজীবীয় যুগে সাতটি পর্ব।

ভূপৃষ্ঠে এক-একটি যুগের স্থায়িত্ব কয়েক কোটি বছর। এই কয়েক কোটি বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের যে-সব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে সেগুলোকে বিশ্লেষণ করেই ভূ-বিজ্ঞানীরা সে-সময়কার খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করেছেন। যে বিশেষ জায়গা থেকে বিশেষ নিদর্শনটি পাওয়া গিয়েছে তার নাম থেকেই সেই বিশেষ সময়ের নামকরণ। যেমন, ক্যাম্‌ব্রিয়ান নামটি এসেছে কেম্‌ব্রিজশায়ার (ইংলণ্ড) থেকে। এই জায়গাতেই প্রথম এই বিশেষ সময়ের অন্তর্ভুক্ত শিলাস্তর পাওয়া গিয়েছিল এবং বিশ্লেষিত হয়েছিল। তেমনি জুরাসিক নামটি এসেছে ফ্রান্স ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী জুরা পর্বতমালা থেকে। কার্বনিফেরাস নামটি দিয়ে সেই বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করা হয়েছে যখন ভূপৃষ্ঠ উদ্ভিদে ছেয়ে গিয়েছিল। এইসব উদ্ভিদই পরে মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়ে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে।

নিচে পৃথিবীর ইতিহাসের সাম্প্রতিকতম তিনটি যুগ এবং তাদের ভাগাভাগি ও বয়সের একটা চেহারা ছক্ কেটে তুলে ধরা হল।

যুগ (era)	কাল (period)	পর্ব (epoch)	বয়স
		পাইস্‌টোসিন	৫০ লক্ষ
নবজীবীয়	কোয়াটারনারি	প্লাইওসিন	১½ কোটি
(স্তন্যপায়ী)	টারশিয়ারী	মাইওসিন	৩ কোটি
		ওলিগোসিন	৪ কোটি
		ইওসিন	৬ কোটি
		প্যালিওসিন	৭ কোটি
	ক্রিটাশুস		১১ কোটি
মধ্যজীবীয়	জুরাসিক		১৪ কোটি
(সরীসৃপ)	ট্রিয়াসিক		১৯ কোটি

	পার্মিয়ান	২২ কোটি
পুরাজীবীয়	কার্বনিফেরাস	২৮ কোটি
(আদিম প্রাণী)	ডেভোনিয়ান	৩২ কোটি
	সিলিউরিয়ান	৩৪ কোটি
	অর্ডোভিসিয়ান	৩৯ কোটি
	ক্যাম্ব্রিয়ান	৫০ কোটি

এই হচ্ছে পৃথিবীর সাম্প্রতিকতম তিনটি যুগের হিসেব। এই তিনটি যুগের আগেও আরো অনেকগুলো যুগ নিশ্চয়ই কেটেছিল। সেগুলোর হিসেব আলাদা আলাদা ভাবে নেবার দরকার নেই; সাধারণভাবে পুরাজীবীয় যুগের আগেকার সবকটি যুগকে একসঙ্গে 'প্রাক্-ক্যাম্ব্রিয়ান' বলে উল্লেখ করা হয়।

শিলালিপির রেখায় প্রথম যে বিপ্লবের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর পাওয়া যাচ্ছে, তার নাম 'লরেন্শিয়ান বিপ্লব'। এই বিপ্লবটি পৃথিবীর প্রথম বিপ্লব নাও হতে পারে। হয়তো এই বিপ্লবের আগেও অনেকগুলো বিপ্লব ঘটে গেছে। কিন্তু যেহেতু সে-সময়ে সমুদ্রের অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই প্রকৃতির নিজস্ব ভাষায় শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকটি লেখার কাজও শুরু হয়নি। অতএব শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকে লরেন্শিয়ান বিপ্লবের আগেকার কালের অন্য কোনো বিপ্লবের উল্লেখ নেই।

অনুমান করা চলে, লরেন্শিয়ান বিপ্লবের সময়ে ভূত্বকে মস্ত মস্ত ভাঁজ পড়েছিল। তৈরি হয়েছিল আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণী। সমুদ্রের তলদেশ থেকে চুনাপাথর আর বেলেপাথরের স্তর ঠেলা খেয়ে উঠে এসেছিল জলের ওপরে। সেই বিরাট বিপুল ভাঙাচোরার বিশেষ কোনো সাক্ষ্য এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না; কারণ ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় সে-যুগের সমস্ত পর্বত বহু কোটি বছর আগেই ধুলো হয়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে। তবে সে-যুগের নিদর্শন হিসেবে যে-সব গ্রানাইট শিলার স্তর রয়ে গেছে তা থেকে

তেজস্ক্রিয়তার তত্ত্বের সাহায্যে যুগটির প্রাচীনতা সম্পর্কে ধারণা হতে পারে। ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকে উল্লিখিত এই প্রথম বিপ্লবটি ঘটেছিল প্রায় একশো কোটি বছর আগে।

পরের বিপ্লবটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আল্‌গোমিয়ান বিপ্লব'। এই দুই বিপ্লবের মাঝখানে দীর্ঘ সময় ভূপৃষ্ঠ সমতল অবস্থায় ছিল, মহাদেশের সীমানায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে দেখা দিয়েছিল অগভীর সমুদ্র, ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটি হয়ে উঠেছিল স্তিমিত। আল্‌গোমিয়ান বিপ্লব ভূপৃষ্ঠের এই স্তিমিত অবসাদকে ভেঙে চুরমার করে দেয়; আবার অপরূপ এক গিরিভঙ্গিমায় রূপবতী হয়ে ওঠে পৃথিবী।

ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় আবার একসময়ে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত পর্বত নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সমুদ্রের তলদেশে নতুন নতুন শিলাস্তর জমে ওঠে, আবার দীর্ঘকালের জন্যে সেই স্তিমিত অবসাদ ভূপৃষ্ঠে কায়েম হয়ে বসে। তারপরে আবার এক বিপ্লব, আবার এক স্তিমিত অবসাদ। পৃথিবীর তিনশো কোটি বছরের ইতিহাসে এমনি ভাবে বারে বারে বিপ্লব ঘটেছে এবং বারে বারে নতুন বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকে শেষের দিকে যে বিপ্লবের স্বাক্ষর রয়েছে সেটির নাম—'চার্নিয়ান বিপ্লব'। এই বিপ্লবের পরেই পৃথিবীর ইতিহাসের আদিম যুগ শেষ হয়েছে বলা চলে। এদিক থেকে চার্নিয়ান বিপ্লবকে তুলনা করা চলে মিশর সভ্যতার সঙ্গে। মিশর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন মানুষের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের শেষ, তেমনি চার্নিয়ান বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেও পৃথিবীর আদিম যুগের শেষ।

চার্নিয়ান বিপ্লবে যে যুগটির সূচনা, সেই যুগটির নিদর্শন ভুপৃষ্ঠের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। ভূত্বক কি-ভাবে গড়ে উঠেছে সেই ইতিহাস প্রায় পুরোপুরি প্রথম জানতে পারা যায় এই যুগের

শিলাস্তরকে বিশ্লেষণ করেই। তাছাড়া, এই যুগের শিলাস্তরেই আবিষ্কৃত হয়েছে আদিম প্রাণীজগতের প্রথম নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলোকে আমরা বলি ফসিল। আগেই বলেছি, বাঁধানো বইয়ে যেমন পৃষ্ঠাসংখ্যার চিহ্ন; শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকে তেমনি ফসিল। শিলালিপিকে পর-পর সাজিয়ে তোলবার কাজে ফসিল-চিহ্ন যতোটা সাহায্য করে, এমন আর কোনো কিছু নয়।

অর্থাৎ, চার্নিয়ান বিপ্লবের পর থেকেই পৃথিবীর ইতিহাসকে মোটামুটি সুসংবদ্ধ ভাবে সাজাতে পারা গেছে। কোথাও বড়ো রকমের কোনো ফাঁক বা অস্পষ্টতা নেই। এজন্যেই পৃথিবীর ইতিহাসে চার্নিয়ান বিপ্লবের পরেকার যুগগুলোকে বলা হয়, 'ঐতিহাসিক কাল'। এই ঐতিহাসিক কালকেই তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে —পুরাজীবীয়, মধ্যজীবীয়, নবজীবীয়।

চার্নিয়ান বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাজীবীয় যুগের শুরু। এটি আদিম প্রাণীদের যুগ। অন্যান্য বিপ্লবের পরেও যেমনটি হয়েছে, এই বিপ্লবের পরেও তাই—ভূপৃষ্ঠ নানা জায়গায় উঁচু হয়ে উঠেছে, নানা জায়গায় তলিয়ে গেছে; সমুদ্র কোথাও এগিয়ে এসেছে, কোথাও সরে গেছে; মহাদেশ কোথাও আয়তনে বেড়েছে, কোথাও কমেছে। এই বিপুল ভাঙাগড়ার মধ্যেই সমুদ্রের জলে আদিম প্রাণী-জগতের জীবনযাপন ও বংশবৃদ্ধি।

পুরাজীবীয় যুগের ছ-টি ভাগের কথা বলা হয়েছে। যুগের সূচনায় ক্যাম্ব্রিয়ান, তারপর অর্ডোভিসিয়ান, তারপর সিলিউরিয়ান। ক্যাম্-ব্রিয়ান থেকে সিলিউরিয়ানে পৌঁছতে ষোল কোটি বছর পার হয়েছে। এই ষোল কোটি বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন দেখা যায় প্রাণীজগতে। প্রাণীজগৎ যেমন সংখ্যায় বেড়েছে, তেমনি বহু শাখাপ্রশাখায় ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। প্রথমে ছিল অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী, ষোল কোটি বছরের মধ্যেই সিলিউরিয়ানে এসে পাওয়া যাচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রথমে ছিল জলচর প্রাণী, ষোল কোটি বছরের মধ্যেই জলচর ও ভূচর

উভয় শ্রেণীর প্রাণী।

কিন্তু এই ষোল কোটি বছর ধরে ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়াটিও পুরোদমে চলে এসেছে। ফলে চার্নিয়ান বিপ্লবের যে-সব সাক্ষ্য আকাশছোঁয়া পর্বতের রূপ নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তা ধুয়ে-মুছে নির্মূল হয়ে গেছে এতদিনে। ভূপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ এলাকাকে গ্রাস করেছে অগভীর সমুদ্র। শিলাস্তরের ওপরে শিলাস্তর জমে উঠে টলিয়ে দিয়েছে ভূত্বকের ভারসাম্য।

এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ভূপৃষ্ঠে আবার বিপুল এক ভাঙাচোরা শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ, নতুন আরেকটি বিপ্লব—যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্যালেডোনিয়ান বিপ্লব'। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পুরাজীবীয় যুগের সূত্রপাতে রয়েছে একটি বিপ্লব, মাঝামাঝি সময়ে আরেকটি বিপ্লব। এই ক্যালেডোনিয়ান বিপ্লবের ফলে আবার সারা ভূপৃষ্ঠে নতুন এক পর্বতশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়ায়, অগভীর সমুদ্রের গ্রাস থেকে মুক্ত হয় বিস্তীর্ণ ভূভাগ।

ক্যালেডোনিয়ান বিপ্লবের পরে পুরাজীবীয় যুগের আরো তিনটি কাল পার হয়েছে। ডেভোনিয়ান, কার্বনিফেরাস ও পার্মিয়ান। ডেভোনিয়ান উপযুগটিকে অনেক সময়ে বলা হয় মৎস্য উপযুগ। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত সমুদ্রে এ-সময়ে মাছজাতীয় প্রাণীর সংখ্যাধিক্য ঘটেছিল। আবার এই সময়েই বিস্তীর্ণ অরণ্যে শ্যামল হয়ে উঠেছিল পৃথিবীর স্থলভাগ। পরবর্তীকালে এই অরণ্য যেমন বিস্তীর্ণ হয়েছে তেমনি হয়েছে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে জলাভূমি অঞ্চল নিবিড় অরণ্যে ছেয়ে গিয়েছিল। এই অরণ্যই পরে ভূগর্ভের চাপে ও উত্তাপে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। কার্বনিফেরাস যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট্য—এ সময়ে প্রাণীজগতের একটি শাখা আকাশে উড়তে শুরু করে। পাখি নয়, এক ধরনের পতঙ্গ।

পুরাজীবীয় যুগের শেষ পর্ব পার্মিয়ান কালে পৌঁছতে আরো বারো কোটি বছর পার হয়েছে। ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে আবার এক নতুন বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছিল।

শিলালিপিতে এই নতুন বিপ্লবের স্বাক্ষর পড়েছে আজ থেকে প্রায় উনিশ কোটি বছর আগে। এই বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই পুরাজীবীয় যুগের শেষ এবং মধ্যজীবীয় যুগের শুরু।

এই বিপ্লবটির নাম দেওয়া হয়েছে 'আপালোশিয়ান বিপ্লব'। এই বিপ্লবের ফলে ভূপৃষ্ঠে আবার ভাঙাচোরা শুরু হয়ে যায়, আবার নতুন ভঙ্গিমা আসে।

মধ্যজীবীয় যুগটি হচ্ছে সরীসৃপদের যুগ। এ সময়ে স্থলে এবং জলে অতিকায় সরীসৃপরা অবাধ রাজত্ব করে গেছে। এমন কি টেরোডাক্‌টিল জাতীয় কোনো কোনো সরীসৃপ আকাশে উড়তে শুরু করেছিল।

প্রাণীজগতের ইতিহাসে এই মধ্যজীবীয় যুগটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাণীজগতের এক-একটি শাখা এ-সময়ে যেন পাল্লা দিয়ে একে অপরের চেয়ে অতিকায় হয়ে উঠেছিল। অতীতে এবং বর্তমানে আর কখনো এমন পাহাড়ের মতো এক-একটি জীব এমনভাবে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করেনি। ডিপ্লোডোকাস জাতীয় সরীসৃপ লম্বায় হত একশো ফুটের কাছাকাছি। পাখির জন্ম তখনো পর্যন্ত হয়নি কিন্তু তার প্রস্তুতি পুরোদমে চলছিল।

ইতিমধ্যে ভাঙন ও ক্ষয়ের প্রক্রিয়ায় মূহূর্তের জন্যেও বিরতি আসেনি। যথানিয়মে ভূপৃষ্ঠ আবার সমতল হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর ইতিহাসের শেষ বিপ্লবের পূর্বাহ্ন উপস্থিত হয়।

এই শেষ বিপ্লবটির নাম নবজীবীয় বিপ্লব এবং প্রায় সাত কোটি বছর আগে শিলালিপিতে এই বিপ্লবের স্বাক্ষর পড়েছে।

নবজীবীয় যুগে এসে দেখা যায়, সেখানে চলেছে স্তন্যপায়ীদের আধিপত্য। মধ্যজীবীয় অতিকায় সরীসৃপদের চিহ্নমাত্র নেই। প্রাণীজগতে এত বড়ো একটি দুর্ঘটনা কেন ঘটল তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। মোটামুটি বলা চলে, মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপরা পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি। হয়তো ভূপৃষ্ঠে জলবায়ুর এমন একটা পরিবর্তন এসেছিল যা এদের পক্ষে

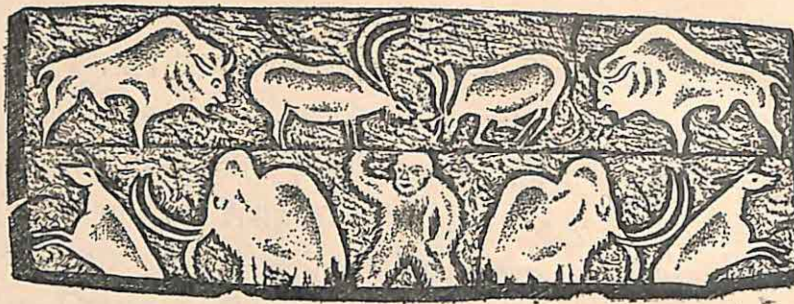
প্রাণঘাতী হয়েছে। হয়তো স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এরা এঁটে উঠতে পারেনি। কিংবা হয়তো অদৃশ্য কোনো জীবাণুর আক্রমণ এদের এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল যে বংশরক্ষার অবকাশটুকুও থাকেনি। এমনি আরো হাজারটা কারণ থাকতে পারে। প্রাণীজগতে অতিকায় হতে পারাটাই টিকে থাকার পক্ষে যুক্তি নয়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারাটাই হচ্ছে আসল কথা। প্রাণীজগতের ইতিহাসে এই সত্য বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা বাস করছি নবজীবীয় যুগে। আজকের দিনে যেখানে যতো পর্বতমালা দেখা যাচ্ছে তা বিশেষ করে এই যুগেরই সৃষ্টি। যদিও ইতিমধ্যেই এই যুগটিকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে কিন্তু সব মিলিয়েও যুগটির বয়স সাত কোটি বছরের বেশি নয়। কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানীর মতে আমাদের যুগের বিপ্লবের পালা এখনো শেষ হয়নি। এই মতটি যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে নতুন জায়গায় আরো কয়েকটি পর্বতমালা তৈরি হতে পারে এবং ইতিমধ্যেই যে-সব পর্বতমালা তৈরি হয়েছে (যেমন, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইওরোপের আল্পস্, এশিয়ার হিমালয়, ইত্যাদি) তা আরো অনেক বেশি উঁচু হয়ে উঠতে পারে।

নবজীবীয় যুগে ভূত্বকে সবচেয়ে বড়ো ভাঁজ পড়েছে এশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। ফলে হিমালয় পর্বতমালার সৃষ্টি। এই পর্বতমালার বয়স মাত্র ছ-কোটি বছর। অনুমান করা চলে, এই পর্বতমালা তৈরি হবার সময়ে এই অঞ্চলে প্রচণ্ড এক বিপর্যয় চলেছিল এবং বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত। ভারতের দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের কালো মাটি তৈরি হয়েছে আগ্নেয় শিলা থেকে। এই শিলাস্তর দশ-হাজার ফুট গভীর এবং জাতের বিচারে ব্যাসল্ট। সুতরাং অনুমান করা চলে, হিমালয়ের জন্ম হবার সময়ে যে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় এই অঞ্চলের ভূত্বক আক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তারই সাক্ষ্য দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের মাটিতে এখনো রয়ে গেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমনিভাবে যুগের পর যুগ পার হয়েছে। প্রত্যেকটি যুগের আদি ও অন্ত ভূপৃষ্ঠ-আলোড়নকারী বিপ্লবের দ্বারা চিহ্নিত। এবং দুই বিপ্লবের মধ্যবর্তী অধিকাংশ সময়ে ভূপৃষ্ঠের কোনো ভঙ্গিমা থাকেনি, মহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকাকে গ্রাস করেছে অগভীর সমুদ্র, ভূখণ্ড হয়েছে সমতল। আবার ভূপৃষ্ঠ যখনই এই অবস্থায় পৌঁছেছে তখনই প্রচণ্ড এক বিপ্লব ভূত্বককে আলোড়িত আবর্তিত করে দিয়ে গেছে। ভূপৃষ্ঠে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, কোনো ভঙ্গিমাই শাশ্বত নয়। বিপ্লব ও বিবর্তনের দুর্নিবার এক চক্রাবর্তে এক সর্বগ্রাসী ভাঙা-গড়ার খেলা চলেছে। হিমালয়ের মতো সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গ তৈরি হওয়াটা যেমন অদ্বিতীয় ঘটনা নয়, তেমনি হিমালয়ের মতো গিরিশৃঙ্গকে রেণু রেণু করে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবার ব্যাপারটাও বারে বারে ঘটেছে। আবার এটুকুই সব নয়। শুধু গিরিশৃঙ্গ তৈরি হওয়া বা গিরিশৃঙ্গ ধুলোয় মিশে যাওয়া—এ ছাড়াও ভূপৃষ্ঠে আরো অজস্র পরিবর্তন অনবরত ঘটে চলে। এককালে ভূমধ্যসাগরের কোনো অস্তিত্ব ছিল না ; জার্মানি, রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল এবং চীনের অধিকাংশ জুড়ে ছিল অগভীর সমুদ্র ; অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাংশ তলিয়ে ছিল ভারত মহাসাগরের জলে। এসব খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। একটি বা দুটি বিপ্লব মহাদেশগুলোর চেহারা এমনভাবে পাল্‌টিয়ে দিয়ে গেছে যে একযুগের সঙ্গে আরেক যুগের সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়ার চেষ্টাটা নিতান্তই পণ্ডশ্রম হবে।

আর এই বিপুল সর্বগ্রাসী পরিবর্তনের ইতিহাস মাটি ও শিলার স্তরে স্তরে প্রকৃতির নিজস্ব ভাষায় লেখা হয়ে চলেছে। মানুষের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই যে প্রকৃতির এই নিজস্ব ভাষা তার কাছে অনায়ত্ত নয়। কত ক্ষুদ্র মানুষের জীবন, তবুও কোটি কোটি বছরের ইতিহাসকে শিলালিপির রেখায় পাঠ করবার ক্ষমতা সে আয়ত্ত করেছে।



জলবায়ু

জাগুক মন, কাঁপুক বন, উড়ুক ঝরা পাতা,
উঠুক জয়, তোমারি জয়, তোমারি জয়গাথা।
ঋতুর দল নাচিয়া চলে
ভরিয়া ডালি ফুলে ও ফলে,
নৃত্যলোল চরণতলে মুক্তি পায় ধরা,—
ছন্দে মেতে যৌবনেতে রাঙিয়ে ওঠে জরা।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে জানা গেল, ভূপৃষ্ঠ বারে বারে পর্বতাকীর্ণ হয়েছে, বারে বারে সমতল। ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্যাসই চিরস্থায়ী হয়নি। এক বিরামহীন পরিবর্তন-চক্র একেক যুগে একেকভাবে সাজিয়ে দিয়ে গেছে ভূপৃষ্ঠকে।

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে, ভূপৃষ্ঠের এত অদল বদল হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু কি চিরকাল একই রকম থেকেছে? ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি জলবায়ুর কোনো পরিবর্তন হয়নি?

আলোচনা শুরু করবার আগে দু-একটা গোড়ার কথা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

আমরা জানি, ভূপৃষ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু। মেরু-অঞ্চলে সারা বছরই বরফ জমে থাকে কিন্তু বিষুব-অঞ্চলের সমতলে বরফের ছিটেফোঁটাও নেই। 'সমতলে' বললাম এই কারণে যে, বিষুব-অঞ্চলেও পর্বতের চুড়োয় বরফ জমে থাকাটা অসম্ভব নয়।

মেরু-অঞ্চল থেকে যতোই বিষুব-অঞ্চলের দিকে এগিয়ে আসা যায় ততোই তাপ বাড়ে। কেন বাড়ে, সে-আলোচনায় পরে আসছি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি থেকে এটুকু বুঝে নেওয়া চলে যে তাপের বাড়া-কমাটা নির্ভর করে সূর্যের তাপের ওপরে। মেরু-অঞ্চলে নিশ্চয়ই সূর্যের তাপ কম, বিষুব-অঞ্চলে নিশ্চয়ই বেশি—নইলে কিছুতেই দু-জায়গার জলবায়ুর মধ্যে এতটা তফাৎ হতে পারে না।

ভূপৃষ্ঠের কোনো জায়গায় সূর্যের তাপ বেশি, কোনো জায়গায় কম—এমনটি কেন হবে ?

ব্যাপারটা বুঝতে হলে প্রথমে কতগুলো সংজ্ঞা জানা দরকার।

আমরা জানি, পৃথিবী লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে। কল্পনা করা চলে পৃথিবীর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু বরাবর একটি সরল রেখা রয়েছে আর সেই সরল রেখাটিকে ঘিরেই পাক খাচ্ছে পৃথিবী। এই সরল রেখাটির নাম মেরুরেখা। বলা বাহুল্য, মেরুরেখার উত্তর প্রান্তে উত্তর মেরু বা সুমেরু, দক্ষিণ প্রান্তে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু। আবার এই দুটি মেরুবিন্দু থেকে সমান দূরে ভূ-গোলকের পেট-বরাবর ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে পুব-পশ্চিমে বেড় দেওয়া একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে ; এই রেখাটির নাম বিষুব রেখা বা নিরক্ষ রেখা। বিষুব রেখা ভূ-গোলককে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করেছে ; উত্তর দিকের অংশের নাম উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ দিকের অংশের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

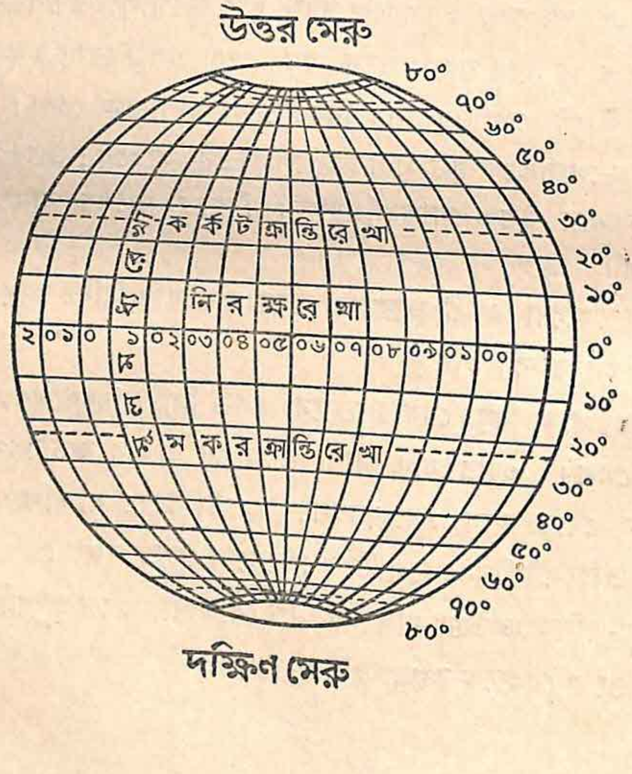
ভূপৃষ্ঠের কোনো একটি জায়গার অবস্থানকে যদি নির্দিষ্ট করতে হয়, তাহলে আমরা কী করি ?

মনে করা যাক, বিষুব রেখার কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে রওনা হওয়া গেল। এবার যদি জানা থাকে যে প্রথমে কতটা পুবে বা পশ্চিমে যেতে হবে এবং তারপরে কতটা উত্তরে বা দক্ষিণে যেতে হবে—তাহলেই ঠিক জায়গাটিতে পৌঁছনো যেতে পারে।

এই পুব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের মাপ বোঝাবার জন্যে ভূপৃষ্ঠে আরো অনেকগুলো রেখাকে কল্পনা করা হয়েছে।

প্রথমে ধরা যাক পুব-পশ্চিমের মাপ।

ভূপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু বরাবর কতগুলো দাগ টানা যেতে পারে। দাগগুলো এমন হবে য়েন বিষুবরেখাকে খাড়াখাড়ি ছেদ করে। এবার কোনো একটি দাগকে এমন বিশেষ-ভাবে চিহ্নিত করা যাক যেন সেখান থেকেই সমস্ত মাপের শুরু। তাহলে কোনো জায়গা সেই বিশেষ দাগ থেকে কত ডিগ্রি পুবে বা পশ্চিমে তা জানতে পারলেই প্রথম মাপটি জানা হয়ে যায়। উত্তর-দক্ষিণ বরাবর এই দাগগুলোর নাম মধ্যরেখা, ইংরেজিতে মেরিডিয়ান্স্ বা দ্রাঘিমারেখা, ইংরেজিতে লাইন্স্ অব লন্জিটিউড আর যে দাগটিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তার নাম মূল মধ্যরেখা, ইংরেজিতে প্রাইম মেরিডিয়ান। আমরা আজকাল মূল মধ্যরেখা হিসেবে যে দাগটিকে ধরে নিয়েছি তা লণ্ডনের কাছাকাছি গ্রীনিচের ওপর দিয়ে গেছে। নিচের ছবি দেখলে সংজ্ঞাগুলো বোঝা যাবে।



এবার উত্তর-দক্ষিণের মাপ।

এই মাপটি অপেক্ষাকৃত সহজ। বিষুবরেখা থেকে সরাসরি মাপ নিয়ে স্থির করা হয়, জায়গাটি কত উত্তরে বা কত দক্ষিণে। আমরা জানি, বিষুবরেখা থেকে উত্তরমেরুর দূরত্ব নব্বুই ডিগ্রি, তেমনি দক্ষিণমেরুর দূরত্বও নব্বই ডিগ্রি। বিষুবরেখা থেকে এক-এক ডিগ্রি দূরে দূরে কতগুলো দাগ টানা চলে। এই দাগগুলো বিষুবরেখার মতোই ভূপৃষ্ঠকে পুবে-পশ্চিমে বেড় দেবে। এই কল্পিত দাগগুলোর নাম অক্ষরেখা, ইংরেজিতে প্যারালাল্স্ অব ল্যাটিটিউড্। পাশের ছবিতে প্রতি দশ ডিগ্রি অন্তর-অন্তর একটি করে অক্ষরেখা টানা হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দ্রাঘিমাই হোক বা অক্ষাংশই হোক, দুয়ের বেলাতেই ভূপৃষ্ঠের একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মাপ নিতে হয়। এই মাপ সম্পর্কে বিশেষভাবে মনে রাখবার কথা এই যে, মাপটি মাইলে নেওয়া হয় না, নেওয়া হয় ডিগ্রিতে। আমরা জানি, বৃত্তাকার একটি গোলকের ওপর দিয়ে পুরো একটি চক্কর দিতে পারলে ৩৬০° অতিক্রম করা হয়, আধাআধি চক্কর দিলে ১৮০°, সিকিভাগ চক্কর দিলে ৯০°, তিনশো-ষাট ভাগের একভাগ চক্কর দিলে ১°। দূরত্ব যদি এক ডিগ্রিরও কম হয়, তাহলে ডিগ্রিকে ভাগ করে নেওয়া হয় মিনিটে, মিনিটকে সেকেণ্ডে। ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ডিগ্রি।

এবার একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যেতে পারে।

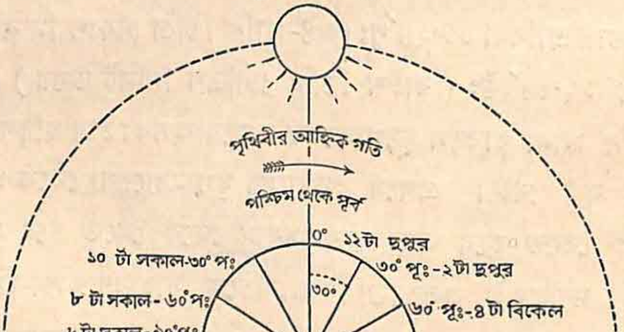
কলকাতার দ্রাঘিমা ৮৮°২৪´পূঃ (অষ্ট-আশি ডিগ্রি চব্বিশ মিনিট পূর্ব), অক্ষাংশ ২২°৩৪´ উঃ (বাইশ ডিগ্রি চৌত্রিশ মিনিট উত্তর)। এই দুটি মাপ জানা থাকলে ভূগোলকের ওপরে কলকাতার হদিশ পেতে কোনো কষ্ট নেই। প্রথমে আমাদের মূল মধ্যরেখা থেকে ৮৮°২৪´ পূর্বদিকে যেতে হবে আর পরে সেখান থেকে যেতে হবে ২২°৩৪´ উত্তরে। তাহলেই কলকাতা। মানচিত্রে সাধারণত দশ-ডিগ্রি বা কুড়ি-ডিগ্রি অন্তর-অন্তর দ্রাঘিমারেখা ও অক্ষরেখাগুলোকে এঁকে

নেওয়া হয়। কাজেই, কোন্ জায়গা কোন্ বিশেষ দ্রাঘিমারেখার ওপরে এবং কোন্ বিশেষ অক্ষরেখার ওপরে তা জানা থাকলেই এক লহমার মধ্যে জায়গাটিকে খুঁজে বার করা চলে। কোরিয়া যুদ্ধের সময়ে ৩৮-অক্ষরেখার উত্তরে-দক্ষিণে লড়াই চলেছিল, সেকথা অনেকেরই মনে আছে বোধ হয়। এই ৩৮-অক্ষরেখাটি হচ্ছে ৩৮° উঃ অক্ষরেখা এবং এই অক্ষরেখাটি কোরিয়াকে প্রায় সমান দু-ভাগে বিভক্ত করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে ঘড়ির সময় নিয়ে এখানে কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা জানি, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পুবে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার পাক খাচ্ছে। আমরা এই পাক খাওয়াটা টের পাই না। আমাদের মনে হয়, সূর্য পুব থেকে পশ্চিমে পৃথিবীর চারদিকে চক্কর দিয়ে চলেছে। পুরো একটি চক্কর দেয়, অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি অতিক্রম করে ২৪ ঘণ্টায়। তার মানে প্রতি ঘণ্টায় ১৫°।

আবার আমাদের কাজের সুবিধের জন্যে আমরা ঠিক করে নিয়েছি যে কোনো জায়গায় সূর্য যখন আকাশের ঠিক মধ্যরেখায় থাকে তখন দুপুর বারোটা। কিন্তু সূর্য একই সময়ে সব দেশের আকাশে ঠিক মধ্যরেখায় থাকতে পারে না। কাজেই ঠিক একই সময়ে সব দেশের ঘড়িতে দুপুর বারোটা বাজে না। খানিকটা তফাৎ থেকে যায়। কতটা তফাৎ? প্রতি পনেরো ডিগ্রিতে এক ঘণ্টা।



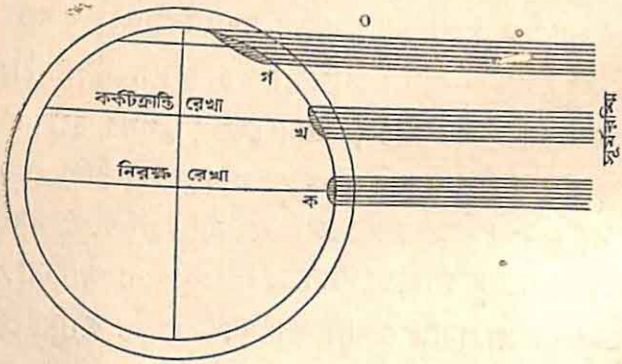
পাশের ছবির দিকে তাকালে ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যাবে। আমরা ধরে নিয়েছি গ্রীনিচের মধ্যরেখাটি মূল মধ্যরেখা, অর্থাৎ০°। ছবিতে দেখানো হয়েছে, সূর্য গ্রীনিচের ঠিক মধ্যরেখায়, অর্থাৎ গ্রীনিচের ঘড়িতে দুপুর বারোটা। তা হলে গ্রীনিচের পুবদিকে সমস্ত দেশে সূর্য অনেক আগেই মধ্যরেখা পার হয়েছে, গ্রীনিচের পশ্চিম দিকে সমস্ত দেশে সূর্য অনেক পরে মধ্যরেখা পার হবে। কতখানি আগে বা কতখানি পরে তার হিসেবটা পাওয়া যায় দ্রাঘিমার হিসেব থেকে। যে দেশের দ্রাঘিমা ৩০° পূঃ সেখানে আরো দু-ঘণ্টা আগে সূর্য ছিল মধ্যরেখায়—অর্থাৎ আরো দু-ঘণ্টা আগে ঘড়ির কাঁটা ছিল বারোটার ঘরে। তার মানে, এখন সেখানে দুপুর দুটো। এমনি ভাবে, ৬০° পূঃ দ্রাঘিমায় চার ঘণ্টা আগে দুপুর বারোটা বেজেছিল ; সেই হিসেবে এখন বিকেল চারটে। তেমনি, পশ্চিমের সমস্ত দেশে ঘড়ির সময় আরো পেছিয়ে থাকবে। ৩০° পঃ দ্রাঘিমায় সকাল দশটা, ৬০° পঃ দ্রাঘিমায় সকাল আটটা, ৯০° পঃ দ্রাঘিমায় সকাল ছ-টা। দেশে দেশে ঘড়ির সময়ের এই তফাৎ আছে বলেই এক দেশে যে সময়ে যে ঘটনা ঘটে অন্যদেশের ঘড়ির সঙ্গে তার মিল থাকে না। যেমন, কলকাতা বেতার থেকে সন্ধ্যে ছ-টায় প্রচারিত কোনো গান যদি লণ্ডনের কোনো লোক শুনতে চায় তাহলে তাকে লণ্ডনের সময়ের দুপুর বারোটার কাছাকাছি রেডিও খুলতে হবে।

এবার আলোচনা চলতে পারে, কেন ভূপৃষ্ঠের জায়গাবিশেষে সূর্যের তাপের তারতম্য ঘটে।

পৃথিবী থেকে সূর্য এতবেশি দূরে এবং সূর্যের তুলনায় পৃথিবী এতবেশি ছোট যে ধরে নেওয়া হয়, সূর্যের কিরণ সমান্তরালভাবে পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। তাহলে কেন ভূপৃষ্ঠের কোথাও সূর্যের তাপ বেশি, কোথাও সূর্যের তাপ কম ?

পরের পৃষ্ঠার ছবির দিকে তাকালে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। ছবিতে দেখানো হয়েছে, সূর্যকিরণ সমান্তরালভাবে এসে ভূপৃষ্ঠের

তিন জায়গায় পড়েছে—বিষুব-অঞ্চলে, মেরু-অঞ্চলে এবং এই দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি জায়গায়। কিন্তু যেহেতু ভূপৃষ্ঠ সমতল নয়, গোলাকার—সুতরাং দেখা যাবে, সূর্যকিরণের একটা গুচ্ছ বিষুব-অঞ্চলে যতোখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে, মেরু-অঞ্চলের দিকে সেই একই গুচ্ছ ছড়িয়ে পড়ে আরো অনেক বেশি জায়গায়। ফলে সূর্যকিরণের এই গুচ্ছটি বিষুব-অঞ্চলকে যতোখানি উত্তপ্ত করে তুলতে পারে, মেরু-অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে তার চেয়ে অনেক কম।



তাছাড়াও দ্বিতীয় আরেকটি ব্যাপার আছে। ছবির দিকে তাকালে দেখা যাবে, বিষুব-অঞ্চলে সূর্যকিরণের গুচ্ছটিকে যতোখানি পুরু বায়ুমণ্ডলকে ফুঁড়ে আসতে হচ্ছে, মেরু-অঞ্চলে আসতে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি পুরু বায়ুমণ্ডলকে ফুঁড়ে; স্বাভাবিক নিয়মেই যেখানে বেশি পুরু বায়ুমণ্ডলকে ফুঁড়ে সূর্যের তাপকে পৌঁছতে হচ্ছে সেখানে পথেই সূর্যের তাপের অনেকখানি খোয়া যায়।

এমন কি পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সকালে-দুপুরে-বিকেলে যে উত্তাপের তারতম্য তাও এই একই কারণে। একই সূর্য থেকে তাপ আসছে, তাহলে কেন সকালে-বিকেলে সূর্যের তাপ কম, দুপুরে সূর্যের তাপ বেশি? কারণ, সকালের ও বিকেলের সূর্যকিরণ খাড়াভাবে আসে না বলে প্রথমত অনেক বেশি পুরু বায়ুমণ্ডলকে ফুঁড়ে আসে, দ্বিতীয়ত অনেক বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দুপুরের সূর্যকিরণের কাছে বায়ুমণ্ডলের প্রতিবন্ধকতা

কম এবং তা অপেক্ষাকৃত অল্প জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে। এজন্যেই একই সূর্যের তাপ সকালে-বিকেলে কম, দুপুরে বেশি।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই: যদিও একই সূর্যের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছচ্ছে কিন্তু সেই উত্তাপে ভূপৃষ্ঠের সব জায়গা সমান উত্তপ্ত হচ্ছে না। যে এলাকায় সূর্যকিরণ অপেক্ষাকৃত কম পুরু বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে আসে এবং অপেক্ষাকৃত কম জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানে উত্তাপ বেশি। যে এলাকায় সূর্যকিরণ অপেক্ষাকৃত বেশি পুরু বায়ুমণ্ডল ফুঁড়ে আসে এবং অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে সেখানে উত্তাপ কম। এই কারণেই বিষুব-অঞ্চলের দিকে উত্তাপ বেশি, মেরু-অঞ্চলের দিকে উত্তাপ কম।

কিন্তু এ তো গেল কোনো একটি বিশেষ মুহূর্তের হিসেব। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য একটি হিসেব আছে। ভূপৃষ্ঠের যে-কোনো এলাকায় সারা বছরের হিসেব নিলে দেখা যাবে, ৩৬৫ দিনের মধ্যে যেমন আছে অনেকগুলো দিন, তেমনি অনেকগুলো রাত্রি। দিনের বেলার জমানো উত্তাপ রাত্রিবেলা খরচ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুই কি উদ্বৃত্ত থাকে না? উদ্বৃত্ত থাকতে পারে যদি দিনের বেলার জমানো উত্তাপ পরিমাণে বেশ অনেকখানি হয়। আমরা জানি, সারা বছরে দিন-রাত্রির মাপ সমান হয় না, কখনো দিন বড়ো, কখনো রাত বড়ো। এ-ব্যাপারটা কেন ঘটে তা নিয়ে আমরা একটু পরেই আলোচনা করব, আপাতত দিন বড়ো-ছোট হওয়ার ফল কী হতে পারে তা জেনে নেওয়া যাক।

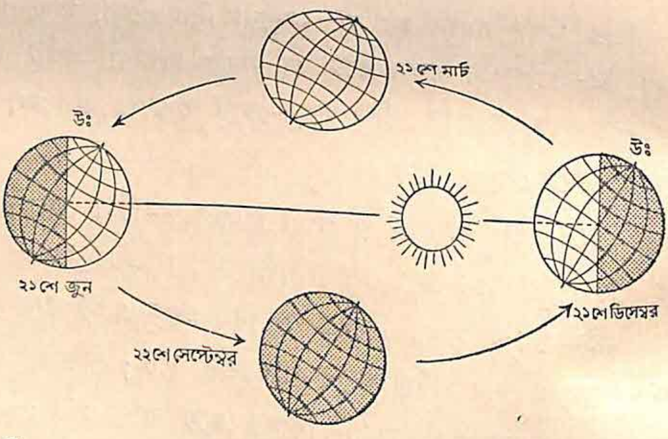
রাতের চেয়ে দিন বড়ো হলে সারা দিনের জমানো উত্তাপ সারা রাতে পুরোপুরি খরচ হয়ে যেতে পারে না, কিছুটা উদ্বৃত্ত থেকে যায়। এই উদ্বৃত্ত সঞ্চয় দিনের পর দিন একটু একটু করে জমতে থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত ঋতুর পরিবর্তন ঘটে; শীতকাল কেটে গিয়ে আসে গ্রীষ্মকাল। তেমনি দিনের চেয়ে রাত যদি বড়ো হয় তাহলে দিনের বেলার জমানো সমস্ত উত্তাপ রাত্রিবেলা পুরোপুরি খরচ হয়ে যাবার পরেও ঠাণ্ডার দিকে আরো খানিকটা টান পড়ে।

অর্থাৎ, ভূপৃষ্ঠ আরো খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এইভাবে দিনের পর দিন ঠাণ্ডা হয়ে যাবার মাত্রা ক্রমশ বেড়েই চলে। ফলে, শেষ পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল কেটে গিয়ে আসে শীতকাল।

জেনে রাখা ভালো যে ভূপৃষ্ঠে প্রধান ঋতু হচ্ছে দুটি—গ্রীষ্ম ও শীত। গ্রীষ্ম থেকে শীতে পরিবর্তন-কালটিকে বলা হয় শরৎ, শীত থেকে গ্রীষ্মে পরিবর্তন-কালকে বসন্ত। আমাদের দেশে এই চারটি ঋতু ছাড়াও আরো দুটি ঋতু আছে—বর্ষা ও হেমন্ত। এই দুটি ঋতু বিশেষ বায়ুপ্রবাহের ফল—দিন বড়ো-ছোট হওয়ার সঙ্গে এই দুটি ঋতুর কোনো সম্পর্ক নেই।

সুতরাং ঋতু-পরিবর্তনের মূল কারণটি বুঝতে হলে দিন বড়ো-ছোট হবার কারণটিকে বোঝা দরকার।

পৃথিবী যে বিশেষ পথে সূর্যের চারিদিকে ঘোরে সেই পথটির নাম পৃথিবীর কক্ষ। এই কক্ষটি উপবৃত্তাকার। সূর্য আছে এই উপবৃত্তের একটি ফোকসে। নিচের ছবির দিকে তাকালে সূর্যের অবস্থান ও পৃথিবীর চক্রগতি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হবে। ছবিতে সূর্যের তুলনায় পৃথিবীকে অনেক বড়ো-আকারে দেখানো হয়েছে—সেটা বক্তব্য বোঝাবার সুবিধের জন্যে।



ছবির দিকে তাকালে আরেকটি ব্যাপার স্পষ্ট হবে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে একপাশে একটুখানি হেলে থেকে—পুরোপুরি খাড়া

অবস্থায় নয় বা পুরোপুরি শোয়া অবস্থায় নয়। কতখানি হেলে আছে তাও বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষ-সমতলের সঙ্গে ৬৬½° কোনাকুনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছবির দিকে তাকালে আরো বোঝা যাবে, পৃথিবী এভাবে একপাশে হেলে আছে বলেই কখনো পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কখনো দক্ষিণ গোলার্ধ। কোন্ গোলার্ধ কোন্ দিনে কতখানি সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে তাও ছবিতে দেখানো হয়েছে। পৃথিবী এভাবে একদিকে হেলে আছে বলেই সারা বছরে দিন-রাত্রির এত তারতম্য।

পাশের ছবিতে বছরের চারটি বিশেষ দিনে কক্ষপথে পৃথিবীর বিশেষ অবস্থানকে দেখানো হয়েছে। ২১শে জুন তারিখে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে পড়ে। সেই অনুপাতে দক্ষিণ গোলার্ধ খানিকটা দূরে সরে যায়। ছবিতে পৃথিবীর যে অংশে দিন সে অংশ সাদা, যে অংশে রাত্রি সে অংশ কালো। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিষুবরেখার অর্ধেক রয়েছে সাদা অংশে, অর্ধেক কালোয়; অর্থাৎ বিষুব-অঞ্চলে দিন-রাত্রি সমান। কিন্তু বিষুবরেখা থেকে যতোই উত্তরদিকে যাওয়া যাবে ততই এক একটি অক্ষরেখায় বেশি-বেশি অংশ সাদার দিকে চলে আসছে, কম-কম অংশ কালোর দিকে। অর্থাৎ, বিষুবরেখার উত্তরে দিন বড়ো, রাত ছোট। এবং মাত্রাটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। যে-জায়গা বিষুবরেখা থেকে যতো বেশি উত্তরে সেখানে দিন ততো বড়ো, রাত ততো ছোট। ব্যাপারটা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত মেরু-অঞ্চলে এমন একটা এলাকা পাওয়া যাচ্ছে সেখানে রাত বলে কিছু নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই দিন।

ঠিক এর উল্‌টো ব্যাপারটি ঘটে দক্ষিণ গোলার্ধে। বিষুবরেখা থেকে যতোই দক্ষিণ দিকে যাওয়া যাবে ততোই রাত বাড়ে, দিন ছোট হয়ে যায়। ব্যাপারটা চলতে চলতে শেষ পর্যন্ত মেরু-অঞ্চলের একটা বিশেষ এলাকায় দিন বলে কিছুই নেই, চব্বিশ ঘণ্টাই রাত।

২১শে মার্চ ও ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে পৃথিবীর অবস্থান দেখলে

বোঝা যাবে, পৃথিবী হেলে রয়েছে একপাশে—সূর্যের দিকে নয়; ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দুই গোলার্ধেরই দূরত্ব সমান থেকে যায়। এই দুই তারিখে পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান।

আর ছবি দেখেই বোঝা যাবে, ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড়ো, রাত ছোট; উত্তর গোলার্ধে রাত বড়ো, দিন ছোট; দক্ষিণ মেরু-অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টাই দিন, উত্তর মেরু-অঞ্চলে চব্বিশ ঘণ্টাই রাত।

তাহলে মোট কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই:

২১শে মার্চ তারিখে দুই গোলার্ধেই দিন-রাত্রি সমান। তারপর থেকে উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো ও রাত ছোট হয়ে চলে। ২১শে জুন তারিখে উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো দিন, সবচেয়ে ছোট রাত, দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড়ো রাত, সবচেয়ে ছোট দিন।

২১শে মার্চ তারিখের পর থেকে উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো হয়ে চলে—কারণ, এই সময়ে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে একটু একটু করে ঝুঁকে পড়ছে। আমরা কিন্তু এই ঝুঁকে পড়াটা টের পাই না; আমাদের মনে হয় সূর্য যেন একটু একটু করে সরে আসছে উত্তর দিকে। অর্থাৎ ২১শে মার্চ তারিখে সূর্য ওঠে ঠিক পুবদিকে, তারপরেই শুরু হয় সূর্যের উত্তরায়ণ।

সূর্য কতটা উত্তরে সরে আসবে সেই মাপটাও অনায়াসেই জেনে নেওয়া যায়। আমরা জানি, পৃথিবীর মেরুরেখা কক্ষ-সমতলের ওপরে ৬৬½° কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে। মেরুরেখাটি যদি খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে এই কোণটি হত ৯০°। নব্বুই থেকে সাড়ে ছেষট্টি বাদ দিলে পাওয়া যায় সাড়ে তেইশ। অর্থাৎ ২১শে জুন তারিখে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ২৩½° ডিগ্রী ঝুঁকে পড়বে। কিন্তু আমরা তা টের পাব না; আমাদের মনে হবে, সূর্য যেন ২৩½° উত্তরে সরে গেছে।

২১শে জুন তারিখের পরেই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ পিছিয়ে আসতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ ঝুঁকে পড়ে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে

আবার পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই দিন-রাত্রি সমান এবং সূর্য ওঠে ঠিক পুব দিকে। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে সূর্য ২৩½° দক্ষিণে সরে গেছে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড়ো, রাত সবচেয়ে ছোট।

২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত উত্তরমেরুতে একটানা রাত্রি এবং দক্ষিণমেরুতে একটানা দিন। ২১শে মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উত্তরমেরুতে একটানা দিন এবং দক্ষিণ মেরুতে একটানা রাত্রি।

২১শে মার্চ থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত উত্তর গোলার্ধে দিন বড়ো হয়ে চলে। এই সময়ে সেখানে গ্রীষ্মকাল। ২১শে জুন তারিখের পরেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত দিন বড়ো, রাত ছোট—সুতরাং গ্রীষ্মের গরম চলতে থাকে। ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে দিন-রাত্রি সমান। এই সময়টি শরৎকাল। ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দিন সবচেয়ে ছোট, রাত সবচেয়ে বড়ো; অর্থাৎ পুরোপুরি শীতকাল। তারপরেও অনেকদিন পর্যন্ত দিন ছোট থেকে যায়, অর্থাৎ শীতের জের চলে। দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতু-পরিবর্তন ঠিক এর বিপরীত।

ছবির দিকে তাকালে অন্য একটি ব্যাপারও বোঝা যাবে। উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল, তখন পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে। এই সময়ে কক্ষপথে পৃথিবীর বেগও সবচেয়ে কম। অর্থাৎ, কক্ষপথের এই অর্ধাংশ পার হতে পৃথিবীর বেশি সময় লাগে। কিন্তু উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল, তখন পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে। এই সময়ে কক্ষপথে পৃথিবীর বেগও সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ, কক্ষপথের এই অর্ধাংশ পার হতে পৃথিবীর কম সময় লাগে। পৃথিবীর বেগে এই তারতম্য ঘটে বলেই উত্তর গোলার্ধের গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণ গোলার্ধের শীত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। এবং পৃথিবী সূর্য থেকে কখনো দূরে কখনো কাছে থাকে বলে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকালের ঠাণ্ডা ও গ্রীষ্মকালের গরম—দুটোই বেশি।

তাপমণ্ডল

ভূপৃষ্ঠের কোথাও তাপ বেশি, কোথাও তাপ কম। বেশি-তাপের অঞ্চলে সূর্যকিরণ খাড়াভাবে এসে পড়ে, কম-তাপের অঞ্চলে ট্যারা-ভাবে।

আমরা আলোচনা করেছি, সূর্যের উত্তরায়ণের সীমানা বিষুবরেখা থেকে সাড়ে-তেইশ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখা পর্যন্ত, দক্ষিণায়নের সীমানা বিষুবরেখা থেকে সাড়ে-তেইশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই অক্ষরেখার মধ্যবর্তী এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে উষ্ণমণ্ডল। উষ্ণমণ্ডলের সর্বত্রই কোনো না কোনো সময়ে সূর্য থাকে ঠিক মাথার ওপরে এবং কোনো সময়েই সূর্যের অবনতি সাত-চল্লিশ ডিগ্রির বেশি হতে পারে না।

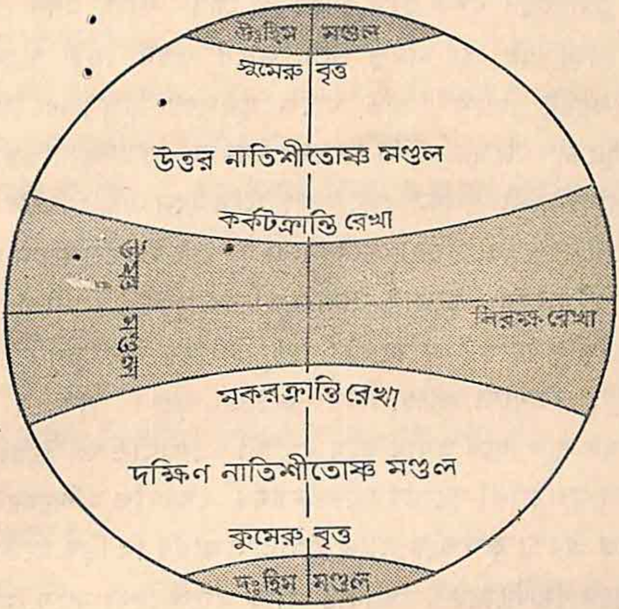
উষ্ণমণ্ডলের উত্তরদিকের সীমানাসূচক অক্ষরেখাটির নাম কর্কটক্রান্তি রেখা ; দক্ষিণদিকের সীমানাসূচক অক্ষরেখাটির নাম মকরক্রান্তি রেখা।

মেরুবিন্দুকে কেন্দ্র করে সাড়ে-তেইশ ডিগ্রি ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকলে যে এলাকাটি পাওয়া যায় তার নাম হিমমণ্ডল। উত্তর-মেরুর দিকে উত্তর হিমমণ্ডল, দক্ষিণমেরুর দিকে দক্ষিণ হিমমণ্ডল। এই এলাকায় সূর্য কোনো সময়েই সাড়ে-তেইশ ডিগ্রির ওপরে ওঠে না এবং দিন-রাত্রির কোনো বাঁধাধরা যাতায়াত নেই ; একটানা অনেকগুলো দিনের পরে একটানা অনেকগুলো রাত্রি ; বিশেষ করে মেরুবিন্দুতে ছ-মাস দিন, ছ-মাস রাত্রি।

হিমমণ্ডল ও উষ্ণমণ্ডলের মাঝখানের এলাকার নাম নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। এই মণ্ডলের উষ্ণমণ্ডলের দিকের সীমানায় রয়েছে সাড়ে-তেইশ ডিগ্রি অক্ষরেখা এবং হিমমণ্ডলের দিকের সীমানায় রয়েছে সাড়ে-ছেষট্টি ডিগ্রি অক্ষরেক্ষা। এই মণ্ডলে দিন-রাত্রির আসা-যাওয়াটা ঠিক থাকে। তবে সূর্য কোনো সময়েই একেবারে মাথার ওপরে উঠে আসে না।

এই হচ্চে ভূপৃষ্ঠের পাঁচটি তাপ-মণ্ডল। সূর্যের তাপ পৃথিবীর কোন্

অঞ্চলকে কতখানি উত্তপ্ত করছে তারই ওপরে ভিত্তি করে এক-একটি মণ্ডলের সীমানা।



হিমবাহ

পর্বতের চুড়োয় সব সময়ে বরফ জমে থাকে কেন? এমন কি উষ্ণ মণ্ডলের পর্বতের চুড়োতেও? সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হতে পারে, ভূপৃষ্ঠ থেকে যতো ওপরের দিকে ওঠা যাবে ততোই তাপ বেশি। কারণ, আমরা আলোচনা করেছি, তাপটা নির্ভর করে সূর্যকিরণের ওপরে; এবং সূর্যকিরণ সবার আগে এসে পৌঁছয় বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরে। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের চেয়ে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের তাপ বেশি হওয়া উচিত। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হয় ঠিক উল্টো। ভূপৃষ্ঠের চেয়ে বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরের তাপ অনেক-অনেক কম। কারণ, বায়ুমণ্ডলের ওপরের স্তরটির তাপ ধরে রাখবার ক্ষমতা নেই। প্রথমত এই স্তরটি খুবই পাতলা; দ্বিতীয়ত, এই স্তরে ধুলো বা জলীয় বাষ্প নেই; তৃতীয়ত, ভূপৃষ্ঠ সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে উঠে যে তাপ বিকিরণ করে তা এত উঁচুতে পৌঁছয় না।

এ সমস্ত কারণে এই স্তরটি যেমন পারে না উত্তপ্ত হতে, তেমনি পারে না উত্তাপকে ধরে রাখতে। কাজেই এই স্তরটি খুবই ঠাণ্ডা—এত ঠাণ্ডা যে জল জমে বরফ হয়ে যেতে পারে। ফলে, যখন কোনো পর্বতের চুড়ো এই স্তর পর্যন্ত উঠে আসে তখন সেই চুড়োটিকে আশ্রয় করেই জমে উঠতে থাকে তুষারের স্তূপ। এজন্যে উঁচু পর্বতের চুড়ো মাত্রেই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—শুভ্রতুষারকিরীটিনী। শুভ্রতুষারকিরীটিনী—পর্বত বলতে আমাদের মনে এই ছবিটিই সবার আগে ভেসে ওঠে। হিমালয়কে যাঁরা দূর থেকেও দেখেছেন তাঁরাই জানেন, হিমালয়ের চুড়োয় সাদা তুষারের মুকুটটি হিমালয়কে কী অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। শুধু হিমালয় নয়, ভূপৃষ্ঠে যেখানে যতো উঁচু পর্বতমালা আছে, সর্বত্রই এই এক দৃশ্য। পর্বতের চুড়োয় সারা বছর পুরু হয়ে তুষার জমে থাকে। কোথাও তা ইটের মতো শক্ত, কোথাও পেঁজা তুলোর মতো নরম। কোথাও মন্দিরের চুড়োর মতো মস্ত একটা স্তূপ হয়ে আছে, কোথাও স্বর্গের সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে শূন্যে মিলিয়েছে। আবার মাঝে মাঝে দেখা যাবে, মস্ত এক তুষারস্তূপ গড়াতে-গড়াতে লাফাতে-লাফাতে তুষার-ঝড় উঠিয়ে বজ্র-পাতের মতো নেমে আসে। কখনো বা তুষার-নদী বয়ে চলে উপুড়-করা ড্রাম থেকে পীচ গড়িয়ে পড়ার মতো দুর্নিরীক্ষ্য প্রবাহে।
এই চলমান তুষারস্তূপকেই বলা হয় হিমবাহ।
মেরু-অঞ্চলে সারা বছরই পুরু হয়ে বরফ জমে থাকে। কোথাও কোথাও বরফের এই আস্তর দু-মাইল গভীর।
কি সমুদ্র, কি মহাদেশ—ভূপৃষ্ঠের বহু অঞ্চল আজও সারা বছর বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে মুখ লুকিয়ে আছে।
আর মাঝে মাঝে পর্বতের চুড়ো থেকে মস্ত একটি হিমবাহ নেমে আসে সমুদ্রের জলে। ন-ভাগের আটভাগ ডুবে যায় জলের মধ্যে, মাত্র একভাগ জেগে থাকে—আর তখন এর নাম হয় হিমশৈল।
হিমবাহ যে-পথ দিয়ে নেমে আসে সে-পথে বিশেষ কিছু ফেলে রাখে না। মস্ত মস্ত শিলাখণ্ডকে পর্যন্ত অনায়াসেই আত্মসাৎ করে নেয় এবং

টানতে টানতে নিয়ে চলে। তাছাড়া মাটির ওপর দিয়ে গা ঘষে ঘষে চলবার সময় এমন সব আঁচড়ের দাগ রেখে যায় যা সহজে মিলিয়ে যাবার নয়। এজন্যেই শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকটিতে হিমবাহের যাতায়াতের দাগ খুঁজে পাওয়া যায়।

আর এই হিমবাহের দাগ খুঁজতে গিয়েই ভূ-বিজ্ঞানীরা এক চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা বলেন, ভূপৃষ্ঠে পর্যায়ক্রমে কয়েকটি হিমযুগ পার হয়েছে। এক-একটি হিমযুগে ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত অঞ্চল বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে মুখ লুকিয়েছিল। আবার হিমযুগ পার হয়ে যাবার পরে বরফের চাদর সরে গেছে এবং বেশ কিছুকালের জন্যে এসেছে উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ু।

কেন এমনটি হবে?

বিষয়টিকে আরো বিস্তারিতভাবে জানবার চেষ্টা করা যাক।

অতীতের জলবায়ু

উত্তর আমেরিকা ও উত্তর ইওরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে মৃত্তিকার স্তরে স্তরে হিমবাহের যাতায়াতের সুস্পষ্ট দাগ পাওয়া যায়। ভূ-বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, এককালে আল্পস পর্বতমালার হিমবাহ সুইজারল্যাণ্ডকে ঢেকে ফেলেছিল। শুধু তাই নয়, উত্তর জার্মানি, উত্তর ফ্রান্স এবং ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ঢাকা পড়েছিল স্কাণ্ডিনেভিয়ার উচ্চ পার্বত্য-ভূমির হিমবাহে। তেমনি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্ধাংশ ঢাকা পড়েছিল কানাডার উচ্চ পার্বত্যভূমির হিমবাহে।

কিন্তু সে-যুগের অন্য একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে হিমবাহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। শুধু এশিয়ার উত্তরাঞ্চলে নয়, যেখানে ধার-কাছে কোনো পর্বত বা উচ্চভূমি ছিল না সেখানে হিমবাহের কোনো সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি।

সুতরাং এ-থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে হিমবাহের সঙ্গে উচ্চ পর্বতমালার সরাসরি সম্পর্ক আছে।

শিলালিপির পৃষ্ঠায় হিমবাহের দাগ খুঁজতে গিয়ে ভূ-বিজ্ঞানীরা

আরো জানতে পেরেছেন যে সাম্প্রতিক কালে অন্তত আরো চারবার ভূপৃষ্ঠে হিমবাহের আধিপত্য ছিল। এবং প্রত্যেকবারেই হিমবাহের আধিপত্য কেটে যাবার পরে ফিরে এসেছে উষ্ণ জলবায়ু।

ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, ভূপৃষ্ঠে হিমবাহের শেষ আধিপত্য এসেছিল আজ থেকে পঁচিশ হাজার বছর আগে। বর্তমান কালটি হচ্ছে হিমবাহের অপসরণের যুগ। এখনো পুরোপুরি অপসারিত হয়নি। আশা করা চলে, আরো কিছুকাল পরে উত্তর আমেরিকা, ইওরোপ ও এশিয়ার জলবায়ু উষ্ণতর হয়ে উঠবে এবং তখন হিমবাহের প্রায় কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। পরবর্তী হিমযুগ আসবে আরো অনেক পরে।

ভূপৃষ্ঠে এমনি বারে বারে হিমযুগ আর উষ্ণযুগ ফিরে এসেছে। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে শিলালিপির পৃষ্ঠায়। হিমযুগের প্রমাণ পাওয়া যায় হিমবাহের যাতায়াতের দাগে আর উষ্ণযুগের প্রমাণ জীবজন্তু-গাছপালার ফসিলে।

শিলালিপির ইতিহাস-পুস্তকের কয়েক লক্ষ পৃষ্ঠা পর-পর উল্টিয়ে গেলে দেখা যাবে, ভূপৃষ্ঠে হিমযুগের চেয়ে উষ্ণযুগের আধিপত্যটাই যেন অনেক বেশি সময়ের। অতীত যুগের যে-সব ফসিল পাওয়া গেছে, তা থেকে নিশ্চিতভাবেই বলা চলে, ইওরোপ ও আমেরিকার মতো শীতপ্রধান দেশেও অতীতের অধিকাংশ সময়ে উষ্ণমণ্ডলীয় জীব ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব ছিল।

একটানা উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর মধ্যে হিমযুগ এসেছে এক-একটা ছেদচিহ্নের মতো। যেন একটা বিরতি—বরফের চাদর মুড়ি দিয়ে ভূপৃষ্ঠের নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকা।

শিলালিপির পৃষ্ঠা থেকে আরো জানা যায় যে ভূপৃষ্ঠের এক-একটি বিপ্লবের পরের যুগে হিমবাহের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। আমরা জানি, এক-একটি বিপ্লবের পরে সমতল ভূপৃষ্ঠে তৈরি হয়েছিল আকাশ-ছোঁয়া পর্বতমালা। সুতরাং অনুমান করা চলে, সে-সময়ে পর্বতের চুড়োকে আশ্রয় করে তুষারস্তূপ অনায়াসেই আধিপত্য

বিস্তার করতে পেরেছিল।

তারপর যতোকাল পর্বতের চুড়ো আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, ততোকাল তুষারস্তূপ নিশ্চিহ্ন হয়নি। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এসেছে এক-একটি হিমযুগ। তখন পর্বতের চুড়ো থেকে মস্ত মস্ত হিমবাহ নেমে এসেছে সমতল ভূমিতে। ইতিমধ্যে ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত পর্বত মুছে গেছে, দীর্ঘকালের জন্যে ভূপৃষ্ঠ হয়ে উঠেছে সমতল; তখনো কিন্তু পর্যায়ক্রমে এসেছে হিমযুগ, যদিও তার আধিপত্য তেমন তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে হিমযুগ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, হিমযুগের আধিপত্য কোনো সময়ে বেশি, কোনো সময়ে কম। বিপ্লবের ঠিক পরেই যখন ভূপৃষ্ঠে নতুন করে পর্বত তৈরি হয় তখন এমনিতেই পর্বতের চুড়োগুলোকে আশ্রয় করে জমে ওঠে পুরু তুষারস্তূপ। কাজেই সে-সময়ে যদি হিমযুগ আসে তবে সেই পুরু-হয়ে-জমে-থাকা তুষার আরো পুরু হয়ে মস্ত এক-একটি হিমবাহের রূপ নেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে ভূপৃষ্ঠের তুই বিপ্লবের মধ্যবর্তী সময়ে হিমযুগ একবারই আসে না। একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বারবার ফিরে আসে। যতোদিন ভূপৃষ্ঠে পর্বত থাকে ততোদিন এই ব্যাপারটা চলতে থাকে। ভূপৃষ্ঠ সমতল হয়ে যাবার পরেও নিশ্চয়ই হিমযুগ আসে, কিন্তু উঁচু নিচু জায়গা নেই বলে হিমবাহ তৈরি হতে পারে না; কাজেই সে-সব হিমযুগের বিশেষ কোনো সাক্ষ্যও থাকে না।

তাহলে ধরে নিতে পারা যায়, ভূপৃষ্ঠে হিমযুগের আবির্ভাবের সঙ্গে ভূত্বকের বিন্যাসগত পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই। হিমযুগের আবির্ভাবের কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র।

বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। আমরা এখানে একটি মাত্র ব্যাখ্যার উল্লেখ করব। মনে হয়, এই ব্যাখ্যাটিই সবচেয়ে যুক্তিসহ।

আমরা জানি, পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষ-সমতলের ওপরে কোনাকুনি রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে ঋতু-পরিবর্তন সম্ভব। এও আমরা দেখেছি,

উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল—তখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি। আবার, উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল—তখন সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম। পৃথিবী সূর্য থেকে যতো দূরে থাকবে ততোই সূর্যের তাপ যাবে কমে। এই কারণে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের গরম অপেক্ষাকৃত কম এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকালের ঠাণ্ডা অপেক্ষাকৃত বেশি।

এবার দেখা যাক, দুই গোলার্ধে শীত-গ্রীষ্মে উত্তাপের এই কম-বেশি হওয়াটা তুষারপাতের ব্যাপারে কিছু সাহায্য করে কিনা। এদিক্ থেকে শীতকালে যতো শীতই পড়ুক না কেন তাতে আমাদের বিশেষ কিছু লাভ নেই। শীতকালের শীত হিমাঙ্কে নেমে আসাটাই তুষারপাতের পক্ষে যথেষ্ট। সেই অবস্থাতেই বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জলীয় বাষ্প তুষার হয়ে ঝরে পড়ে। সুতরাং, শীতের মাত্রা হিমাঙ্কেরও কতটা নিচে নেমেছে তা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে।

কিন্তু গ্রীষ্মকালের গরম কতটা কম-গরম তার ওপরে নির্ভর করে শীতকালের তুষার স্থায়ী হবে কিনা। কম-গরমে শীতকালের সমস্ত তুষার গলে যেতে পারে না, কিছুটা থেকে যায়। বছরের পর বছর এইভাবে জমতে জমতে কিছুকালের মধ্যেই বিপুল এক তুষারস্তূপ জমে ওঠে।

বর্তমানে উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকালের গরম যতোখানি কম-গরম তা তুষার জমে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট নয়; হিসেব করে দেখা গেছে, আর সামান্য একটু কম-গরম হলেই জমে উঠতে পারত। আগেই বলেছি, ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, বর্তমান যুগটি হচ্ছে হিমযুগ পার হয়ে যাবার যুগ। কাজেই উত্তাপের হিসেব থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাচ্ছে, বাস্তব অবস্থার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়।

তাহলে হিমযুগের আবির্ভাব হবে কোন্ সময়ে?

বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর মেরুরেখাটি চিরকাল একই অবস্থায় থাকে না। সেটি খুব আস্তে আস্তে জায়গা বদলাচ্ছে। লাট্টু ঘুরতে

ঘুরতে যদি হেলে পড়ে তাহলে যেমন লাট্টুর শলাকাটি পাক খেতে খেতেও বিশেষ আকৃতির একটি সীমানার মধ্যে ঘুরতে থাকে—পৃথিবীর মেরুরেখাটিও তেমনি ঘুরছে। পুরো একপাক ঘুরতে সময় নেয় ২৬,০০০ বছর। তার মানে, প্রতি ১৩,০০০ বছর পরে পরে কক্ষপথের একই অবস্থানে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৮০ পৃষ্ঠায় যে ছবিটি আছে সেই ছবিতে ২১শে ডিসেম্বর তারিখে দেখা যায়, পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে। ১৩,০০০ বছর পরে এই ২১শে ডিসেম্বর তারিখেই পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকবে। সহজেই অনুমান করা চলে, দুই গোলার্ধের এমন ওলোট-পালোট হয়ে যাবার ফলে শীত-গ্রীষ্মে উত্তাপের কম-বেশিতেও ওলোট-পালোট হবে।

এ ছাড়াও আরো কতগুলো ব্যাপার আছে।

পৃথিবীর মেরুরেখাটি শুধু যে জায়গা বদলায় তা নয়, কোনাকুনি অবস্থানও বদলায়। আগে বলেছি, পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষ-সমতলের ওপরে সাড়ে-ছেষট্টি ডিগ্রি কোনাকুনি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এই কোণটি সব সময়ে সাড়ে-ছেষট্টি ডিগ্রি থাকে না। খুব আস্তে আস্তে ছোট-বড়ো হয় এবং ছোট-বড়োর একটি পালা শেষ হতে সময় লাগে ৪০,০০০ বছর। আমরা জানি, পৃথিবীর মেরু-রেখাটি কোনাকুনি আছে বলেই ভূপৃষ্ঠের ঋতু-পরিবর্তন। সুতরাং এই কোনাকুনি থাকার মাত্রা বদলে গেলে ঋতু-পরিবর্তনের তীব্রতাতেও হ্রাস-বৃদ্ধি হবে তা খুবই স্বাভাবিক।

ওদিকে পৃথিবীর কক্ষপথটিও যে সুবোধ বালকের মতো স্থির অচঞ্চল হয়ে আছে তা নয়। কক্ষপথের পরিবর্তন দু-ভাবে হয়। প্রথমত, গোটা কক্ষপথটি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। দ্বিতীয়ত; কক্ষপথটি এক-একবার হয়ে উঠছে প্রায়-গোল, এক-একবার বেশ খানিকটা চ্যাপ্টা। এ দুটো ব্যাপার একই সঙ্গে চলে এবং এক-একটি পালা শেষ হতে ৬০,০০০ থেকে ১,২০,০০০ বছর সময় লাগে। সহজেই

অনুমান করা চলে, কক্ষপথের এমনি অদলবদল হবার ফলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব বাড়ে-কমে এবং শীত-গ্রীষ্মে উত্তাপের কম-বেশির মাপ পাল্টে যায়।

এসব কাণ্ডকারখানার বিশেষ কোনো একটির জন্যে ভূপৃষ্ঠে হিমযুগ তৈরি হবার মতো অবস্থা আসে না। কিন্তু সবকটি কাণ্ডকারখানার ঝোঁক যদি একই দিকে এসে যায়—তাহলে হিমযুগ তৈরি হবার মতো অবস্থা হতে কোনো বাধা নেই।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে এক-লক্ষ বছরেরও কম সময় পরে পরে ভূপৃষ্ঠে এমনি এক-একটি হিমযুগের অবস্থা তৈরি হয়ে চলেছে। যে বিশেষ হিমযুগটি ভূপৃষ্ঠের বিশেষ কোনো বিপ্লবের (অর্থাৎ পর্বত তৈরি হওয়ার) ঠিক পরেই আসে সেই হিমযুগটি বড়ো রকমের সাক্ষ্য রেখে যায়। যে হিমযুগ ভূপৃষ্ঠের সমতল অবস্থায় আসে তার বিশেষ কোনো সাক্ষ্য থাকে না।

আমরা বাস করছি এমন এক যুগে যখন একটি হিমযুগ সদ্য পার হয়েছে। মাত্র ৩০,০০০ বছর আগেও এই ভূপৃষ্ঠের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হিমবাহের নিচে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। সেই হিমবাহ সরে গেছে তারপরে। কিন্তু আগামী সত্তর হাজার বছরের মধ্যেই আবার একটি হিমযুগ আসবে, আবার হিমবাহ নেমে আসবে পর্বতের চুড়ো থেকে। ভূপৃষ্ঠে যতোদিন পর্বতের চুড়ো থাকবে, ততোদিন চলতে থাকবে হিমবাহের এই যাতায়াত। তারপর ভাঙন ও ক্ষয়ের স্বাভাবিক নিয়মে কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই সমতল হয়ে উঠবে ভূপৃষ্ঠ। তখনো কিন্তু হিমযুগের চক্রাবর্তন চলবে কিন্তু শুভ্রতুষার-কিরীটিনী পর্বতচুড়ো নেই বলে হিমবাহ তৈরি হবার মতো অবস্থা থাকবে না। তখন এক-একটি হিমযুগে ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ কয়েক ডিগ্রি কমে যাবে মাত্র। ভূপৃষ্ঠে আবার হিমবাহের আবির্ভাব ঘটবে নতুন এক বিপ্লবের পরে—যখন সমতল ভূপৃষ্ঠ আবার আকীর্ণ হবে সারি সারি পর্বতমালায়।



প্রাণের ইতিবৃত্ত

জীবপালিনী আমাদের পুষেছ
তোমার খণ্ডকালের ছোটো ছোটো পিঞ্জরে,
তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
সব কীর্তির অবসান।

প্রাণের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীর উপরিতল অপেক্ষাকৃত শীতল হয়ে ভূত্বক তৈরি হয়েছে। বা, আরো স্পষ্টভাবে বলা চলে, ভূপৃষ্ঠে প্রথম যেদিন বৃষ্টি ঝরে পড়েছিল—সেদিনই তৈরি হয়েছিল প্রাণের অস্তিত্ব থাকার মতো বাস্তব অবস্থা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, প্রাণের জন্ম হয়েছিল পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে। আমরা জানি, ফুটন্ত জলের উত্তাপে জীবাণু পর্যন্ত মরে যায়। সুতরাং যখন ভূপৃষ্ঠে সমুদ্র তৈরি হয়নি, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ ফুটন্ত জলের কাছাকাছি তো বটেই বরং তার চেয়ে বেশি, এবং পৃথিবীর সমস্ত জল বাষ্প হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে--সে-অবস্থা কিছুতেই প্রাণধারণের উপযোগী নয়। ভূপৃষ্ঠের উত্তাপ যখন আরো অনেক কমেছে, যখন পৃথিবীর সমস্ত বাষ্প জল হয়ে ঝরে পড়েছে, যখন তৈরি হয়েছে পৃথিবীর আদিম সমুদ্র—তখনই, একমাত্র তখনই, প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব। পৃথিবীর আদিম সমুদ্রই হচ্ছে প্রাণের জননী ও ধাত্রী।

তাহলে প্রশ্ন ওঠে, প্রাণের জন্ম কখন এবং কী ভাবে? ঠিক কবে—কোন্ তারিখে—প্রাণের জন্ম হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। পঞ্চাশ কোটি বছর আছে পুরাজীবীয় যুগের শুরুতেও দেখা যাচ্ছে,

প্রাণের ধারা নানা বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। সুতরাং, অনুমান করা চলে, পুরাজীবীয় যুগের বহু আগে থেকেই প্রাণের ধারাটি প্রবাহিত হয়ে এসেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে, জীবজগতের আদি রূপটির সন্ধান পেতে হলে আজ থেকে অন্তত দেড়শো কোটি বছর আগেকার সময়ে হাজির হতে হবে। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, ভূপৃষ্ঠের সেই আদিম সমুদ্রে, জেলির মতো তুলতুলে নরম এক ধরনের আদিম জীব কোটি কোটি বছর ধরে আদিম অন্ধ জীবনযাপন করেছে। তাদের শরীরে হাড়ের চিহ্নমাত্র ছিল না : সুতরাং শিলালিপির পৃষ্ঠায় ফসিলের অক্ষরে নিজেদের কোনো পরিচয়ই তা'রা রেখে যায়নি। তবে কোথাও কোথাও সেই আদিম জীবের দেহাবশেষ থেকে খনিজ পদার্থ তৈরি হয়েছে। তা থেকে তাদের অস্তিত্বের জানানিটুকু পাওয়া যায় মাত্র। আর কিছু নয়।

এবারে পরের প্রশ্ন—প্রাণের জন্ম কি-ভাবে ?

এ প্রশ্নের জবাবে ধর্মপুস্তকের ব্যাখ্যা আমরা অনায়াসে বাতিল করে দিতে পারি। যেমন, বাইবেলে বলা হয়েছে, আজকের দিনে যতো রকমের জীবকে আমরা এই পৃথিবীতে চলাফেরা করতে দেখি তাদের আদি জোড়াটি ঠিক আজকের মতো আকারেই সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তৈরি হয়েছিল। এই ব্যাখ্যা যে উদ্ভট তা জীববিজ্ঞান এত সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে যে গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীরাও তা মেনে নিয়েছেন।

আবার এখনো পর্যন্ত অনেকের ধারণা, পচা গোবরে বা পাঁকে আপনা থেকেই আচমকা জীবের আবির্ভাব ঘটে। যেমন, কীট-পতঙ্গের জন্ম পচা গোবরে ও পাঁকে, উকুনের জন্ম মানুষের ঘামে, ব্যাঙ-সাপ-ইঁদুর-কুমিরের জন্ম নদীর কাদায়, ইত্যাদি। এই ধারণা ভুল। আসল ঘটনা এই যে, পচা গোবরের বা নর্দমার পাঁকে বিশেষ বিশেষ ধরনের জীবাণু দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। অর্থাৎ পচা গোবর বা পাঁক হচ্ছে এসব জীবাণুর বাসা। কোথাও কিছু নেই, শূন্য থেকে আচমকা কতকগুলো কীট বা পোকামাকড়ের

আবির্ভাব ঘটে গেল—ব্যাপারটা তা নয়।

দুধ না ফুটিয়ে রেখে দিলে দুধ নষ্ট হয়ে যায় তা আমরা সবাই জানি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কিছুদিনের মধ্যেই সেই দুধে নানা ধরনের কীট থিক্ থিক্ করছে। এই কীটগুলো কোত্থেকে এল? বিখ্যাত বিজ্ঞানী পাস্তুর এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এই পৃথিবীর আকাশে-বাতাসে জলে-স্থলে অসংখ্য জীবাণু অদৃশ্যভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুধের মধ্যেও জীবাণু ছিল। দুধে পচন ধরানো এবং কীটের আবির্ভাব—এ সমস্তই জীবাণুর কীর্তি। পাস্তুর হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, দুধ ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিলে এবং জীবাণুমুক্ত দুধ কোনো জীবাণুমুক্ত বদ্ধ পাত্রে রেখে দিলে—সেই দুধে কোনোকালেই পচন ধরে না বা কীটের আবির্ভাব হয় না। আজকাল বাজারে 'পাস্তুরাইজ্‌ড্' দুধ কিনতে পাওয়া যায়; 'পাস্তুরাইজ্‌ড্' কথাটা এসেছে পাস্তুরের নাম থেকে, কথাটার অর্থ—বিশেষ প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, শূন্য থেকে আচমকা জীবের আবির্ভাব ঘটে—কথাটা ঠিক নয়। পচা গোবর বা পাঁক বা পচা মাংস-দুধ যে-সব জীবের বাসা হয়ে ওঠে—তাদের জন্ম জীব থেকেই।

জীব থেকেই জীবের জন্ম—কথাটা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জীবজগতের একটি সাধারণ লক্ষণ—বংশরক্ষা। পশুপাখি, গাছপালা—সর্বক্ষেত্রেই এই লক্ষণ পরিস্ফুট। কোনো বিশেষ জাতের জীব সেই বিশেষ জাতের সন্তানই প্রসব করে। মানুষের জন্ম মানুষ থেকে, পশুর জন্ম পশু থেকে, গাছপালার জন্ম গাছপালা থেকে। এ-ব্যাপারটি আমাদের চোখের সামনেই ঘটছে।

কিন্তু আমরা জানতে চাইছি, জীব-জগতের শুরু হয়েছিল কি ভাবে? কোন্ আশ্চর্য ঘটনার যোগাযোগে ভূপৃষ্ঠে প্রথম জীবের আবির্ভাব? উনিশ শতকের একটি ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা চলে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, গ্রহলোকে অনন্তকাল ধরে প্রাণের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অতি সূক্ষ্ম প্রাণকণা মহাশূন্য অতিক্রম করে যাতায়াত

করছে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে। যেমন উড়ন্ত বীজ একদেশের উদ্ভিদকে অন্য দেশে নিয়ে যায়, তেমনি মহাশূন্যে বিচরমান প্রাণকণা প্রাণের প্রবাহকে এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে নিয়ে চলেছে। যে গ্রহে যখন প্রাণধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয় সেখানেই সেই প্রাণকণাটি বিচিত্র ধারাপথে বিবর্তনের ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়ে চলে।

অনুমান করা হয়েছিল, এই প্রাণকণাটি মহাশূন্যে বিচরণকালে এত প্রচণ্ড বেগে ধাবিত হয় যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে, এমন কি এক নক্ষত্র থেকে অপর নক্ষত্রে, হাজির হতে পারে। মহাশূন্যে উত্তাপ খুবই কম এবং জলীয় বাষ্প একেবারেই নেই—সে-অবস্থায় প্রাণকণাটির পক্ষে বেঁচে থাকা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয়।

পরবর্তী কালে এই ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে গেছে। আমরা জানি, মহাশূন্যে রয়েছে প্রচণ্ড প্রাণঘাতী একটি রশ্মি—আল্ট্রা-ভায়োলেট রে। বায়ুমণ্ডলের ওজোন-পর্দাটি আছে বলে এই আল্ট্রা-ভায়োলেট রে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারে না, সুতরাং এই রশ্মির প্রচণ্ডতাও আমরা টের পাই না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাশূন্যে অবাধ আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির রাজ্যে কোনো প্রাণকণার পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং গ্রহে গ্রহান্তরে এক অনন্ত প্রাণধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে—কথাটা শুনতে যতোই ভালো লাগুক, বাস্তবে সম্ভব নয়।

আল্ট্রা-ভায়োলেট রশ্মির কথা ছেড়ে দিলেও এই ব্যাখ্যা বাতিল করার পক্ষে অন্য যুক্তি আছে। আমরা জানি, প্রত্যেক নক্ষত্রেরই একটা নির্দিষ্ট বয়স আছে। কোনো নক্ষত্রই অনন্তকালের নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, এককালে মহাবিশ্বে শুধু ছিল আদি একটি বস্তুপিণ্ড। যে কোনো কারণেই হোক, সেই আদি বস্তুপিণ্ড শতধা বিভক্ত হয়ে তৈরি হয়েছে কোটি কোটি বিশ্বলোক, যার ইংরেজি নাম গ্যালাক্সি, বাংলায় বলা চলে ছায়াপথ। আবার

প্রত্যেকটি ছায়াপথে তৈরি হয়েছে কোটি কোটি নক্ষত্র। আমাদের এই সূর্য এমনি এক বিশেষ ছায়াপথের নিতান্তই এক তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র মাত্র। তবে যে-নক্ষত্র যে-শ্রেণীরই হোক, তার এক বিশেষ জন্মক্ষণ আছে, বয়সের একটা বিশেষ মাপ আছে। কাজেই যদি বলা হয়, অনন্তকাল ধরে প্রাণধারা গ্রহে-গ্রহে নক্ষত্রে-নক্ষত্রে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—তবে কথাটার কোনো অর্থ হয় না।

নক্ষত্র যে-শ্রেণীরই হোক, সেখানে এত প্রচণ্ড উত্তাপ যে প্রাণের জন্ম কিছুতেই সম্ভব নয়। গ্রহের বেলাতেও বিচার করতে হবে, প্রাণধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়েছে কিনা। অর্থাৎ, উত্তাপ খুব বেশিও হবে না, কমও হবে না; তাছাড়া থাকবে জল এবং বাতাস। সৌরমণ্ডলের নটি গ্রহের মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে পৃথিবীতে এবং প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব মঙ্গলগ্রহে। বুধ ও শুক্র-গ্রহে উত্তাপ বেশি, বৃহস্পতি-শনি-ইউরেনাস-নেপচুন-প্লুটো গ্রহে উত্তাপ কম। তাছাড়া, এই সাতটি গ্রহের কোনো গ্রহেই জল নেই; বাতাস বলতে যা আছে তা বিষাক্ত (বুধগ্রহে বাতাসের ছিটেফোঁটাও নেই—সমস্ত শূন্যে উধাও হয়ে গেছে)। তবে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, কয়েক কোটি বছর পরে শুক্রগ্রহে হয়তো প্রাণ-ধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হতে পারে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, গ্রহের বিবর্তনের বিশেষ এক পর্যায়ে যখন নাকি প্রাণধারণের উপযোগী পরিবেশ তৈরি হয়, তখনই—একমাত্র তখনই—সেই গ্রহে প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব। তার আগে কিছুতেই নয়। এ অবস্থায়, প্রাণের ধারা অনন্তকাল ধরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—একথা নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা মাত্র।

আগেই বলেছি, পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের আদিম সমুদ্রে।

আবার আমাদের পুরনো প্রশ্নেই ফিরে আসতে হয়—কি ভাবে হয়েছিল? নিষ্প্রাণ বস্তুজগতে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ এসেছিল কোথা থেকে?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে প্রথমে জৈব পদার্থ সম্পর্কে কিছু খবর নেওয়া দরকার।

জৈব পদার্থ

উদ্ভিদ ও জীবদেহ যে পদার্থে তৈরি তাকে বলা হয় জৈব পদার্থ। জৈব পদার্থের সঙ্গে অজৈব পদার্থের প্রথম এবং প্রধান পার্থক্য এই যে, জৈব পদার্থের অণুর কেন্দ্রে সব সময়েই থাকে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু—কার্বন। রামকে বাদ দিয়ে যেমন রামায়ণ হয় না, তেমনি কার্বনকে বাদ দিলে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব নেই। যে কোনো জৈব পদার্থকে আগুনে পোড়ালে একথার প্রমাণ পাওয়া যাবে। জৈব পদার্থকে আংশিকভাবে পোড়ালে পাওয়া যায় অঙ্গার, পুরোপুরি পোড়ালে ছাই। কিন্তু এক টুকরো পাথর বা এক টুকরো কাঁচ বা এক টুকরো ধাতুকে যতোই পোড়ানো যাক না কেন, কিছুতেই অঙ্গার পাওয়া যাবে না।

অর্থাৎ জৈব পদার্থের বৈশিষ্ট্যসূচক উপাদান হচ্ছে কার্বন। এবং কার্বনের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে থাকে আরো কয়েকটি উপাদান। যেমন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন (জল বিশ্লেষণ করে এই দুটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়), নাইট্রোজেন (বাতাসে এই মৌলিক পদার্থটি প্রচুর পরিমাণে আছে), গন্ধক, ফস্ফরাস এবং আরো অনেক কিছু। এসব উপাদান নানা জটিল ভঙ্গিমায় কার্বনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে থাকে। অর্থাৎ কার্বন যেন বুড়ী ছোঁওয়ার খুঁটি। অন্যান্য উপাদান সেই খুঁটিকে নানাভাবে আঁকড়ে ধরে। সবাই যে সরাসরি বুড়ী ছুঁয়ে দাঁড়াতে পারে তা নয়। হয়তো একজন বুড়ী ছোঁয়, সেই একজনকে ছুঁয়ে থাকে আরেকজন, তারপর হয়তো বা একই সঙ্গে আরো দু-তিনজন—এমনি ভাবে গড়ে ওঠে এক বিচিত্র বিন্যাস। বিজ্ঞানীরা ছবি এঁকে এঁকে দেখিয়েছেন, কোন্ জৈব পদার্থের বিন্যাস কী ধরনের। আমরা অতো বিস্তৃত বিবরণের মধ্যে যাব না। শুধু একটি কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে—যতো বিচিত্র এবং

জটিল বিন্যাসই হোক না, মাঝখানে খুঁটি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র মৌলিক পদার্থ—কার্বন।

কোনো কোনো জৈব পদার্থে নানা জাতের উপাদানের ভিড় নেই। শুধু আছে কার্বন ও হাইড্রোজেন। দুয়ে মিলে হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বনের বিন্যাস খুবই সরল। কোনো কোনো হাইড্রোকার্বনে এক-একটি কার্বন পরমাণুর হাত ধরে দাঁড়ায় চার-চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু; বা, দুটি কার্বন পরমাণু, দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু; বা, এমনি ধরনের কিছু। খনিজ তেল বা খনিজ তেল থেকে অন্য যা কিছু পাওয়া যায়—যেমন বেন্‌জিন, কেরোসিন ইত্যাদি—তা সবই হচ্ছে হাইড্রোকার্বনের মেশাল।

এবার তাহলে আরও গোড়ার প্রশ্নে যেতে হয়। আমাদের সামনে এতক্ষণ প্রশ্ন ছিল—প্রাণের জন্ম কী ভাবে? আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, প্রাণের জন্ম হতে হলে জৈব পদার্থের অস্তিত্ব থাকা দরকার। আবার জৈব পদার্থের গোড়ায় রয়েছে হাইড্রোকার্বন। কাজেই প্রশ্ন ওঠে, হাইড্রোকার্বনের উৎপত্তি কী ভাবে?

এ-প্রশ্নের জবাব ভালোভাবে বোঝা দরকার। আমরা জেনেছি যে কার্বন ছাড়া জৈব পদার্থ সম্ভব নয়। চারদিকে তাকিয়ে আমরা যে সব গাছপালা বা জীবজন্তুকে দেখি তাদের বেঁচে থাকতে হলে শরীরের পুষ্টি দরকার। আবার গাছপালা বা জীবজন্তুর শরীর মানেই জৈব পদার্থ। তার মানে, গাছপালা বা জীবজন্তুর শরীরের মধ্যে নিশ্চয় এমন একটা কিছু প্রক্রিয়া চলছে যার ফলে জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারে। আবার কার্বন ছাড়া কিছুতেই জৈব পদার্থ তৈরি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গাছপালা বা জীবজন্তুকে অনবরণত কার্বন সংগ্রহ করতেই হবে। তারা কী ভাবে কার্বন সংগ্রহ করে? আমরা জানি, গাছপালা কার্বন সংগ্রহ করে বাতাস থেকে। গাছের পাতার সবুজ অংশে ক্লোরোফিল নামে একটি পদার্থ আছে। এই ক্লোরোফিল এবং সূর্যের আলো—এ দুয়ের সাহায্যে গাছপালা কার্বন সংগ্রহ করে। তেমনি জীবজন্তু কার্বন সংগ্রহ করে শাকপাতা

থেকে বা অন্য জীবজন্তুর মাংস থেকে। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে কার্বন-আত্মীকরণ। এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই গাছপালা ও জীবজন্তু পুষ্ট হয়। অর্থাৎ এই বিশেষ প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত কার্বন শেষ পর্যন্ত রূপান্তরিত হয় জৈব পদার্থে। জৈব পদার্থ তৈরির এই বিশেষ প্রক্রিয়াটিকে আমরা বলব জৈব প্রক্রিয়া। ভূগর্ভে খনিজ তেল বা কয়লা ইত্যাদির আকারে যে-সব জৈব পদার্থের সন্ধান আমরা পাই তা সবই কার্বন-আত্মীকরণ প্রক্রিয়ার সাক্ষ্য। এক সময়ে যা ছিল মাটির ওপরকার অরণ্য, তাই মাটির তলায় চাপা পড়ে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লায়। এক সময়ে যা ছিল জীবদেহ, তাই মাটির তলায় চাপা পড়ে রূপান্তরিত হয়েছে খনিজ তেলে।

অর্থাৎ, পৃথিবীর যেখানে যতো জৈব পদার্থ আমরা দেখছি, তা সবই অন্য এক সময়ের উদ্ভিদ ও জীবজগতের অস্তিত্বেরই নিদর্শন।

কিন্তু আমাদের গোড়ার প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। আমরা জানতে চাইছি, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রথম কি-ভাবে জৈব পদার্থ তৈরি হয়েছিল। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পাচ্ছি, যেখানে যতো জৈব পদার্থ আছে সবই তৈরি হয়েছে কোনো না কোনো জৈব প্রক্রিয়া থেকে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এমন একটা সময় নিশ্চয়ই ছিল যখন উদ্ভিদ বা জীবের অস্তিত্ব ছিল না। তেমনি এক সময়ে নিশ্চয়ই জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াই জৈব পদার্থ তৈরি হয়েছিল। আমাদের প্রশ্ন —কি-ভাবে তৈরি হয়েছিল ?

অর্থাৎ, উদ্ভিদ ও জীবদেহ যে-বিশেষ জৈব প্রক্রিয়ায় আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করে, বা আপন আপন দেহে জৈব পদার্থ তৈরি করে—যে বিশেষ প্রক্রিয়ার নাম আমরা দিয়েছি কার্বন-আত্মীকরণ —তা ছাড়া অন্য উপায়েও জৈব পদার্থ তৈরি হওয়া সম্ভব। জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াও কি-ভাবে জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারে—তাই নিয়েই এখন আমাদের আলোচনা।

প্রথমে আমরা তাকাব নক্ষত্রলোকের দিকে।

উত্তাপের কম-বেশি হিসেবে নক্ষত্রকে নানা জাতে ভাগ করা হয়েছে। কোনো কোনো নক্ষত্রের উত্তাপ খুবই বেশি ; ২০,০০০° সে. থেকে ২৮,০০০° সে. পর্যন্ত। কোনো কোনো নক্ষত্রের উত্তাপ খুবই কম, হয়তো মাত্র ৪,০০০° সে. ; এবং এই দুই সীমানার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন উত্তাপের অজস্র নক্ষত্র। কিন্তু নক্ষত্রের উত্তাপ যতো বেশিই হোক বা যতো কমই হোক, কোনো নক্ষত্রের উত্তাপই এমন নয় যে সেখানে উদ্ভিদ বা জীবের অস্তিত্ব সম্ভব। স্পেক্‌ট্রোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের উপাদান বিশ্লেষণ করে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করা গেছে। খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রে কার্বন পরমাণু একেবারে ছাড়া ছাড়া ভাবে গা ভাসিয়ে বেড়ায়, অন্য কোনো পরমাণুর ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসে না। কিন্তু যে-সব নক্ষত্রের উত্তাপ ১২,০০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে দেখা যায় কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর নাগালের মধ্যে এসে গেছে এবং কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলে তৈরি হয়েছে হাইড্রোকার্বন। নক্ষত্রের উত্তাপ যতো কমে, হাইড্রোকার্বনের অস্তিত্বও ততো প্রকট হয়ে ওঠে।

আমাদের সূর্যের বাইরের দিকের উত্তাপ ৫,৮০০০° সে. থেকে ৬,৩০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে। এখানে দেখা যায়, কার্বনের সঙ্গে একাধিক মৌলিক পদার্থের মিলন ঘটেছে ; যেমন, কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেনের, কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেনের, এমন কি কার্বনের সঙ্গে কার্বনের।

আমাদের এই সৌরমণ্ডলের অন্যান্য গ্রহের দিকেও নজর দেওয়া যেতে পারে। বৃহস্পতি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রধানত পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া ও মিথেন। এ দুটি দু-জাতের হাইড্রোকার্বন। অন্যান্য জাতের হাইড্রোকার্বন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু বৃহস্পতি গ্রহের উত্তাপ এত কম যে সে-সব হাইড্রোকার্বনের পক্ষে তরল বা কঠিন অবস্থায় ছাড়া থাকা সম্ভব নয়।

কার্বনের এই বিচিত্র রূপান্তরের সবচেয়ে বড়ো নজির পাওয়া যায় উল্কাপিণ্ড থেকে। যে-সব উল্কাপিণ্ড শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মাটিতে

পৌঁছতে পেরেছে সেগুলোকে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই যে, উল্কাপিণ্ডের মধ্যে কোনো না কোনো আকারে কিছু পরিমাণ কার্বন সব সময়েই পাওয়া যায়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা, উল্কাপিণ্ডকে বিশ্লেষণ করে নির্ভুল প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গেও কার্বনের মিলন ঘটতে পারে। কার্বন ও হাইড্রোজেনের মিলনের ফলে যেমন হাইড্রোকার্বন; তেমনি কার্বন ও ধাতুর মিলনের ফলে কার্বাইড।

এইভাবে নক্ষত্র ও উল্কাপিণ্ডকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ পাওয়া গেল যে জীবের অস্তিত্ব ছাড়াও হাইড্রোকার্বনের অস্তিত্ব সম্ভব। অর্থাৎ, জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াও জৈব পদার্থ তৈরি হতে পারে।

অন্যত্র যা সম্ভব হয়েছে, পৃথিবীতেই বা তা কেন অসম্ভব হবে?

বিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে একমত যে উল্কাপিণ্ড যে-সব উপাদানে তৈরি, আমাদের পৃথিবীর অভ্যন্তরেও সেই একই ধরনের উপাদান। ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি নানা কারণে এই বস্তুপিণ্ড গলিত অবস্থায় পৃথিবীর মাটি ফুঁড়ে বাইরে চলে আসে। এক সময়ে যখন পৃথিবী আরো উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল তখন পৃথিবীর সমস্ত জল বাষ্পের আকারে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াত। সে সময়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের গলিত বস্তুপিণ্ড ছিটকে আছড়ে পড়ত ভাসমান বাষ্পের স্তূপে। বস্তুপিণ্ডের মধ্যে ছিল কার্বাইড আর বাষ্পে ছিল হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন। এবং এতগুলো পদার্থের হুটোপাটির মধ্যে থেকে কার্বাইডের কার্বন আর বাষ্পের হাইড্রোজেন হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এসেছিল। এভাবেই আমাদের এই পৃথিবীতে হাইড্রোকার্বনের জন্ম—জৈব পদার্থের আবির্ভাব।

হাইড্রোকার্বনের রূপান্তর

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে উদ্ভিদ ও জীবদেহে যে-সব জটিল জৈব পদার্থ আছে—যেমন, শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ, ইত্যাদি—সেগুলোকে পাওয়া সম্ভব একমাত্র উদ্ভিদ বা

জীবদেহ থেকেই, কৃত্রিম উপায়ে সেগুলোকে তৈরি করা সম্ভব নয়। কিন্তু শতাব্দী পার হবার আগে বিজ্ঞানীরা নিজেরাই প্রমাণ করলেন যে এ-ধারণা ভুল। আজকাল বহুপ্রকার জৈব পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হচ্ছে ; যেমন, নানা ধরনের শর্করা, গন্ধদ্রব্য, স্নেহপদার্থ, নীল, গাছপালার রং। এমন কি এককালে যা অসাধ্য বলে মনে করা হত, তাও সম্ভব হয়েছে। ভিটামিন, হর্মোন ও অ্যান্টি-বায়োটিক ওষুধ যে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা সম্ভব তা কিছুকাল আগেও কল্পনাতীত ছিল।

আগে আমরা আলোচনা করেছি, আমাদের এই পৃথিবীতে কি-ভাবে জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াই হাইড্রোকার্বন তৈরি হয়েছিল। আবার বিজ্ঞানীরা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন যে হাইড্রোকার্বন থেকে অজস্র জটিল জৈব পদার্থ তৈরি করা সম্ভব। বিজ্ঞানী যখন ল্যাবরে-টরিতে কৃত্রিম উপায়ে তা তৈরি করেন তখন প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করবার জন্যে নানা উপায়ের সাহায্য নেওয়া হয় ; যেমন, উত্তাপ ও চাপ বাড়ানো কমানো, অ্যাসিড ও অ্যাল্‌কেলির ব্যবহার, এমনি আরো অনেক কিছু। কিন্তু কোনো রকম কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য ছাড়া কি এই প্রক্রিয়া কার্যকর হতে পারে? বিজ্ঞানীরা হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখেছেন—তাও সম্ভব।

এককালে ধারণা ছিল, জীবদেহে যে-সব প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ তৈরি হয় তা অত্যন্ত জটিল। কিন্তু পরে জানা গেছে, জৈব পদার্থের গড়ন যতো জটিলই হোক না কেন, হাইড্রোকার্বনের রূপান্তরের প্রক্রিয়া-টির মধ্যে কিন্তু বিশেষ জটিলতা নেই। তিনটি সুস্পষ্ট ধাপে এই প্রক্রিয়াটি কার্যকর হয়। এমন কি, কোন্ ধাপের পর কোন্ ধাপ আসবে তারও একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে।

জীবদেহে যেভাবেই জৈব পদার্থ তৈরি হোক না কেন, সবেরই মূলে আছে এই তিন-ধাপের প্রক্রিয়া।

আবার বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়ায় একটির সঙ্গে অপরটির যতো অমিলই থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে পুরোপুরি মিল। জলের

উপাদান প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় সরাসরি ভূমিকা গ্রহণ করে। কোথাও জলের উপাদান যুক্ত হয়, কোথাও জলের উপাদান বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ জল এবং জৈব প্রক্রিয়ার মধ্যে সব সময়েই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

জীবদেহে জৈব প্রক্রিয়ায় কোনো একটি জৈব পদার্থ তৈরি হতে খুব বেশি সময় লাগে না। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে জীবদেহের বাইরেও জৈব পদার্থ ও জলের মধ্যে নানা ধরনের প্রক্রিয়া ঘটতে পারে, যদিও সময় লাগবে খুবই বেশি।

পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে সুদীর্ঘ কাল ধরে এমনি ধরনের অসংখ্য প্রক্রিয়া ঘটেছে। সেখানে কোনো নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল তা নয়, কিন্তু তবুও সেই বিপুল বিশৃঙ্খলার মধ্যে অসংখ্য রকমের জটিল জৈব পদার্থ তেরি হতে পেরেছিল।

আমরা জানি, জীবদেহ গড়ে ওঠে এক বিশেষ ধরনের উপাদানে—যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রোটোপ্লাজ্‌ম। প্রোটোপ্লাজ্‌ম-এর মুখ্য অংশ প্রোটিন। এই প্রোটিন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত জীবদেহের মৌলিক উপাদানটিকেই পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুকাল আগেও—যখন প্রোটিন সম্পর্কে মানুষের কোনো জ্ঞান ছিল না—বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে প্রোটিনের মধ্যে একটা কিছু দুর্জ্ঞেয় রহস্য আছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে জেনে ফেলেছে। প্রোটিন তৈরি হওয়ার বিশেষ প্রক্রিয়াটি আজ আর রহস্যাবৃত নয়। জানা গেছে যে, প্রোটিন তেরি হয় হাজার হাজার কার্বন-হাইড্রোজেন-অক্সিজেন-নাইট্রোজেন পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে এবং পৃথিবীর সেই আদিম সমুদ্রেও প্রোটিন তেরি হবার পক্ষে অনুকূল অবস্থা বজায় ছিল।

এইভাবে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তর ঘটেছিল। তৈরি হয়েছিল প্রোটিন ও অসংখ্য রকমের জৈব পদার্থ।

এবারে প্রশ্ন ওঠে—জৈব পদার্থকে আশ্রয় করে প্রাণের স্ফুলিঙ্গটি কি-ভাবে দীপ্তিমান হয়ে উঠেছিল ?

আমরা জেনেছি, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে তৈরি হয়েছিল প্রোটিন ও অসংখ্য রকমের জৈব পদার্থ। কিন্তু জৈব পদার্থ তৈরি হওয়া মানেই তো আর জীব তৈরি হওয়া নয়। জৈব পদার্থে যতোক্ষণ না জীবন সঞ্চারিত হচ্ছে ততোক্ষণ জীবের জন্ম কিছুতেই সম্ভব নয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ যতোভাবেই রূপান্তরিত হোক না কেন, তা নিষ্প্রাণই থেকে যাবে। জৈব পদার্থ সজীব হতে পারে তখনই যখন রাসায়নিক রূপান্তর ছাড়াও তার মধ্যে আসে সুনির্দিষ্ট একটি বিন্যাস। কথাটার অর্থ ভালোভাবে বোঝা দরকার। নির্জীব জৈব পদার্থে হাজার রকম অদলবদল ঘটুক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু জৈব পদার্থ যদি এমন একটা বিশেষ আঁটঘাঁট বেঁধে দাঁড়াতে পারে যে জীবনের লক্ষণ তার মধ্যে প্রকাশ পায়—তাহলে সেই জৈব পদার্থটিকে আর নির্জীব বলা চলে না, তা হয়ে ওঠে সজীব।

জীবনের লক্ষণ কি ? পুষ্টি ও বংশরক্ষা। সুতরাং, আমাদের দেখতে হবে, জৈব পদার্থের এমন একটা বাঁধুনি সম্ভব কিনা যার ফলে সেই পদার্থটির পুষ্টি ও বংশরক্ষা হতে পারে। তা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, নির্জীব পদার্থ সজীব পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য, সজীব পদার্থের যে-সব নিদর্শন আজকাল আমরা চোখের ওপরে দেখি তার সঙ্গে সেই আদিম সজীব পদার্থটির কোনো দিক দিয়েই কোনো মিল নেই, কিন্তু ডাক্তার যেমন রোগনির্ণয় করেন রোগের লক্ষণ দেখে, রুগীর সাজপোশাক দেখে নয়—তেমনি এক্ষেত্রেও লক্ষণ দেখে স্বীকার করতে হবে যে পুষ্টি ও বংশরক্ষার ক্ষমতাসম্পন্ন সেই আদিম পদার্থটি সজীব।

নির্জীব পদার্থ থেকে সজীব পদার্থে রূপান্তরের এই আশ্চর্য প্রক্রিয়াটিকে এবার আমরা সংক্ষেপে জেনে নিতে চেষ্টা করব।

জীবদেহের মূল উপাদান হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে প্রোটোপ্লাজম তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সজীব পদার্থের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থাৎ, প্রাণের স্ফুলিঙ্গ প্রথম যে পদার্থের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তা হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম।

আগেই বলেছি, প্রোটোপ্লাজম-এর মুখ্য উপাদান হচ্ছে প্রোটিন। প্রোটিন ছাড়াও আছে আরো অনেকগুলো জৈব ও অজৈব পদার্থ। সব মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল একটি বিন্যাস। আর এই পদার্থগুলো আছে জলে-গোলা অবস্থায়, বা দ্রবীভূত অবস্থায়—ইংরেজিতে বলে 'সলিউশন'। লেখা এবং বলার সুবিধের জন্যে আমরা এই 'সলিউশন' শব্দটি ব্যবহার করব।

এই হিসেবে চিনি-গোলা বা নুন-গোলা জলকেও আমরা বলব সলিউশন। কিন্তু প্রোটোপ্লাজম এ-ধরনের সাধারণ সলিউশন নয়, এক বিশেষে ধরনের সলিউশন—ইংরেজিতে বলে 'কলয়ডাল' সলিউশন। এই ইংরেজি শব্দটিকেও আমাদের ব্যবহার করতে হবে। কলয়ডাল সলিউশন জিনিসটা কী?

আমরা জানি, চিনি-গোলা বা নুন-গোলা জল খুব মিহি ছাঁকুনির ভেতর দিয়ে অনায়াসেই বেরিয়ে আসে এবং তখনো তা চিনি-গোলা বা নুন-গোলা জলই থেকে যায়। তার মানে, চিনি বা নুন এমন-ভাবে জলের সঙ্গে গলে মিশে গেছে যে শুধু ছেঁকে সেই চিনি বা নুনকে জল থেকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু বিশেষ এক ধরনের গঁদের আঠা আছে যা জলে গলিয়ে নিলে চোখের দেখায় মনে হয় জলের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে। আসলে কিন্তু মেশেনি। খুব মিহি ছাঁকুনি দিয়ে ছাঁকতে গেলেই তা আটকে যায়। আবার অন্য একটা ব্যাপারও আছে। আমরা জানি, কাদাগোলা জল ঘোলাটে হয়ে থাকে, কারণ জল ও কাদায় মিশ খায় না। কিন্তু ঘোলাটে জল কি চিরকালই ঘোলাটে থাকে? থাকে না। আস্তে আস্তে ঘোলাটে জলের সমস্ত কাদা থিতিয়ে পড়ে এবং তখন সেই জল হয়ে ওঠে পরিষ্কার টলটলে। অর্থাৎ, যা কিছু জলের সঙ্গে

মিশ খায় না তার থিতিয়ে পড়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কলয়ডাল সলিউশনের বিশেষত্ব এই যে, সেই সলিউশনে যদিও জিনিসটি পুরোপুরি মিশ খায়নি (কারণ তা মিহি ছাঁকুনিতে আটকে যায়) কিন্তু তবুও তা থিতিয়ে পড়ে না। অর্থাৎ, দ্রবীভবনও নেই, থিতিয়ে পড়াও নেই—এই হচ্ছে কলয়ডাল সলিউশন।

কলয়ডাল সলিউশনের এই বেয়াড়াপনার জোর আসে কোত্থেকে? বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটাকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা অতো বিস্তৃত ব্যাখ্যার মধ্যে যাব না। শুধু এটুকু জেনে রাখা দরকার যে কলয়ডাল সলিউশন জৈব পদার্থেরও হতে পারে, অজৈব পদার্থেরও হতে পারে। কিন্তু দুয়ের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে। অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন সহজেই স্বধর্মচ্যুত হয়; অর্থাৎ, অজৈব পদার্থটি থিতিয়ে পড়ে। কিন্তু জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন এমন একটা আঁটঘাঁট বেঁধে থাকতে পারে যে সহজে ভেঙে পড়ে না। যেমনটি থাকার থেকে যায়। এবং জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশনের আরো একটি গুণ—জলের সঙ্গে অন্য যে-সব জৈব ও অজৈব পদার্থ মিশে থাকে সেগুলোকে সহজেই আত্মসাৎ করতে পারে। পরের জিনিস আত্মসাৎ করলে স্বাভাবিক নিয়মেই 'আঙুল ফুলে কলাগাছ' হতে হয়। কলয়ডাল জৈব পদার্থটিও সে-অবস্থা থেকে রেহাই পায় না; আত্মসাতের পালা যতোই চলতে থাকে ততোই ফুলতে শুরু করে। ক্রমে তার চেহারা হয়ে ওঠে অনেকটা জেলির মতো; ছাই-ছাই রঙা। সে-অবস্থায় পদার্থটি ভাসতে থাকে সেই আদিম সমুদ্রের জলে, ওজনে ও আয়তনে বাড়ে, আভ্যন্তরিক গড়নের দিক থেকে হয়ে ওঠে জটিলতরো। এভাবে কাটে লক্ষ লক্ষ বছর। ওদিকে আত্মসাতের পালা থামেনি। অসংখ্য রকমের জৈব পদার্থ প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সঙ্গে চলেছে অসংখ্য রকমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। শেষ পর্যন্ত সাধ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। ফেটে দু-টুকরো হয়ে যায় কলয়ডাল জৈব পদার্থটি। অর্থাৎ, আগে ছিল একটি, এখন দুটি। আবার এই টুকরো দুটিও 'বাপ্‌কা বেটা';

তারাও আলাদা আলাদা ভাবে জলের ভাণ্ডার থেকে আত্মসাৎ করে চলে এবং আলাদা আলাদা ভাবে ফুলতে থাকে। টুকরো ছুটির আরো সুবিধে এজন্যে যে পরিবেশের সঙ্গে তারা আগে থেকেই পরিচিত এবং আত্মসাতের ব্যাপারে আগে থেকেই অভ্যস্ত। সেপাইয়ের ছেলে পেট থেকে পড়েই যেমন লড়তে শেখে, প্রোটো-প্লাজম-এর 'বাচ্চাছুটিও' তেমনি 'বাপের' স্বভাব নিয়েই 'জন্মায়'।

এবার একটু তলিয়ে ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে, কলয়ডাল পদার্থটির মধ্যে জীবনের সবচেয়ে বড়ো ছুটি লক্ষণই প্রকাশ পেয়ে গেছে। একটি হচ্ছে পুষ্টি অপরটি বংশরক্ষা। এই বিশেষ ধরনের কলয়ডাল জৈব পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজ্‌ম। প্রাণের দুর্মর অভিযান একদা এই তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রোটোপ্লাজম-বিন্দুকে আশ্রয় করেই শুরু হয়েছিল। কালক্রমে তা বিচিত্র শাখাপ্রশাখায় বহুব্যাপ্ত। স্ফুলিঙ্গের একটি কণিকা লক্ষ শিক্ষায় বহ্নিমান।

কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজম তৈরি হতে পেরেছিল সূর্যের আলোর আশীর্বাদে। তখনো বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেন তৈরি হয়নি, সুতরাং বায়ুমণ্ডলের ওজোন-পর্দাটিও নেই। ফলে সূর্যের আলোর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির অবাধ যাতায়াত ছিল এবং তা এসে ছুঁয়েছিল সমুদ্রের জলকে। সোনার কাঠির ছোঁয়ার মতো সেই আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির ছোঁয়ায় সমুদ্রের জল আর জৈব পদার্থ মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল প্রোটোপ্লাজম।

অর্থাৎ, প্রাণ হচ্ছে সূর্যের আশীর্বাদ—আলোক-কন্যা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পৃথিবীর সমুদ্রে আজও কি প্রাণের স্ফুলিঙ্গ প্রোটোপ্লাজ্‌ম তৈরি হয়ে চলেছে?

এ-প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু পক্ষে ও বিপক্ষে কতগুলো যুক্তি উপস্থিত করা চলে।

প্রথমত, এখানকার সমুদ্রের জলে আগের মতো অতো বেশি জৈব পদার্থ নেই। উদ্ভিদ ও জীবদেহ তৈরি হবার সময়ে অনেকটাই

খরচ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, বায়ুমণ্ডলে একটি ওজোন-পর্দা রয়ে গেছে বলে সূর্যের আলোর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি এখন আর ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারছে না। তৃতীয়ত, তা সত্ত্বেও যদি এখনকার সমুদ্রে কিছুটা কলয়ডাল জৈব পদার্থ তৈরি হয়ে যায় তবে তা সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের কোনো জীবের উদরস্থ হবে!

আবার সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ওপরের কোনো যুক্তিই টেকে না। সমুদ্রের জলে জৈব পদার্থ একেবারেই নেই তা নয়। যতোটুকু আছে তা থেকেই বা কেন প্রোটোপ্লাজম তৈরি হতে পারে না? সূর্যের আলোর আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি না আসুক, বিজ্ঞানীরা নিজেরাই প্রমাণ করেছেন যে পুরোপুরি রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেও কলয়ডাল জৈব পদার্থ তৈরি হওয়া সম্ভব। আর তৃতীয় যুক্তিটি যদি মেনে নিতে হয় তবে পৃথিবীতে অনেক কিছুরই অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়; ঘাস থাকা উচিত নয় কারণ সমস্ত ঘাস ছাগল খেয়ে ফেলে, ছাগল থাকা উচিত নয় কারণ সমস্ত ছাগল মানুষ খেয়ে ফেলে।

তাছাড়া, একথা মনে রাখা দরকার যে প্রোটোপ্লাজম-এর একটি বিন্দু তৈরি হতে সময় লেগেছে কোটি কোটি বছর। প্রক্রিয়াটি এত ধীরে ধীরে কার্যকর হয় যে এই প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়াটা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সুতরাং, সমুদ্রের জলে এখনো প্রাণের স্ফুলিঙ্গ প্রোটোপ্লাজম তৈরি হচ্ছে কিনা—সে-সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলার মতো জ্ঞান মানুষের এখনো হয়নি।

মোটামুটি নিশ্চয়তার সঙ্গে শুধু এটুকু বলা চলে যে আজকের দিনে যেখানে যতো উদ্ভিদ ও জীব আমরা দেখি তা সবই বিবর্তনের অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে এসেছে।

সবাই যে টিকে গেছে তা নয়। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রাণের অনেকগুলো ধারা। মধ্যযুগের সরীসৃপদের দেখে মনে হতে পারত, এরাই চিরকাল ভূপৃষ্ঠে আধিপত্য করবে। যেমন বিরাট ছিল তাদের শরীরের গড়ন,

তেমনি বিপুল ছিল তাদের শরীরের ক্ষমতা। কিন্তু কোনো কিছুই টিকল না। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে সেই অমিত-বিক্রম সরীসৃপের দল ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে। কিন্তু তাদের চেয়ে অনেক ক্ষীণকায় ও স্বল্পতেজ স্তন্যপায়ীরা শুধু যে টিকে আছে তা নয়, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে আধিপত্য করছে। এমনিভাবে ভূপৃষ্ঠের যে-কোনো উদ্ভিদ বা যে-কোনো জীবের দিকে তাকানো যাক না কেন, দেখা যাবে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদ এবং প্রত্যেকটি জীব লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছরের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করতে সহায়তা করেছে পরিবর্তমান পরিবেশ। কাজেই, আজকের দিনে, যখন একটি বীজ পল্লবিত হয় বা ভূমিষ্ঠ হয় কোনো নবজাতক—তখন সেই চারাগাছ বা শিশু এই লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছরের অর্জিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়েই আসে। নইলে কোনোটিই টিকে থাকতে পারত কিনা সন্দেহ। উদ্ভিদ ও জীবজগতের বিবর্তন যে সম্ভব হয়েছে তা এই কারণেই। একেক যুগে যতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে, পরের যুগে সেখান থেকেই শুরু। বারে বারে নতুন করে শুরু করতে হয় না। সুতরাং আজকের দিনেও পৃথিবীর সমুদ্রে সেই আদিম যুগের প্রক্রিয়ায় যদি প্রোটো-প্লাজমের একটি বিন্দু তৈরি হয়েও যায়—তাহলেও বিবর্তনের বৈশিষ্ট্যবর্জিত সেই প্রাণবিন্দুটির কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বা, এমন আশাও করা চলে না যে সেই প্রাণবিন্দুটিকে আশ্রয় করে বিবর্তনের এক নতুনতর নাটক অঙ্কে-অঙ্কে দৃশ্যে-দৃশ্যে অভিনীত হয়ে চলুক। কারণ ইতিমধ্যেই জীবনের প্রকাশ অনেক-অনেক উঁচু স্তরে অধিষ্ঠিত। আদিম একটি প্রাণবিন্দুর পক্ষে কোনো ক্রমেই এই উচ্চতর জীবনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাণের জন্ম যেমন এক আশ্চর্য ঘটনা, প্রাণের বিবর্তনও তাই। প্রাণের ইতিহাস জানতে হলে প্রাণের বিবর্তনকে জানতে হয়। আমরাও সেই আলোচনা শুরু করি।

আজ থেকে একশো কোটি বছর আগের সময়ে উপস্থিত হলে আমরা কী দেখব ?

ভাঙন ও ক্ষয়ের পালিশ তখনো মহাদেশগুলোকে মসৃণ করে তুলতে পারেনি। সমুদ্রের জল অপেক্ষাকৃত গরম। সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া এবং আরো অনেক জৈব পদার্থ। বায়ুমণ্ডলে তখনো বাষ্পের মেঘ পুরু একটা পর্দার মতো ঝুলে আছে। আর রয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অ্যামোনিয়া ও অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন। অক্সিজেন তখনো তৈরি হয়নি। তাছাড়া, বাষ্পের মেঘ ফুঁড়ে সূর্যের আলোর সামান্য অংশই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছতে পারছে।

চারদিকে তাকিয়ে কোথাও শ্যামলতার ছিটেফোঁটাও দেখা যাবে না। অরণ্যহীন, তৃণহীন রুক্ষ অনুর্বর জমি খোসা-ওঠা ঘায়ের মতো দগ্‌দগ করছে।

আর মনে হবে, বিপুল মহাদেশ ও বিপুল সমুদ্রের কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

এই হচ্ছে একশো কোটি বছর আগের কালের আমাদের এই ভূপৃষ্ঠের ছবি। কিন্তু শুধু চোখের দেখায় আঁকা হয়েছে বলে এই ছবিটি অসম্পূর্ণ। অতি সূক্ষ্ম একটা রঙের ছোপ এই ছবিতে ধরা পড়েনি। এই সূক্ষ্ম রঙের ছোপটি হচ্ছে প্রাণের মহোৎসবের ছবি।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাবে, সমুদ্রের জলে ছোট ছোট বিন্দুর মতো গায়ে গায়ে মিশে রয়েছে অসংখ্য জীবাণু। শুরু হয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রাণান্তকর সংগ্রাম।

আগেই বলেছি, তখনো সমুদ্রের সমস্ত জল বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়েনি। সূর্যের আলোর পথ আটকে বাষ্পের মেঘ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতাসে অক্সিজেন নেই—বেশির ভাগটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড। এই অক্সিজেনহীন বাতাস, এই স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার প্রাণধারণের

পক্ষে খুব অনুকূল পরিবেশ নয়। কিন্তু তবুও প্রাণের অস্তিত্ব বজায় ছিল।

সে-সময়ে জীবাণুদের পুষ্টি সংগ্রহ হত দু-ভাবে। সমুদ্রের জলে ছিল জৈব পদার্থের প্রায় এক অফুরন্ত সঞ্চয়। একদল জীবাণু এই সঞ্চয়কেই পুষ্টি-সংগ্রহের ভাঁড়ার করে তুলেছিল।

আবার, সমুদ্রের জলে গন্ধক লোহা ইত্যাদি ধরনের অজৈব পদার্থের সঞ্চয়ও বড়ো কম ছিল না। আরেক দল জীবাণু নির্ভর করেছিল এই সঞ্চয়ের ওপরে। এই বিশেষ দলের জীবাণুকে এখনো ভূপৃষ্ঠে দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ লোহার খনি এই জীবাণুদলেরই দেহাবশেষ মাত্র।

তারপর যতোই সময় পার হয়েছে ততোই শীতল হয়েছে ভূপৃষ্ঠ, ততোই বৃষ্টি ঝরে ঝরে জল জমেছে সমুদ্রে। বাষ্পের যে মেঘ এতদিন সূর্যের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের মুখ-দেখাদেখি হতে দেয়নি তা পাতলা হয়ে আসে। সূর্যের অবাধ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে আমাদের এই পৃথিবী।

সূর্যের আলো এতদিন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছেছিল ঘন বাষ্পের মেঘ চুঁইয়ে চুঁইয়ে। জীবাণুদের পুষ্টিসংগ্রহের ব্যাপারে সেই কৃপণ আলো কোনো সহায়তাই করেনি। কিন্তু বাষ্পের মেঘ সরে যেতেই সূর্যের আলো অবারিত দাক্ষিণ্যে ভূপৃষ্ঠের নাগালের মধ্যে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা পরিবর্তন ঘটে গেল জীবাণুরাজ্যে।

এতদিন পর্যন্ত জীবাণুরা পুষ্টি সংগ্রহ করেছিল সমুদ্রের জল থেকে। এবার সূর্যের আলো নাগালের মধ্যে এসে যেতেই হাওয়া থেকে পুষ্টি সংগ্রহের একটা উপায় জানা গেল। উপায়টি কী—তা বলছি। সূর্যের আলোর প্রভাবে একদল জীবাণুর দেহে তৈরি হল ক্লোরোফিল নামে একটি অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ। কি ভাবে তৈরি হল, কেন তৈরি হল—সে-সব বিবরণের জটিলতায় আমরা যাব না। কিন্তু তৈরি হবার পরে জীবাণু-জগতে যে মস্ত পরিবর্তনটা ঘটে গেল তা জানাটা আমাদের পক্ষে জরুরি।

ক্লোরোফিল শব্দটি আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। আজকাল টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনেও লেখা থাকে—"ক্লোরোফিলযুক্ত"। গাছের পাতার সবুজ অংশে আছে ক্লোরোফিল। এই ক্লোরোফিলের একটি বিশেষ গুণ এই যে, সূর্যের আলোর সাহায্যে এই পদার্থটি বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইডকে দু-ভাগে ভাগ করে ফেলে—একভাগে থাকে কার্বন, অপর ভাগে অক্সিজেন। কার্বনের ভাগটি হয় গাছের পুষ্টি, অক্সিজেনের ভাগ বাতাসে মিশে যায়।

আদিম যুগের যে বিশেষ সময়ের কথা আমরা আলোচনা করছি, তখনো বাতাসের প্রায় সবটাই কার্বন ডাই-অক্সাইড—অক্সিজেন নেই। সুতরাং ক্লোরোফিল পদার্থটি এক বিশেষ দলের জীবাণুদেহে তৈরি হয়ে যাবার পরে সেই দলটি পরমানন্দে শুধু হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকতে পারল। আমরা জেনেছি, পুষ্টি হচ্ছে কার্বন সংগ্রহেরই নামান্তর। কাজটা আগে যতো শক্ত ছিল, ক্লোরোফিল তৈরি হবার পরে হয়ে গেল ততো সহজ। আকাশ থেকে অজস্র সূর্যের আলো ঝরে পড়ছে, বাতাসে রয়েছে অজস্র কার্বন ডাই-অক্সাইড, জীবাণুদেহে ক্লোরোফিল—সুতরাং অঢেল কার্বনের যোগান আসতে লাগল। হু-হু করে বাড়তে লাগল জীবাণুদের শরীর। গুরুভোজের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ঘটতে লাগল নানা অদল-বদল। এমনি এক বাড়-বাড়ন্ত অবস্থার মধ্যে জীবন কাটিয়ে, এমনি নানা অদল-বদলের মধ্যে দিয়ে এসে, এই জীবাণুদলের চেহারা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তার নাম আমরা দিয়েছি—উদ্ভিদ। ক্লোরোফিল তৈরি হবার পরে একশো কোটি বছরও পার হয়নি, কিন্তু ইতিমধ্যেই এই উদ্ভিদজগতটি নানা শাখাপ্রশাখায় কী বিচিত্র, ফুলেফলে কী অপরূপ।

কিন্তু জীবাণুদলের অপর একটি শাখা রয়ে গিয়েছিল যারা ক্লোরোফিলের ধার ধারত না। তাদের বলা চলে 'পরান্নভোজী'। অর্থাৎ অপরে চেষ্টাচরিত্র করে কার্বন সংগ্রহ করুক, আমরা একেবারে তৈরি খাবারে ভাগ বসাই। গাছের একটি পাতা একদানা কার্বন সংগ্রহ

করে অনেকখানি মেহনতের পরে; আরেক দল মেহনতের ধার ধারে না, গাছের পাতার কার্বনটুকুকেই আত্মসাৎ করে বসে। তবে একটা ব্যাপারে অসুবিধে আছে। তৈরি খাবার কক্ষনো মুখের কাছে এসে ধরা দেয় না, তার সন্ধানে আদাড়ে-পাঁদাড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। কাজেই এই পরান্নভোজী জীবাণুর দলকেও কিছুটা মেহনত করতে হয়েছিল। এই মেহনতের ফল হিসেবে নড়েচড়ে বেড়াবার একটা ক্ষমতা তারা আয়ত্ত করে।

ওদিকে বিনা মেহনতে খাদ্যবস্তু নাগালের মধ্যে পেয়ে পেয়ে পরান্ন-ভোজীদের 'নোলা' বেড়ে যায়। এতদিন তারা গাছের পাতা খেয়েই খুশি থাকত। এবার পরস্পরের শরীরের মাংসের দিকে লোলুপ দৃষ্টি পড়ে। শুরু হয়ে যায় মারামারি কাটাকাটি। সবল চায় দুর্বলের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে, দুর্বল চায় পালিয়ে বাঁচতে। আক্রমণ ও পলায়নের তাগিদে নড়েচড়ে বেড়াবার ক্ষমতাটা পরান্ন-ভোজীদের মধ্যে অসম্ভব রকম বেড়ে গেল। এই বিশেষ দলের জীবাণুরাই রয়েছে জীবজগতের আদিতে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সেই আদিম যুগে জীবাণুদের একটি দল থেকে তৈরি হয়েছে উদ্ভিদ, অপর একটি দল থেকে জীব। এবার থেকে আমরা এই দুটি আলাদা শব্দ ব্যবহার করব—উদ্ভিদ ও জীব।

শুনলে অবাক হতে হবে যে গোড়ার যুগে জীব নড়েচড়ে বেড়াত রকেটের মতো কায়দায়। এসব জীবের শরীরের মধ্যে ছিল বিশেষ এক ধরনের থলি। খুশিমতো জল টেনে নিয়ে এই থলিটি জলে ভরিয়ে নেওয়া যেত। তারপর এই জলই আবার প্রচণ্ড বেগে বেরিয়ে আসত শরীরের ভেতর থেকে। ফলে শরীরের মধ্যে যে ধাক্কা তৈরি হত তাই জীবটিকে ছুটিয়ে নিয়ে যেত উল্টো দিকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রকেটের কায়দায় ছুটোছুটি করাটা খুব বেশি কাজের নয়। খুশিমতো বেঁকেচুরে ছুট দিতে পারা চাই। রকেটের কায়দা সেখানে অচল। রকেটের কায়দায় ছুট দিতে হলে তালকানার মতো সিধে ছুট দিতে হয়। খুশিমতো এদিক-

ওদিক করা চলে না ! কিন্তু বেঁকেচুরে ছুট দিতে পারার তাগিদটা ছিল। শেষ পর্যন্ত, ছুটন্ত শরীরকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ছুটটাকেই বেঁকিয়ে-চুরিয়ে দেবার বিশেষ একটা ক্ষমতা আয়ত্তে এসে গেল জীবের। জলের মধ্যে ছুটন্ত অবস্থায় লম্বাটে শরীরটাকে বিশেষ কায়দায় বেঁকিয়ে দিতে পারলে ছুটটাও বিশেষ দিকে বেঁকে যায়—এই বোধটুকু হওয়াও সেই আদিম জীবের পক্ষে সহজ ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু জীবের শরীরটাই যতোদিন জেলির মতো তুলতুলে নরম থাকছে ততোদিন সেই শরীরকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যতোই খুশিমতো ছুট দেবার চেষ্টা করা যাক না কেন, কিছুটা অসুবিধে আছেই। জেলির মতো তুলতুলে নরম শরীর জলের ধাক্কায় অনায়াসেই তালগোল পাকিয়ে যায় ; কাজেই খুশিমতো দিকে ছুট দেওয়া চলে না। তাছাড়া অন্যান্য মাংসাশী জীবের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলেও শরীরের ওপরে শক্ত বর্মের মতো একটা আবরণ থাকলে ভালো হয়। এ সমস্ত কারণে জীবজগতে আবার একটা তাগিদ এসে গেল—জেলির মতো তুলতুলে নরম শরীরটাকে যে করে হোক শক্ত করে তুলতে হবে। ফলে তৈরি হল জেলির মতো নরম শরীরের ওপরে বর্মের মতো শক্ত একটা আবরণ। কাঁকড়া বা গল্‌দাচিংড়িকে আজকাল আমরা যে-ধরনের বর্ম পরে থাকতে দেখি—সেটাই হচ্ছে জীবজগতের প্রথম অস্ত্রসজ্জা। জেলির মতো তুলতুলে নরম শরীরের ওপরে এতদিনে একটা শক্ত আবরণ এসে গেল।

আর এই শক্ত আবরণটি তৈরি হবার পর থেকেই শিলালিপির পৃষ্ঠায় ফসিলের অক্ষরে জীবজগতের ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে। কারণ, আমরা জানি, জীবের শরীরে শক্ত অংশ তৈরি হবার পর থেকেই ফসিল পাওয়া সম্ভব। তার আগে, বড়ো জোর, জেলির মতো তুলতুলে নরম শরীরের দু-একটা ছাপ অবিকৃত থেকে যেতে পারে—কিন্তু জীবের দেহাবশেষের কোনো নিদর্শন পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

ফসিলের যুগ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর ঐতিহাসিক-কালের শুরু। এই ঐতিহাসিক-কালের আদিতে পুরাজীবীয় যুগ। এই যুগটির শুরু আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগে।

অর্থাৎ, প্রোটোপ্লাজমের একটি আণুবীক্ষণিক বিন্দু চোখের দেখায় চিনতে পারার মতো একটি জীবের অবয়ব ধারণ করতে এবং তুলতুলে নরম শরীরের ওপরে কঠিন আবরণের একটি বর্মসাজ পরতে সময় নিয়েছিল প্রায় একশো কোটি বছর। পুরাজীবীয় যুগের শুরুতে এই বর্মসাজটুকুই জীবের সম্বল।

পুরাজীবীয় যুগ

আজ থেকে পঞ্চাশ কোটি বছর আগেও ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগে প্রাণের কোনো চিহ্ন ছিল না। তখনো পৃথিবীর বাতাস প্রাণের কাকলিতে মুখর হয়ে ওঠেনি। শুধু সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়ালে দেখা যেত, মস্ত একেকটা ঢেউয়ের সঙ্গে দু-একটা জলজ উদ্ভিদ তীরের ওপরে আছড়ে পড়েছে। বা, আল্‌পিনের মাথার মতো দু-একটা পোকা সমুদ্রের ধারে ভিজে বালির ওপরে নড়াচড়া করছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যেত, এই পোকাগুলোই প্রাণের একমাত্র নিদর্শন নয়; সমুদ্রের জলে পর্বে পর্বে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলেছে প্রাণের এক বিপুল সমারোহ।

জলের ধারে যে পোকাগুলো নড়াচড়া করছিল তাদের নাম 'ট্রাইলোবাইট'। এরা ছিল সে-যুগের সবচেয়ে উন্নত জীব। শক্ত চামড়ায় ঢাকা পড়েছিল এদের শরীর; ধড় ও মুণ্ডু আলাদা আলাদা ভাবে চেনা যাচ্ছিল—যদিও আকারে আলপিনের মাথার চেয়ে বড়ো নয়। আর মুণ্ডুটা নামেই মুণ্ডু, কারণ চোখ-কান এসব কিছুই নেই সেই মুণ্ডুতে।

আরো কয়েক কোটি বছর পরে অর্ডোভিসিয়ান বা সিলিউরিয়ান কালে দেখা যায়, ট্রাইলোবাইটরা আকারে প্রায় একফুটের কাছাকাছি হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শরীরের বাহার ও জটিলতা।

কিন্তু আরো কয়েক কোটি বছর পরে পার্মিয়ান কালে এসে দেখা যায়, ট্রাইলোবাইটরা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। তারপর পার্মিয়ান কালের পরেই ভূপৃষ্ঠে যে বিপ্লব হয় তার ফলে নানা জায়গায় জমি উঁচু দিকে ঠেলে ওঠে, নানা জায়গায় সমুদ্র সরে যায়—এবং এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে ট্রাইলোবাইটরা খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে দ্রুত বিলুপ্ত হতে থাকে। আপালেশিয়ান বিপ্লবের সময় দেখা যায়, ভূপৃষ্ঠ থেকে ট্রাইলোবাইটরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। 'প্রায়' বললাম এই কারণে যে কোথাও কোথাও হয়তো ট্রাইলোবাইটদের দু-একটা দল কোনো রকমে বেঁচে থাকতে পেরেছিল। খুব সম্ভবত এদেরই উত্তরবংশকে আজকাল আমরা কাঁকড়া বা গল্‌দা-চিংড়ি ইত্যাদি জীব হিসেবে দেখতে পাই।

ট্রাইলোবাইটরা ভূপৃষ্ঠে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর রাজত্ব করেছিল। অবশ্য এদের রাজত্বের সীমানা ছিল সমুদ্র। কোনো কালে এরা অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেনি। খুব সম্ভবত এদের দাপটে টিকতে না পেরে এদেরই সগোত্র আরেক দল জীব আশ্রয় নিয়েছিল নদীতে বা হ্রদে —মিষ্টি জলের এলাকায়। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইউরীপ্‌-টেরিড্‌স্'। সহজেই অনুমান করা চলে, নদীতে বা হ্রদে জীবনযাত্রা একদিকে যেমন নির্বিঘ্ন, অপরদিকে তেমনি অনিশ্চিত। নদী বা হ্রদের জল সহজেই শুকিয়ে যায়, ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে নদী বা সমুদ্রের জল রাতারাতি স্থানান্তরিত হয়ে যেতে পারে—সে-অবস্থায় এই জলাশ্রয়ী জীবদের মৃত্যু ছাড়া গতি নেই। কিন্তু এক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এমন দু-একটা দল থেকে যায় যারা শুকনো ডাঙার ওপরেও কোনো রকমে নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারে। এমনি দু-একটা ছিট্‌কে-পড়া দলেরই রূপান্তর হতে হতে শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে বিছে-কেন্নো-মাকড়সা ইত্যাদি জাতীয় জীব। পরে আবার এদেরই একটা দল আকাশে উড়তে শুরু করে—তখন এদের নাম হয় পতঙ্গ।

কাজেই জীবজগতের বিবর্তনের ইতিহাসে ইউরীপ্‌টেরিড্‌সের স্থানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ক্যাম্‌ব্রিয়ান কালের শেষের দিকেও যারা

সমুদ্রের এলাকা ছেড়ে বেরোতে পারেনি এবং লম্বায় ছিল মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কয়েক কোটি বছর পেরোতে না পেরোতেই তারা একদিকে যেন ছড়িয়ে পড়েছিল জলে-স্থলে-আকাশে, অপরদিকে তেমনি হয়ে উঠেছিল দশ-ফুট পর্যন্ত লম্বা।

পুরাজীবীয় যুগে আরেক দল ছিল জীব যারা গোড়ার দিকে যদিও তেমন দাপট দেখাতে পারেনি কিন্তু এমন এক অমোঘ শক্তিসাধনায় নিয়োজিত ছিল যে পরবর্তী কালে এরাই বহু কোটি বছর ধরে সারা ভূপৃষ্ঠে দুর্দমনীয় রাজত্ব করে গেছে। পুরাজীবীয় যুগের গোড়ার দিকে যারা রাজত্ব করেছে তারা বাইরের খোলসটিকে শক্ত করে তুলতে পেরেছিল। কিন্তু এখন যাদের কথা বলছি তারা বাইরের খোলসের দিকে মন দেয়নি ; তারা চেষ্টা করছিল—নরম তুলতুলে শরীরের মাঝখানটি দিয়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শক্ত একটি দণ্ড তৈরি করে নেওয়া যায় কিনা। ফলে দেখা গেল, এদের বাইরের দিকের খোলসে কোনো রকম কাঠিন্য আসছে না, কিন্তু শরীরের মাঝখানটি দিয়ে শক্ত একটি দণ্ড একটু একটু করে গড়ে উঠছে এবং গোটা শরীরকে ঋজু করে তুলছে। তারপর পুরাজীবীয় যুগটি মাত্র পনেরো কোটি বছরের পুরনো না হতেই দেখা গেল, এই দলটি নিজেদের শরীরের মধ্যে পুরোপুরি একটি মেরুদণ্ড তৈরি করে ফেলেছে। শুরু হল মেরুদণ্ডী জীবের যুগ। শক্ত খোলসওলা জীব পোকারা হটে গেল, আধিপত্য শুরু হল মেরুদণ্ডওলা জীব মাছদের। ভূপৃষ্ঠে তখন সিলিউরিয়ান কাল চলছে—সেটা হচ্ছে আজ থেকে চৌত্রিশ কোটি বছর আগের কথা।

তারপর মেরুদণ্ডী মাছের দল কি-ভাবে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল, কি-ভাবে রূপান্তরিত হতে হতে সরীসৃপ-জাতীয় উভচর জীবের জন্ম দিয়েছিল—সে-ইতিহাসে নতুন কথা বিশেষ কিছু নেই। স্বাভাবিক নিয়মে ভূপৃষ্ঠের বিন্যাসে বারবার আলোড়ন-আবর্তন এসেছে, আর সেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গিয়ে বিবর্তনের ধাপে ধাপে জীবজগৎ অগ্রসর হয়েছে। যারা খাপ

খাইয়ে চলতে পারেনি, তাদের অস্তিত্ব থাকেনি।

যতোদূর জানা গেছে, এই মেরুদণ্ডী মাছের দল জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে—ডেভোনিয়ান কালের শেষের দিকে বা কার্বোনিফেরাস কালের শুরুতে। গোড়ার দিকে এই উভয়চর জীবরা লম্বায় কয়েক ইঞ্চির বেশি হয়নি, কিন্তু কয়েক কোটি বছর যেতে না যেতেই কার্বনিফেরাস যুগের শেষের দিকে কুড়ি ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই উভচর জীবদের দাপটও খুব বেশিদিন থাকেনি। আপালেশিয়ান বিপ্লবের সময়েই দেখা যায়, উভচর জীবরা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পেরে দ্রুত লোপ পেয়ে যাচ্ছে। এবারেও দু-একটা ছুট্‌কো দল হয়তো টিকে থাকতে পেরেছিল। এই ছুট্‌কো দলেরই ভবিষ্যৎ বংশ হচ্ছে আজকের দিনের ব্যাঙ-গিরগিটি ইত্যাদি কয়েক শ্রেণীর উভচর জীব।

উভচর জীবের অপর একটি দল কিন্তু অনেক আগেই উভচর নামের মর্যাদা খুইয়ে বসেছিল। জলের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না, কাজেই তারা হয়ে উঠেছিল সম্পূর্ণভাবে ডাঙার জীব। এই দলেরই রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে সরীসৃপ। এই সরীসৃপরাই মধ্যজীবীয় যুগে দুর্দমনীয় প্রতাপে সারা ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব করে গেছে।

কিন্তু পুরাজীবীয় যুগের শেষের দিকে যে-সব সরীসৃপের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে, তারা কিন্তু চালচলনের দিক থেকে অনেকটা আজকের দিনের সরীসৃপদের মতোই। পা-গুলো বেরিয়েছে সবই শরীরের পাশ থেকে; কাজেই চলাফেরা করাটা তাদের পক্ষে রীতিমতো মেহনতের ব্যাপার। এ সমস্ত কারণে পুরাজীবীয় সরীসৃপরা আজকের দিনের কুমিরের মতো জীবনযাত্রার ব্যাপারে খুব বেশি তৎপরতা ও উদ্যোগ দেখাতে পারেনি।

কিন্তু কিছুমাত্র তৎপরতা ও উদ্যোগ ছিল না তা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কারণ দেখা যাচ্ছে, মধ্যজীবীয় যুগে সরীসৃপদের শরীরের গড়ন আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে; পায়ের অবস্থান হয়ে

উঠেছে স্বাভাবিক, শরীর হয়ে উঠেছে খাড়া ও ঋজু, এবং শরীরের গড়নটাই এমন হয়ে উঠেছে যে বিদ্যুতের মতো দৌড়ঝাঁপ দেওয়া চলে। পুরাজীবীয় সরীসৃপদের দেখে কিছুতেই কল্পনা করা চলত না যে তাদেরই বংশধররা কয়েক কোটি বছর পরে এমন অমিতবিক্রম হয়ে উঠবে। এবং আজকের দিনের হৃতগৌরব সরীসৃপদের দেখেও মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপদের সম্পর্কে ধারণা করবার চেষ্টা বাতুলতা হবে মাত্র।

ওদিকে উদ্ভিদজগতটিও কিন্তু সমুদ্রের এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। জীবজগতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বা তারও কিছুটা আগেই জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে এসেছিল। অবশ্য উদ্ভিদের ডাঙায় উঠে আসার ব্যাপারটি ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ, যদিও পদ্ধতিটা ছিল একই। ঢেউয়ের সঙ্গে জলজ উদ্ভিদ আছড়ে পড়ত তীরের ওপরে, সেই সঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ত উদ্ভিদের বীজ। বিশেষ করে যে-সব অঞ্চল মাঝে মাঝে জোয়ারের জলে ডুবে যেত আবার মাঝে মাঝে ভেসে উঠত—সে-অঞ্চলের উদ্ভিদ ক্রমে ক্রমে দু-অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয় ওঠে। মিষ্টি জলের এলাকার উদ্ভিদেরও প্রায় একই অবস্থা। ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে মিষ্টি জলের কোনো একটি এলাকা থেকে হয়তো জল সরে গেছে; তখন গোটা এলাকার জলজ উদ্ভিদ হয় লোপ পায় কিংবা ডাঙার অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কোনো রকমে টিকে থাকে। সুতরাং, অনুমান করা চলে, জল থেকে ডাঙায় উঠে আসার প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদজগৎ সীমাবদ্ধ ছিল জলাভূমিতে আর সমুদ্রতীরের এলাকায়। এবং সেই উদ্ভিদও ছিল নিতান্তই ঝোপঝাড়। তাতে না ধরত ফুল, না হত ফল। তারপরেও বহু কোটি বছর পর্যন্ত উদ্ভিদ বলতে এমনি ঝোপঝাড়কেই বোঝাত। জীবজগতের মতো উদ্ভিদজগতও বেড়ে উঠেছে নানা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করে, নানা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে।

মধ্যজীবীয় যুগ

মধ্যজীবীয় যুগের দিকে তাকালে মনে হবে, গোটা পৃথিবীকে একটা ম্যাগ্‌নিফাইং কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। সেখানে সব কিছুই বৃহৎ, সব কিছুই অতিকায়। গাছপালা জীবজন্তু কি এক মন্ত্রবলে অনেক-অনেক গুণ বড়ো হয়ে গেছে। মস্ত এক-একটা আকাশ-ছোঁয়া গাছ ডালে আর পাতায় এমন নিশ্ছিদ্র যে সূর্যের আলো মাটিতে পৌঁছতে পারে না ; কিন্তু হঠাৎ দেখা যাবে, সেই আকাশ-ছোঁয়া গাছেরও মাথা ছাড়িয়ে ধক্ ধক্ করছে কোনো একটি অপার্থিব জন্তুর হিংস্র চোখ। নিস্তরঙ্গ জলাভূমি একটুকরো কাঁচের মতো সূর্যের আলোয় জ্বলছে ; হঠাৎ তুমুল তোলপাড় জাগিয়ে ভেসে উঠবে পাহাড়ের মতো অতিকায় কোনো জলজন্তুর কালো চক্‌চকে পিঠ। যেদিকেই তাকানো যাক, জীবনের এক সুবিপুল প্রাচুর্য বেহিসেবী মাত্রায় স্তূপ-স্তূপ হয়ে আছে বলে মনে হবে।

আজকের দিনে অতিকায় বা অমিতবিক্রমের যা কিছু নিদর্শন আমরা দেখি—মধ্যজীবীয় যুগের তুলনায় তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। হিমালয়ের সঙ্গে একটি টিলার যতোখানি তফাৎ, প্রায় তেমনি তফাৎ এই দুই পাশাপাশি যুগের জীবের মধ্যে। এ-যুগের একটি হিপোপটেমাসের ওজন বড়ো জোর দু-টন, এবং লম্বায় দশ ফুটের বেশি নয় ; কিন্তু মধ্যযুগের জলজন্তু ব্রন্টোসরাসের ওজন অন্তত পঞ্চাশ টন এবং সেটি লম্বায় অন্তত পঁচিশ গজ। এ-যুগের পশুরাজ সিংহ মধ্যজীবীয় যুগের টাইরানোসরাসের কাছে একটা ছারপোকার মতো দুর্বল।

মধ্যজীবীয় যুগে পা দিয়ে প্রথমেই চোখে পড়বে, খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙার জমিতেও প্রাণের মহোৎসব শুরু হয়েছে। আর সেখানে আধিপত্য করছে দৈত্যের মতো বিপুলকায় একটি জীব—ডাইনোসর। বলা বাহুল্য, এই জীবটি একদিনে আচমকা এমন অতিকায় হয়ে ওঠেনি। মধ্যজীবীয় যুগের প্রথম পর্বেও দেখা যায়, এই জীবটি লম্বায় পনেরো ফুটের বেশি নয়, চেহারার দিক থেকে প্রায় এ-যুগের

ক্যাঙ্গারুর মতো। পেছনের পা-দুটি বেশ বড়ো এবং রীতিমতো বলশালী; লেজটিও তাই, ছুটবার সময়ে এই লেজের সাহায্যে শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে।

কিন্তু কয়েক কোটি বছরের মধ্যে এই মাঝারি গোছের জীবটি আকারে ও হিংস্রতায় পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠেছে। টাইরানোসরাসের কথা আগেই বলেছি। এটিও এক জাতের ডাইনোসর। এই সরীসৃপটি লম্বায় পঞ্চাশ ফুটেরও বেশি, ওজনে দশ টনের কাছাকাছি। সেই মধ্যজীবীয় যুগেও টাইরানোসরাস ছিল জীবজগতের আতঙ্ক; হিংস্রতার দিক থেকে এই মাংসাশী জীবটির কোনো তুলনা ছিল না।

মধ্যজীবীয় যুগের মাঝামাঝি কালে এসে দেখা যায়, ডাইনোসরদের নানা প্রকারভেদ ঘটেছে, ছড়িয়ে পড়েছে নানা শাখা-প্রশাখায়। তাদের মধ্যে মিল শুধু এটুকু যে তারা পেছনের দু-পা ও লেজের ওপরে ভর দিয়ে ছোটে, সামনের ক্ষুদে ক্ষুদে থাবাদুটোকে ব্যবহার করে একমাত্র খাবার সময়ে বা লড়াই করবার সময়ে; এবং তারা সকলেই মাংসাশী।

যেমন, অর্নিথোমাইমাস। এই সরীসৃপটির চেহারাও ক্যাঙ্গারুর মতো, কিন্তু আকারে তেমন বড়ো নয়; সে-যুগের অন্যান্য জীবের তুলনায় ছোটই বলা চলে। চেহারার দিক থেকে এদের বরং খানিকটা মিল এ-যুগের উটপাখির সঙ্গে। পাখিদের মতোই লম্বা ঠোঁট, দাঁত নেই, পোকামাকড় খেয়ে থাকে। সে-যুগের তুলনায় নিতান্তই শান্তিপ্রিয় জীব।

যেমন, আল্লোসরাস। সারা গায়ে মস্ত মস্ত আঁশ, মুখের হাঁ-টা প্রকাণ্ড, দু-পাটি ধারালো দাঁত। হিংস্রতায় এই সরীসৃপটিও বড়ো কম যায় না।

যেমন, গোর্গোসরাস। যেমন, সেরাটোসরাস।

এমনি আরো অনেক নাম করা চলে। অধিকাংশই যেমন অতিকায়, তেমনি বলশালী, তেমনি হিংস্র। এদের সামনে পড়লে সে-যুগের

অন্যান্য জীবরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত না।

অন্যান্য জীব বলতে সরীসৃপদেরই অন্যান্য কয়েকটি দল। এদের চেহারা অনেকটা এ-যুগের গিরগিটির মতো, ক্যাঙ্গারুর মতো দু-ঠেঙে নয়। দু-একটির নাম উল্লেখ করা চলতে পারে।

ব্রন্টোসরাসের কথা আগেই বলেছি। গিরগিটির সঙ্গে মিল শুধু শরীরের গড়নের দিকে। নইলে এটি ৫০ টন ওজনের (অর্থাৎ প্রায় ১৩৫০ মন) এবং ২৫ গজ লম্বা এই চতুষ্পদী সরীসৃপটির তুলনা চলে পাহাড়ের সঙ্গে। মধ্যযুগীয় অরণ্যে ও জলাভূমিতে এ-ধরনের পাহাড়-প্রমাণ জীবের সাক্ষাৎ যেখানে সেখানে পাওয়া যেত। তেমনি সাক্ষাৎ পাওয়া যেত ডিপ্লোডোকাস-এর বা স্টেগোসরাস-এর। আকার ও শারীরিক গড়নে এ-দুটি চতুষ্পদী সরীসৃপও ব্রন্টোসরাসের সমগোত্রীয়। তবে স্টেগোসরাস-এর একটি বিশেষত্ব এই যে, এই জীবটির শিরদাঁড়া-বরাবর ইস্পাতের মতো কঠিন একটি বর্মের সাজ আছে।

আবার এই চতুষ্পদী সরীসৃপদের মধ্যে কয়েকটি ছিল যাদের অস্ত্র-সজ্জা অন্য ধরনের। যেমন, ট্রাইসেরাটপ্‌স বা প্রোটোসেরাটপ্‌স। এদের মাথার সামনের ছিল মস্ত ধারালো শিং। অনেকটা এ-যুগের বন্য বরাহের শিঙের মতো।

এ তো গেল ডাঙায় যে-সব সরীসৃপের সাক্ষাৎ পাওয়া যেতে পারে, তাদের কথা। কিন্তু সরীসৃপরা শুধু শুকনো ডাঙার জমিতেই রাজত্ব করে যায়নি, জলের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থলভাগের মতো জলভাগেও ছিল এদের অবাধ রাজত্ব। সমুদ্রের জল তোলপাড় করে এরা ঘুরে বেড়াত ; হানাহানি কাটাকাটির অন্ত ছিল না। ইক্‌থিওসরাস বা প্লেসিওসরাস-এর নাম এখানে উল্লেখ করা চলে। ইক্‌থিওসরাসের চেহারাটা হচ্ছে অতিকায় একটা মাছের মতো ; আর প্লেসিওসরাস এমনিতে কিম্ভূতাকার কিন্তু লম্বা গলাটির জন্যে রাজহাঁসের চেহারার খানিকটা আদল আসে। এই সরীসৃপদের খাদ্য ছিল মাছ। জীববিজ্ঞানীদের মতে, এই জলচর সরীসৃপরা

শুকনো ডাঙার জীবনকে বরদাস্ত করতে পারেনি, তাই জলে ফিরে এসেছিল – যেমন, এ-যুগে সীল, শুশুক, তিমি ইত্যাদি জীবরা জলের জীবনে ফিরে গেছে।

আবার শুধু জলস্থল নয়, আকাশ-রাজ্যেও ছিল এদের সমান আধিপত্য। তখনো পাখির জন্ম হয়নি, আকাশের সম্রাট সরীসৃপরাই। এবং এই সম্রাটদলেরও সম্রাট—টেরোডাক্‌টিল। এদের শরীরের কোথাও পালক বা রোঁয়ার চিহ্নমাত্র ছিল না। কল্পনা করা চলে, এই জীবটি মোটেই সুদর্শন নয়। রোঁয়াওঠা কুৎসিত গা, পালকহীন চামড়ার ডানা, তার ওপরে ধারালো দাঁতওলা মুখ। মধ্যজীবীয় যুগের শেষে ক্রিটাশুস কালে এই টেরোডাক্‌টিলরা এমন অতিকায় হয়ে উঠেছিল যে আরব্যোপন্যাসের সেই আকাশ-অন্ধকার করা পাখিটাও তার কাছে হার মানবে। ডানা-ছড়ানো অবস্থায় একডানার প্রান্ত থেকে অপর ডানার প্রান্ত পর্যন্ত টেরোডাক্‌টিলের শরীরের মাপ ছিল পঁচিশ ফুট। আর সেই ডানার এমন প্রচণ্ড শক্তি যে এক-একটা ঝাপটে এ-যুগের দশ-বারোটা ফাইটার প্লেন অনায়াসে কুপোকাত হতে পারে।

তবে যতো ভয়াবহই হোক একথা স্বীকার করতে হবে যে এই উড়ন্ত সরীসৃপরাই ছিল পাখিদের পূর্বপুরুষ। এমন কি সেই মধ্যজীবীয় যুগেই দেখা যায়, উড়ন্ত সরীসৃপদের রূপান্তর হতে শুরু করেছে এবং পাখির লক্ষণ ফুটে উঠেছে। এমনি একটি আকাশচারী জীবের নাম আর্কিওপ্‌টেরিক্‌স—সরীসৃপ ও পাখির অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। লক্ষণের বিচারে এরা আধা-সরীসৃপ, আধা-পাখি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মধ্যজীবীয় যুগে জলে-স্থলে-আকাশে সরীসৃপরা অবাধ রাজত্ব করে গেছে। শারীরিক গড়ন ও শক্তিমত্তার দিক থেকে সরীসৃপদের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন জীব পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনো যুগে নেই। প্রাণের এমন উচ্ছল মহোৎসব পৃথিবীর ইতিহাসে এক আশ্চর্য ঘটনা। এমনটি আর কখনো দেখা যায়নি এবং আর কখনো দেখা যাবে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্য ঘটনা, সরীসৃপদের এই অবাধ রাজত্ব ঘূর্ণিহাওয়ায় একমুঠো ধুলো উড়ে যাওয়ার মতো বিলীন হয়েছে। এতবড়ো একটা দুর্ঘটনাও জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি।

মধ্যজীবীয় যুগের শেষদিকে এসে দেখা যাচ্ছে, টাইরানোসরাস, স্টেগোসরাস, ইক্‌থিওসরাস, প্লেসিওসরাস, এবং যেখানে যতো "সরাস" আছে, কারও চিহ্নমাত্র নেই। যাদের দাপটে দশকোটি বছর ধরে পৃথিবীর মাটি কেঁপে কেঁপে উঠেছে, তাদের অস্তিত্ব এমন-ভাবে মুছে যেতে পারে—এ ব্যাপারটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। হিমালয়কে দেখে কি আমরা কল্পনা করতে পারি যে এই হিমালয় আর কয়েক কোটি বছরের মধ্যে রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে? মধ্যযুগীয় জীবজগতকে তুলনা করা চলে হিমালয়ের সঙ্গে। তার অস্তিত্ব ও অবলুপ্তি—দুই-ই পরম বিস্ময়ের।

প্রাণীজগতে এতবড়ো একটা দুর্ঘটনা কি করে সম্ভব হয়েছিল, সে-সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা চলে মাত্র, নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলা সম্ভব নয়। জীববিজ্ঞানীরা নানা জনে নানা অনুমান করেন। কারও কারও মতে, নবজীবীয় বিপ্লবের ফলে ভূত্বকের বিন্যাসে ও ভূপৃষ্ঠের জলবায়ুতে যে বড়ো রকমের একটা পরিবর্তন এসেছিল, তা সরী-সৃপদের জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী ছিল না।

কারও কারও মতে, স্তন্যপায়ী জীবদের সঙ্গে সরীসৃপরা এঁটে উঠতে পারেনি বলেই সরীসৃপদের এই পতন। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মধ্যজীবীয় যুগের শেষ পর্ব হচ্ছে স্তন্যপায়ী জীবদের উঠ্‌তি-যুগ। একথাও ঠিক যে নতুন পরিবেশের সঙ্গে স্তন্যপায়ীরা যতোটা খাপ খাওয়াতে পেরেছিল, সরীসৃপরা তা পারেনি। কিন্তু তবুও স্তন্য-পায়ীদের কাছে সরীসৃপদের ঘায়েল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সরীসৃপদের তুলনায় স্তন্য পায়ীরা এত ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষীণজীবী যে হাতির কাছে পিঁপড়ের মতো স্তন্যপায়ীরাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাত।

তাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে ?

আগেই বলেছি, নির্দিষ্ট কোনো কারণ বলা সম্ভব নয়। সম্ভাব্য আর একটি কারণ বলে এই আলোচনা শেষ করছি।

জাতি হিসেবেই কোনো জীব যখন ভূপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তখন বুঝতে হবে, সেই জাতির জীবনীশক্তিতেই ঘুন ধরেছে। জাতিকে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কখন ? যখন সেই বিশেষ জাতির বংশরক্ষার ক্ষমতা থাকে না। বংশরক্ষার ক্ষমতা কখন থাকে না ? যদি জাতির এক পুরুষের জীবকোষ থেকে পরবর্তী পুরুষের জীবকোষ তৈরি হতে না পারে ; অর্থাৎ জীবকোষের মধ্যেই বার্ধক্য এসে যায়।

এই ব্যাখ্যা যে সঠিক তা কেউ-ই জোর করে বলতে পারেন না। তবে অনেকের মতে, একক জীবনে যেমন শৈশব-যৌবন-বার্ধক্য আছে, তেমনি আছে জাতির জীবনে। এবং বিশেষ কোনো জাতির জীবকোষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন বুঝতে হবে সেই জাতির লীলা-খেলা শেষ। সরীসৃপরাও হয়তো এমনি একটি জাতি, যারা বার্ধক্যের স্বাভাবিক নিয়মেই ভূপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়েছে।

নবজীবীয় যুগ

নবজীবীয় যুগকে বলা হয় স্তন্যপায়ীদের যুগ। প্রায় সাত কোটি বছর আগে শুরু হয়ে এখনো এই যুগটি চলছে।

মধ্যজীবীয় যুগের শেষ পর্বেই বোঝা গিয়েছিল যে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের চেয়ে অনেক উচ্চতর পর্যায়ের জীব। শরীরের গড়ন ও ক্ষমতার দিক থেকে সরীসৃপদের তুলনায় স্তন্যপায়ীরা কিছুই নয়। কিন্তু স্তন্যপায়ীদের এমন দুটি গুণ ছিল যা পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেও তাদের টিকিয়ে রেখেছে এবং পরের যুগে তাদের আধিপত্য কায়েম করেছে।

একটি গুণ হচ্ছে—মাতৃস্নেহ।

সরীসৃপরা ডিম পেড়েই খালাস। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে

পারল কিনা এবং বেরিয়ে আসার পরে টিকে থাকত পারল কিনা—সে-সম্পর্কে সরীসৃপরা ছিল নির্বিকার।

স্তন্যপায়ীরা যে সরীসৃপদের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের জীব তা এই বাচ্চাদের সম্পর্কে দায়-দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে। আজ থেকে প্রায় পনেরো কোটি বছর আগে একদল ক্ষুদে ক্ষুদে জীবের মধ্যে নতুন একটা লক্ষণ দেখা গিয়েছিল। তারা ডিম না পেড়ে গর্ভ-ধারণ করত এবং জীবন্ত বাচ্চা প্রসব করত। তারপরেও সেই বাচ্চা তার অসহায় শৈশবকালটি কাটাত মায়ের রক্ষণাবেক্ষণে, মায়ের বুকের দুধ খেয়ে। প্রাণের ইতিবৃত্তে এটি সম্পূর্ণ নতুন লক্ষণ। একশো কোটি বছরেরও বেশি কাল ধরে ভূপৃষ্ঠে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে, কিন্তু মাতৃস্নেহের ইতিহাস মাত্র পনেরো কোটি বছরের। এই পনেরো কোটি বছরের আগে সুদীর্ঘকাল জীবজগৎ মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল। এবং মাতৃস্নেহের সঞ্জীবনী-শক্তি যে কী বিপুল তা কয়েক কোটি বছরের মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, দেখা গেল, অতিকায় শরীর ও অমিতবিক্রম থাকা সত্ত্বেও মাতৃস্নেহে বঞ্চিত সরীসৃপরা জীবনযুদ্ধে পরাজিত; কিন্তু মাতৃস্নেহে সঞ্জীবিত ক্ষুদ্রকায় ক্ষীণজীবী স্তন্যপায়ীরা আজ সারা ভূপৃষ্ঠে আধিপত্য করছে।

আর একটি ব্যাপারে স্তন্যপায়ীরা সরীসৃপদের ওপরে টেক্কা দিয়েছিল। সরীসৃপদের রক্ত ছিল ঠাণ্ডা, স্তন্যপায়ীদের রক্ত গরম। নইলে অন্য কোনো দিকে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাৎ ছিল না। একই ধরনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, একই ধরনের মাংসপেশী, একই ধরনের স্নায়ু ও মস্তিষ্ক। বরং সরীসৃপদের শরীরের গড়ন ছিল খুবই মজবুত, পরাক্রম ছিল খুবই বেশি। তবুও শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, উষ্ণরক্তধারীরা যতো সহজে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে, শীতলরক্তধারীরা তা পারেনি।

কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, পুরাজীবীয় যুগের শেষ পর্বেই এক দল সরীসৃপজাতীয় জীবের শরীরে দুগ্ধগ্রন্থি তৈরি হতে শুরু হয়েছিল।

অনুমান করা চলে, বাচ্চাদের সম্পর্কে এই বিশেষ জাতীয় জীবের উৎকণ্ঠা ছিল খুবই বেশি। বাচ্চারা যতোদিন না নিজেদের পায়ে সবল হয়ে দাঁড়াতে পারছে ততোদিন মায়েরা আগলে আগলে বেড়াত বাচ্চাদের। সে-যুগের পক্ষে বাচ্চাদের সম্পর্কে এতখানি উৎকণ্ঠা ও সতর্কতা জীবজগতে এক অভাবনীয় ঘটনা।

নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বে পা দিয়ে দেখা যায়, স্তন্যপায়ী জীবরা নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে সারা ভূপৃষ্ঠে* ছড়িয়ে পড়েছে। আজকের দিনে স্তন্যপায়ী জীবদের যে চেহারা আমরা দেখি, তখনো মোটামুটি সেই একই ধরনের চেহারা। তবে এখানকার তুলনায় তখন আকারে অনেক ছোট। যেমন, এ-যুগের ঘোড়া, হাতি, শুয়োর, গণ্ডার, বরাহ ইত্যাদি প্রাণীদের জায়গায় সে-যুগে ছিল একটি মাত্র স্তন্যপায়ী জীব—ফেনাকোডাস। আকারে সেটি শেয়ালের চেয়ে বড়ো ছিল না, শরীরটা ছিল লম্বাটে, নাকটা চোখা, পা-গুলো ছোট ছোট।

প্রায় সাত-কোটি বছর সময় লেগেছে এই স্তন্যপায়ী জীবটির বড়ো হয়ে হয়ে বর্তমান আকারে পৌঁছতে এবং নানা শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়তে। অন্যান্য জীবের মধ্যে ছিল ক্ষুদে ক্ষুদে বানর যারা গাছের ডালে ডালে লাফালাফি করত। আর ছিল একদল হিংস্র মাংসাশী জীব যাদের বলা হত 'ক্রিয়োডোণ্ট'। এই ক্রিয়োডোণ্টরাই পরে দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেছে; একদল চেহারা হয়েছে কুকুরের মতো (যেমন, কুকুর, নেকড়ে, ভাল্লুক, ইত্যাদি), আর এক দলের চেহারা হয়েছে বেড়ালের মতো (যেমন, বেড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি)।

অবশ্য নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বের সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবই যে টিকে

* একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে আজ পর্যন্ত কোনো স্তন্যপায়ী জীবের ফসিল পাওয়া যায়নি। অনুমান করা চলে, এই মহাদেশে স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়েছে অনেক পরে। আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, একমাত্র এই মহাদেশটিতেই এখনো ক্যাঙ্গারু-জাতীয় জীবের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

থেকেছে তা নয়। কোনো কোনো শাখা লুপ্ত হয়েছে, আবার বেরিয়ে এসেছে নতুন নতুন শাখা। আর যারা টিকে থেকেছে তারা হয়ে উঠেছে বড়ো—আরো বড়ো। সাত কোটি বছর ধরে একটু একটু করে বড়ো হয়ে পৌঁছেছে আজকের আকারে।

আগেই বলেছি, ভূপৃষ্ঠের জলবায়ু চিরকালই আজকের মতো ছিল না। হিমযুগের সময়কে বাদ দিলে ভূপৃষ্ঠের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণমণ্ডলীয়। সুতরাং অনুমান করা চলে, সেই উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর যুগে স্তন্যপায়ী জীবরা ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই অনুমান যে সঠিক তার প্রমাণ—মস্কো প্যারিস নিউ ইয়র্ক পিকিং অঞ্চলেও বাঘ-সিংহ-গণ্ডার-হিপোপটেমাস ইত্যাদি উষ্ণমণ্ডলীয় জীবের ফসিল পাওয়া গেছে।

তারপর হিমযুগে যখন মস্ত মস্ত হিমবাহ পর্বতের চুড়ো থেকে নেমে আসতে শুরু করে, প্রচণ্ড শীতে উদ্ভিদ ও জীবের অবস্থা হয়ে ওঠে প্রাণান্তকর—সে-সময়ে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই উদ্ভিদ ও জীবকে সরে যেতে হয়েছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে। কিন্তু সবাই সরে যেতে পারেনি। যে-কোনো কারণেই হোক দু-একটা ছুট্‌কো দল থেকে গিয়েছিল সেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই। উদ্ভিদজগৎ সেই প্রচণ্ড শীতকে একেবারেই সহ্য করতে পারেনি কিন্তু জীবজগৎ লড়াই করেছে। লড়াই করতে করতে যারা টিকে থাকতে পেরেছে তাদের শরীরের চামড়ার ওপরে তৈরি হয়েছে মেরু-অঞ্চলের শীত সহ্য করবার মতো ঘন পশম। এই ঘন পশমওয়ালা জীবরা আজো মেরু-অঞ্চলের বাসিন্দা।

আবার, ঘন পশমওলা জীবদের মধ্যেও অনেকে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিদায় নিয়েছে। জলবায়ু সহ্য করবার ক্ষমতা হয়তো এদের ছিল, কিন্তু প্রাণ বাঁচিয়ে রাখার লড়াইয়ের অন্যান্য ক্ষেত্রে হেরে গিয়ে টিকে থাকতে পারেনি। এমনি একটি জীব হচ্ছে ম্যামথ্‌। দেখতে অবিকল হাতির মতো, তেমনি শুঁড়, তেমনি দাঁত; আর সারা গায়ে ঘন বাদামী পশম, বরফ-ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এই জীবটি

যখন গজেন্দ্রগমনে চলাফেরা করত, সে একটা দেখবার মতো দৃশ্য ছিল। সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা-অঞ্চলে একাধিক বরফ-জমা ম্যামথের শরীর পাওয়া গেছে।

এবার আমাদের নিজেদের কথা কিছুটা জানা দরকার। অর্থাৎ মানুষের কথা। জীবজগতের ইতিহাসে মানুষের অস্তিত্ব একেবারেই সাম্প্রতিক কালের। মাত্র কয়েক লক্ষ বছর তার বয়স। পৃথিবীর অস্তিত্বকালের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য একটি ঘটনা। কিন্তু এই অকিঞ্চিৎকর ও নগণ্য ঘটনাটির গুরুত্ব এত বেশি যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

আগেই বলেছি, নবজীবীয় যুগের শুরুতে দেখা যায়, একদল স্তন্যপায়ী জীব মাটি ছেড়ে গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। জীবনধারণের তাগিদে এই দলটিকে কয়েকটি নতুন গুণ অর্জন করতে হয়েছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো গুণ হচ্ছে প্রখর দৃষ্টিশক্তি।

যে-সব জীব মাটিতে চলাফেরা করে তাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তি বেশি। এবং তাদের পক্ষে ঘ্রাণশক্তিটাই বেশি দরকারী। বনেজঙ্গলে চলাফেরা করতে হলে চোখের দেখাটা খুব বেশি কাজে লাগে না, কিন্তু গন্ধ শুঁকে কোনো কিছু সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করতে না পারলে যেমন পদে পদে জীবন বিপন্ন হতে পারে, তেমনি পদে পদে শিকার ফস্‌কে যেতে পারে। কিন্তু যে-সব জীব গাছের ডালে চলাফেরা করে তাদের পক্ষে ঘ্রাণশক্তির চেয়ে দৃষ্টিশক্তি থাকাটা আরও বেশি জরুরি। এই জরুরি তাগিদ থেকেই ক্রমে এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মাথার খুলির আদলটা পর্যন্ত এমনভাবে পাল্‌টে যায় যেন দু-চোখ দিয়ে সিধে সামনের দিকে তাকানো চলে এবং দু-চোখের দৃষ্টি একই বস্তুর ওপরে নিবদ্ধ হতে পারে।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। স্তন্যপায়ী জীবদের বিশেষ একটা লক্ষণ এই যে, এদের সকলেরই মাথার খুলির মধ্যে মস্তিষ্ক নামে একটি পদার্থ আছে। এবং যতো বেশি উন্নত পর্যায়ের জীব

ততো বড়ো মস্তিষ্ক। এইভাবে বড়ো হতে হতে সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ের জীব মানুষের মাথায় সবচেয়ে বড়ো। স্তন্যপায়ী জীবদের যুগে এসেই প্রথম দেখা যায়, প্রাণের বিবর্তনে মস্তিষ্কেরও একটা ভূমিকা আছে? এতদিন পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল, যে-জীবের গায়ের জোর বেশি তারই রাজত্ব চলছে। অর্থাৎ, শরীরের গড়নের ওপরেই অনেক কিছু নির্ভর করত। নবজীবীয় যুগে এসে দেখা যাচ্ছে, গায়ের জোরের চেয়েও বড়ো জোর হচ্ছে মস্তিষ্কের জোর।

আমাদের আলোচনায় ফিরে আসি। জীবনধারণের তাগিদেই এক-দল বৃক্ষাশ্রয়ী জীবের দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয়ে উঠেছিল এবং চোখের অবস্থানও গিয়েছিল বদলে। স্বাভাবিক নিয়মেই মস্তিষ্কের যে-অংশে দৃষ্টিবোধ, সে-অংশটি হয়ে ওঠে আরও উন্নত। ফলে, বৃক্ষাশ্রয়ী জীবরা নতুন এক ক্ষমতার অধিকারী হয়—সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে পারা। যে-সব জীব মাটিতে চলাফেরা করে তারা শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার সময়ে যদি সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে না পারে তবে বড়ো জোর শিকারটি ফসকে যায়। কিন্তু কোনো বৃক্ষাশ্রয়ী জীব এক ডাল থেকে অপর ডালে লাফ দেবার সময়ে যদি সঠিকভাবে দূরত্ব স্থির করতে না পারে—তবে তার জীবনসংশয়। অথচ এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের জীবনধারণের তাগিদেই চোখের পলকে ডালে ডালে লাফিয়ে পড়তে হত। ফলে, দ্রুত মস্তিষ্ক চালনার ক্ষমতা এই জীবদের আয়ত্তে এসে যায়। মস্তিষ্ক-চালনার সঙ্গে সঙ্গে আরো উন্নত হয়ে ওঠে মস্তিষ্ক।

আবার, গাছের ডালে ডালে চলাফেরা করতে হত বলে এরা আরো কয়েকটা ব্যাপারে পটু হয়ে উঠেছিল। যেমন, গাছের ডাল আঁকড়ে ধরতে পারা, শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতে পারা, ইত্যাদি। এ-ধরনের প্রত্যেকটি কাজের জন্যেই মস্তিষ্ক-চালনা দরকার। কাজেই অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্ক আরো উন্নত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এরা সামনের প্রত্যঙ্গ দুটি হাতের মতো ব্যবহার করতে পারছে এবং সেই হাতের

মুঠোয় লাঠি ধরতে শিখেছে।

ওদিকে লেজের ব্যবহার বিশেষ না থাকায় লেজটি ক্রমেই ছোট হয়ে আসছিল, শেষ পর্যন্ত তার আর কোনো চিহ্ন থাকেনি।

এবার এই বৃক্ষাশ্রয়ী জীবদের চেহারা কল্পনা করা চলে। লেজ নেই, পেছনের দু-পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে, সামনের প্রত্যঙ্গদুটি ব্যবহার করে হাতের মতো। এরা বানর হতে পারে কিন্তু বানর নয়। শিম্পাজী হতে পারে, ওরাং-ওটাং হতে পারে, গরিলা হতে পারে—কিন্তু কোনোটাই নয়। মানুষ হতে পারে—কিন্তু মানুষও নয়। পুরোপুরি কোনোটাই নয়।

এরাই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ। ইংরেজিতে এদের নাম—'অ্যানথ্রো-পয়েড এপ্', অর্থাৎ 'মনুষ্যসদৃশ বিশেষ জাতীয় বানর'।

জাভা-মানুষ

অবশ্য একথা ঠিক যে মানুষের এই পূর্বপুরুষকে সুস্পষ্টভাবে চিনে নেবার মতো প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ জীববিজ্ঞানের যাদুঘরে এখনো পর্যন্ত মজুদ নেই। মানুষ সবচেয়ে সাম্প্রতিক কালের জীব হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীর মাটিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে মাত্র গুটিকয়েক ফসিল-মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। মানুষের চেয়ে অনেক আগের কালের জীব ডাইনোসররা পৃথিবীর মাটিতে যতো কিছু নিদর্শন রেখে গেছে, মানুষ তাও রাখেনি। কিংবা হয়তো নিদর্শন যথেষ্টই আছে, খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনো পর্যন্ত।

তবুও, সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রচুর না হোক, গুটিকয়েক যা পাওয়া গেছে তা অনিশ্চিত বা অনির্দিষ্ট নয়। অর্থাৎ, কোন্ বিশেষ জাতীয় জীব বিবর্তনের কোন্ বিশেষ পথে বিকাশলাভ করে আজকের দিনের মানুষ—সে-সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই কোনো।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই জীববিজ্ঞানীরা উঠে-পড়ে লেগেছিলেন, মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন খুঁজে বার করতে হবে। দেখা গেল, কাজটা খুবই শক্ত। বরং আদিম মানুষ যে-সব হাতিয়ার

ব্যবহার করেছে এবং গুহার গায়ে যে-সব ছবি এঁকে রেখেছে—সেগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়; কিন্তু আদিম মানুষের মাথার একটুকরো খুলি বা চোয়ালের একটুকরো দাঁত বা শরীরের হাড় খুঁজে পাওয়াটা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার। বহু জীববিজ্ঞানী এই উদ্দেশ্যে জীবনপাত করেছেন। ফলে, পুরো এক শতাব্দীর চেষ্টায় ভূপৃষ্ঠের নানা অংশ থেকে মানুষের পূর্বপুরুষের অল্প কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া গেছে। কোনো জায়গা থেকে হয়তো একটা মাথায় খুলি, কোনো জায়গা থেকে হয়তো একটা দাঁত—এমনি সব টুক্‌রো-টাক্‌রা। আস্ত একটি কঙ্কাল আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, সম্ভবত কোনোকালেই পাওয়া যাবে না। কিন্তু টুক্‌রো-টাক্‌রা নিদর্শন থেকেও পুরো চেহারাটা কল্পনা করা সম্ভব—এবং জীববিজ্ঞানীরা এ-ব্যাপারে অসাধ্য-সাধন করেছেন। মাথার একটুখানি খুলি বা চোয়ালের একটিমাত্র দাঁত দেখলেই তাঁরা বলে দিতে পারেন, পুরো চেহারাটি কি-ধরনের হবে। নিদর্শনগুলোকে বয়সের হিসেবে সাজিয়ে পর-পর ছবি এঁকে গেলে দেখা যাবে, যতোই অতীতের দিকে যাওয়া যাচ্ছে ততোই বুনো হয়ে উঠছে মানুষের চেহারা। শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময়ে পৌঁছনো চলে যখন চেহারা দেখে কিছুতেই বলা চলে না সেটি বানরের মতো দেখতে একটি মানুষ, না, মানুষের মতো দেখতে একটি বানর।

মানুষের পূর্বপুরুষের এই না-মানুষ না-বানর চেহারাটি আঁকা হয়েছে জাভাদ্বীপে পাওয়া নিদর্শন থেকে। ভূ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এর নাম—'জাভা-মানুষ'। এটি হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষের একটি প্রাচীনতম নিদর্শন। সুতরাং এই মানুষটির সম্পর্কে কিছুটা খবর জানা দরকার।

জাভা-মানুষের নিদর্শন আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইউজেন ডুবোয়া নামে একজন হল্যাণ্ডবাসী ডাক্তারের। ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সুমাত্রায় হাজির হয়েছিলেন এক হাসপাতালের চাকরি নিয়ে। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল, চাকরি করা নয়, মানুষের পূর্বপুরুষের

নিদর্শন খুঁজে বার করা। ডুবোয়ার ধারণা হয়েছিল, মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া সম্ভব ভূপৃষ্ঠের দুটিমাত্র জায়গায়—ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কিংবা মধ্য ও পূর্ব আফ্রিকায়। কারণ, এই দুটি জায়গাতেই মানুষের মতো দেখতে বিশেষ জাতীয় বানর সবচেয়ে বেশি আছে ; পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আছে ওরাংওটাং, আফ্রিকায় আছে গরিলা ও শিম্পাজী।

জাভা দ্বীপের যে অংশ থেকে জাভা-মানুষের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল সেটি দ্বীপের পূর্বার্ধে। সারি সারি কতকগুলো আগ্নেয়গিরি আছে সেখানে ; সোলো নামে একটি নদী প্রথমে দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হয়ে আগ্নেয়গিরিগুলোকে পাক খেয়েছে, তারপর পশ্চিম দিকে বাঁক নিয়ে পড়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে। ১৮৯০ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৯২ সালের আগস্ট মাসের মধ্যে তিনি এই অঞ্চলের মাটি খুঁড়ে প্রথমে খুঁজে পেয়েছিলেন নিচের চোয়ালের একটি হাড় (একটি দাঁত তখনো সেই চোয়াল থেকে খসে পড়েনি), তারপরে ওপরের চোয়ালের ডানদিকের একটি পেষণ-দাঁত, তারপরে মাথার খুলি, তারপরে উরুর একটি হাড়। এছাড়াও পেয়েছিলেন হাতি গণ্ডার হিপোপটেমাস ইত্যাদি জীবের হাড়গোড়।

মাটির যে বিশেষ স্তর থেকে এসব নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল তা থেকে এগুলোর বয়স সম্পর্কেও তিনি একটা আন্দাজ করেছিলেন। এক-লক্ষ থেকে তিনলক্ষ বছর।

এই সামান্য নিদর্শন থেকেই জাভা-মানুষের পুরো চেহারাটি জীব-বিজ্ঞানীরা এঁকে নিয়েছেন। এই চেহারার বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে মানুষ ও বানরের বৈশিষ্ট্য এতে সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। যেমন, ব্রহ্মতালুটি বানরের মতো চ্যাটালো কিন্তু উরুর হাড়টি অবিকল মানুষের মতো। এ সমস্ত কারণে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলেছিল, এই নিদর্শনগুলো সত্যি সত্যিই মানুষের কোনো পূর্বপুরুষের, না, নিতান্তই হাল আমলের বনমানুষ জাতীয় কোনো জীবের ! বহু বিতর্কের পরে শেষ পর্যন্ত জাভা-মানুষের প্রাচীনত্ব

স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ, এই আধা-বানর আধা-মানুষ জীবটিই হচ্ছে মানুষের পূর্বপুরুষ।

নেয়ানডার্থাল মানুষ

মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন আবিষ্কার করার ব্যাপারে ডুবোয়া পথিকৃৎ নন। আরো আগেই একাধিক আবিষ্কার হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নেয়ানডার্থাল মানুষের কথা উল্লেখ করা চলে।

নেয়ানডার্থাল একটি গিরিপথের নাম, জার্মানির ডুসেলডর্ফ ও এল্‌বেরফেল্ড-এর মাঝখানে এই জায়গাটি। এই গিরিপথের ধারে একটি গুহার মধ্যে থেকে ১৮৫৬ সালে পাওয়া গিয়েছিল একটি মাথার খুলি। এই খুলির ব্রহ্মতালুটিও বানরের মতো চ্যাটালো। সুতরাং এটি সত্যিই মানুষের কোনো পূর্বপুরুষের মাথার খুলি কিনা তা নিয়ে আরো প্রচণ্ড বিতর্ক উঠেছিল। তখন সবেমাত্র ডারউইনের বইটি প্রকাশিত হয়েছে, বিবর্তনবাদ তখনো পর্যন্ত সর্বস্বীকৃত মতবাদ নয়; সুতরাং বিবর্তনবাদ-বিরোধীরা সরবে ঘোষণা করতে লাগলেন যে এই খুলিটি হাল হামলের কোনো মানুষের এবং বিশেষ কোনো রোগে এই মানুষটির খুলি বিকৃত হয়ে গেছে। কিন্তু বিবর্তনবাদ-পক্ষীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই মাথার খুলিটি মানুষের কোনো পূর্বপুরুষের এবং এটির বয়স অন্তত ৭৫,০০০ বছর।

নেয়ানডার্থাল মানুষটিকে পুরোপুরি স্বীকৃতি পাবার জন্যে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে। ১৯০৮ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে ফ্রান্সের শাপেন্‌-ও-স্যাঁ নামে একটি গ্রামের কাছে ছোট্ট একটি গুহা থেকে পাওয়া গেল প্রায়-আস্ত একটি কঙ্কাল। নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হল যে এই কঙ্কালটি একটি মানুষের এবং মানুষটি নেয়ানডার্থাল মানুষের সমকালীন ও সমগোত্রীয়।

এই কঙ্কালটি থেকে নেয়ানডার্থাল মানুষের নিখুঁত একটি বিবরণ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মানুষটির মুণ্ডু প্রকাণ্ড, ধড় ছোট; লম্বায়

পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মধ্যে ; দু-পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়ায় বটে কিন্তু শরীর ও মাথা নুয়ে পড়ে সামনের দিকে ; হাঁটু যায় বেঁকে ; শরীরের তুলনায় মুখটি বেশ বড়োসড়ো, মাথার খুলি চ্যাটালো। অর্থাৎ, জীবটি পুরোপুরি মানুষ নয়, পুরোপুরি বানর নয়। মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি।

পিকিং মানুষ

মানুষের পূর্বপুরুষের পরবর্তী নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় পিকিং শহরের কাছে ১৯২৭ সালের অক্টোবর মাসে। অবশ্য তার আগে পঁচিশ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জীববিজ্ঞানীরা এই অঞ্চল থেকে ফসিল সংগ্রহ করেছেন এবং অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে মানুষের পূর্বপুরুষের প্রাচীনতম কোনো নিদর্শন এই অঞ্চল থেকে পাওয়া সম্ভব।

পিকিং মানুষের আবিষ্কার খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। এ-ব্যাপারে প্রায় একটা আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। ১৯০২ সালে একজন জার্মান ডাক্তার আবিষ্কার করেন একটি দাঁত, প্রমাণিত হয় যে এই দাঁতটি কোনো মানুষেরই হওয়া সম্ভব এবং হাজার হাজার বছরের পুরনো। তারপর ১৯১৬ সালে সুইডেনের একজন জীববিজ্ঞানী পিকিংএর কাছাকাছি একটি অঞ্চলে জন্তুজানোয়ারের হাড়-গোড় খুঁজে পেয়ে খুঁড়তে শুরু করেন। ১৯২৫ সালে কানাডার একজন জীববিজ্ঞানী যোগ দেন এই দলে। ১৯২৭ সালের ২৬শে অক্টোবর তারিখে একটি দাঁত আবিষ্কৃত হয়। এবং মাত্র এই একটি আবিষ্কারের ভিত্তিতেই কানাডীয় জীববিজ্ঞানী ডাঃ ব্ল্যাক পিকিং মানুষের কথা ঘোষণা করেন।

পরে এই একই অঞ্চলে একই বিষয়ে গবেষণা করেছেন একজন চীনা, একজন ফরাসী এবং একজন আমেরিকার জীববিজ্ঞানী। পর পর আবিষ্কৃত হয়েছে মাথার খুলি এবং চোয়ালের হাড় ও দাঁত। পিকিং মানুষের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। মাটির স্তর বিশ্লেষণ

করে জানা গেছে, মানুষটির বয়স অন্তত একলক্ষ বছর।
চেহারার দিক থেকে পিকিং মানুষ ও জাভা মানুষ সমগোত্রীয় এবং সমকালীন। এরা না-মানুষ না-বানর। দুয়ের মাঝামাঝি। পাশাপাশি অঞ্চল থেকে এভাবে একাধিক নিদর্শন পাবার পরে জীববিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এককালে মানুষের পূর্বপুরুষের সমৃদ্ধ বসতি ছিল।

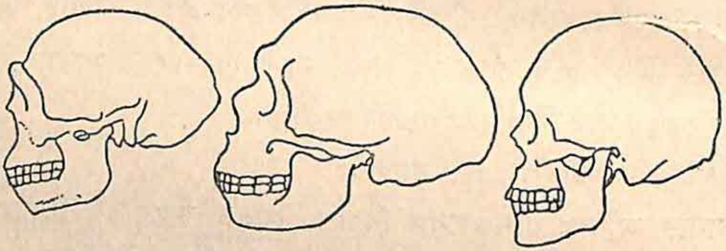
অষ্ট্রালেপিথেকাস

দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের পূর্বপুরুষের প্রথম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় ১৯২৪ সালে, তারপরে ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে।
দক্ষিণ-পশ্চিম ট্রান্স্‌ভাল অঞ্চলে একটি কাদামাটির ঢিবিকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঢিবির তলায় আরো খানিকটা মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল একটি মাথার খুলি। খুলিটি পাঠিয়ে দেওয়া হল রেমণ্ড ডার্ট নামে একজন অধ্যাপকের কাছে। অধ্যাপক পরীক্ষা করে দেখলেন, খুলিটি ছ-বছর বয়সের একটি বাচ্চার, এবং গড়নের দিক থেকে সেটি না-মানুষ, না-বানর—দুয়ের মাঝামাঝি। তিনি সেটির নাম দিলেন অষ্ট্রালেপিথেকাস।
এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৪ সালে।
সে-সময়ে অষ্ট্রালেপিথেকাসের বিবরণ কারও কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ব্যাপারটাকে সবাই এক কথায় উড়িয়ে দিয়েছিল।
কিন্তু ১৯৩৬ সালে জোহানেস্‌বার্গ-এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয় আরেকটি মাথার খুলি এবং কিছু হাড়গোড়। এবারের খুলিটি একজন পূর্ণবয়স্কের। দেখা গেল এই জীবটিও না-মানুষ, না-বানর—দুয়ের মাঝামাঝি এবং অষ্ট্রালেপিথেকাসের সমকালীন ও সমগোত্রীয়।
তারপর দু-বছর পার না হতেই কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হল দ্বিতীয় আরেকটি মাথার খুলি এবং কয়েকটি দাঁত। এই জীবটিও অষ্ট্রালেপিথেকাস। তারপর ১৯৪৭ সালে একই অঞ্চল থেকে একই

ধরনের আরো কয়েকটি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুতরাং এখন আর অষ্ট্রালেপিথেকাসকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হিসেবে এটি হচ্ছে প্রাচীনতম—একলক্ষ বছরেরও বেশি বয়স।

মানুষের বিবর্তনের যে কটি নিদর্শনের পরিচয় এতক্ষণ ধরে নেওয়া হল, সেগুলোকে পর পর সাজালে তিনটি সুস্পষ্ট পর্ব পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমে অষ্ট্রালেপিথেকাস। একলক্ষেরও বেশি বয়স—মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন হিসেবে প্রাচীনতম। চেহারার দিক থেকে এত বেশি বুনো যে এই জীবটিকে বানরের-মতো দেখতে-মানুষ না বলে মানুষের-মতো-দেখতে-বানর বলাই উচিত। তারপরে জাভা ও পিকিং মানুষ: এক লক্ষের কাছাকাছি বয়স। চেহারার দিক থেকে বানর ও মানুষের মাঝামাঝি। তারপরে নেয়ানডার্থাল মানুষ। সত্তর হাজার বছর বয়স। এই জীবটির মধ্যে বানরের চেয়ে মানুষের লক্ষণই বেশি।



তিনটি মাথার খুলি। বাঁ দিকে পিকিং মানুষের, মধ্যে নেয়ানডার্থাল মানুষের, ডান দিকে আধুনিক মানুষের। গত একলক্ষ বছরে মানুষের মাথার খুলির গড়ন কতখানি পাল্‌টে গেছে তা এই তিনটি ছবি দেখলে বোঝা যাবে।

ক্রো-মাঞঁ মানুষ

বানর থেকে মানুষের বিবর্তনের শেষ পর্বটির সন্ধান পাওয়া গেছে ফ্রান্স থেকে।

১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের দোর্দোঞন অঞ্চলে নতুন একটি রাস্তা তৈরি

করা হচ্ছিল। সেখানে একটা চুনাপাথরের স্তূপকে উড়িয়ে দিতে গিয়ে পাওয়া গেল কয়েকটি হাড়। পরে সেই অঞ্চলের মাটি খুঁড়তেই বেরিয়ে এল পাঁচটি প্রায়-আস্ত কঙ্কাল। এই কঙ্কালগুলো মানুষের এবং এদের নাম দেওয়া হল ক্রো-মাঞঁ মানুষ। মাত্র ৩০,০০০ বছর এদের বয়স এবং চেহারার দিক থেকে এরা আধুনিক মানুষের সমগোত্রীয়।

ক্রো-মাঞঁ মানুষের রীতিমতো লম্বা-চওড়া চেহারা। লম্বায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি থেকে ৬ ফুট ১ ইঞ্চির মধ্যে। লম্বাটে মাথা, থ্যাবড়া মুখ, পেশীবহুল প্রত্যঙ্গ, উঁচু চোয়াল। পুরোপুরি আধুনিক মানুষ।*

প্রাণের এই ইতিবৃত্ত থেকে একটি অবধারিত সিদ্ধান্ত টানা চলে। জীবজগতের বিকাশ হয়েছে বিবর্তনের ধাপে ধাপে এবং এই বিবর্তন সরল থেকে জটিলের দিকে। দেড়শো কোটি বছর আগে পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটোপ্লাজমের কয়েকটি আণুবীক্ষণিক বিন্দুকে আশ্রয় করে প্রাণের যাত্রা শুরু হয়েছিল আর আজকের দিনে মানুষের মতো জটিল জীব সেই প্রাণের ধারক। প্রাণের এই সরলতম থেকে জটিলতম প্রকাশ আচমকা হয়নি—একটি নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করেছে, কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ পার হয়ে এসেছে।

জীববিজ্ঞান এই বিবর্তনের ছবিটি এত সুস্পষ্টভাবে এঁকে দিয়েছে এবং এর সপক্ষে এমন নির্মম প্রমাণ হাজির করেছে যে বিবর্তনবাদকে আজ আর কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না।

এবং কোনো বিজ্ঞানীই তা করেন না। জীবজগতের উৎপত্তি সম্পর্কে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা বাতিল হয়ে গেছে। জীবজগতের বিকাশ বিবর্তনের নিজস্ব নিয়মে—এই সত্য আজ বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখাতেই প্রতিষ্ঠিত।

---

* 'মানুষের ঠিকানা' বইয়ে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।



পৃথিবীর ভবিষ্যৎ

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিতলে।

এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে মানুষের ভবিষ্যৎ কী?

ভূপৃষ্ঠের দিকে তাকিয়ে সহজেই বলতে পারা যায়, আমরা বাস করছি পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিপ্লবের যুগে—যখন সারা ভূপৃষ্ঠে উঁচু উঁচু পর্বতমালা তৈরি হয়েছে। কোনো কোনো ভূ-বিজ্ঞানীর মতে এই বিপ্লব এখনো অসম্পূর্ণ। সুতরাং আগামী লক্ষ বা কোটি বছরের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের আরো দু-এক জায়গায় আরো দু-একটা নতুন পর্বত-মালা তৈরি হতে পারে। সেই পর্বত-তৈরির প্রক্রিয়াটি চলবার সময়ে ব্যাপক এক অঞ্চল জুড়ে হয়তো শুরু হতে পারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির তাণ্ডব। ব্যাপারটা যে ঘটবেই এমন কথা জোর করে বলা চলে না। ঘটলেও কবে ঘটবে সে-সম্পর্কে কোনো অনুমান করা অসম্ভব। অনেকে বলেন, আগামী লক্ষ বছরে এসব কাণ্ডকারখানা ঘটবার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আর তা যদি ঘটেও তো ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির তাণ্ডব নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবার কারণ আছে বলে মনে হয় না। অতীতেও বহুবার এ-ধরনের ঘটনা ঘটেছে—মানুষের চেয়ে নিকৃষ্টতর জীব-জগতও তাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আর মানুষের তো আরো বেশি ক্ষমতা। আরো সহজে সে এ-সমস্ত দুর্বিপাক থেকে নিজেকে

রক্ষা করতে পারবে।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা—হিমযুগ। বিষয়টি নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। আমরা জানি, গত হিমযুগ পার হয়েছে পঁচিশ বা ত্রিশ হাজার বছর আগে এবং আগামী হিমযুগ আসবে সত্তর হাজার বছরের মধ্যে। তার আগে ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ অঞ্চলের জলবায়ু হয়ে উঠবে উষ্ণমণ্ডলীয়। উষ্ণ অঞ্চলের জীব ও উদ্ভিদ ছড়িয়ে পড়বে সর্বত্র। তারপরে হিমযুগের উঁচু উঁচু পর্বতের চুড়ো থেকে নেমে আসবে মস্ত মস্ত হিমবাহ—গ্রাস করতে চাইবে বহু যুগের চেষ্টায় গড়ে তোলা এক একটি সমৃদ্ধ নগরকে।

তবে এই বিষয়টি নিয়েও আমাদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা করবার কারণ নেই। কারণ, মানুষের হাতে এই মুহূর্তেই এমন সব হাতিয়ার আছে যা দিয়ে অনায়াসে হিমবাহের আক্রমণকে ঠেকিয়ে রাখা চলে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আগামী হাজার বা লক্ষ বছরের মধ্যে এমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই যাতে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

কিন্তু কয়েক কোটি বছর পরে ?

আমরা আলোচনা করেছি, কয়েক কোটি বছরের মধ্যে আমাদের এই হিমালয় এবং অন্য সমস্ত পর্বতমালা রেণু রেণু হয়ে ধুলোর সঙ্গে মিশে যাবে। ভূপৃষ্ঠ হয়ে উঠবে সমতল। অগভীর সমুদ্র গ্রাস করবে বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। জলবায়ুর তারতম্য থাকবে না। কিন্তু তখনো মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবার মতো কোনো কারণ ঘটবে না। সেই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানুষ অনায়াসেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

কয়েক অর্বুদ বছর পরে ?

হয়তো তখন নতুন এক বিপ্লবের সূচনা হবে ভূপৃষ্ঠে। আবার তৈরি হবে নতুন নতুন পর্বতমালা। আবার স্রোতোস্বিনী হবে নদী। আবার গভীর হবে সমুদ্র। বহু কোটি বছরের জরা কাটিয়ে আবার যৌবনোচ্ছল হবে পৃথিবী। কিন্তু যেমন অতীতে দেখা গেছে, এক-

একটি বিপ্লবের পরে শেষ হয়েছে একেক দল জীবের আধিপত্য—তেমনি স্তন্যপায়ী জীবদের আধিপত্যও কি নবজীবীয় যুগটি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে? বিবর্তনের নিজস্ব নিয়মে উচ্চতর পর্যায়ের কোনো জীবের আবির্ভাব কি সম্ভব নয়? এসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দেওয়া যাবে না। ভূপৃষ্ঠ বারে বারে সমতল হবে, বারে বারে ভঙ্গিল হবে—এসব কথা ঠিক। বিবর্তনের ধারা মানুষেই এসে শেষ কিনা—এ প্রশ্নের জবাবেও বলা চলে যে, শেষ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু বিবর্তনের ধারা এর পরে কোন্ বিশেষ রূপে প্রকাশ পাবে—এ প্রশ্নের জবাব দেবার মতো উপকরণ আমাদের হাতে নেই। ভূপৃষ্ঠের মতো জীবজগতেও ছোটখাটো পরিবর্তন হতে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি বছর সময় লাগে। যেমন, বানরের লেজ খসতে, মস্তিষ্ক বড়ো হতে এবং কিছু কিছু অবয়বগত পরিবর্তন হতে সময় লেগেছে সাত কোটি বছর। তিন কোটি বছর আগে মানুষের মতো দেখতে বিশেষ জাতীয় বানরের মস্তিষ্কের আয়তন ছিল ৩০০ ঘন সেন্টিমিটার, জাভা মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ৯৮৫ ঘন সেন্টিমিটার এবং আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন ১৩০০ থেকে ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার। অর্থাৎ মস্তিষ্কের আয়তন পাঁচ-গুণ বাড়তে সময় লেগেছে তিন কোটি বছর। সুতরাং সঙ্গতভাবেই অনুমান করা চলে, আরো বড়ো রকমের একটা পরিবর্তন হতে সময় লাগবে আরো অনেক বেশি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, মানুষ সবে তার শৈশব-কালে পৌঁছেছে। আগামী কয়েক কোটি বছরে সে নানা দিক দিয়ে আরো অনেক অনেক বড়ো হয়ে উঠবে। অর্থাৎ, মানুষের পুরো যৌবনকালটিই সামনে পড়ে আছে। তারপরে বার্ধক্য। কিন্তু সেটা এত সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার যে তা নিয়ে এখনই জল্পনা কল্পনা করা অর্থহীন।

কাজেই মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপাতত আমরা নিশ্চিন্ত। কিন্তু পৃথিবীর ভবিষ্যৎ? পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কি আমরা এতটা আশ্বস্ত হতে পারি?

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পৃথিবীর যা কিছু সম্পদ ও সমৃদ্ধি সবই সূর্যের কল্যাণে। সূর্য ছিল বলেই পৃথিবীর জন্ম, সূর্য আছে বলেই পৃথিবীর উচ্ছল যৌবন। সূর্য যদি কোনো দিন না থাকে তাহলে ভূপৃষ্ঠ থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আকাশের মেঘ, সমুদ্রের জল, নদীর প্রবাহ—কোনো কিছুই থাকবে না তখন। পৃথিবীর সেই ভয়ংকর দুর্দিনের সঙ্গে তুলনা করা চলে এমন কিছুর দৃষ্টান্ত আপাতত আমাদের এই সৌরজগতে নেই। সে এক কল্পনাতীত পরিণতি।

সুতরাং, দেখা যাক, সূর্যের দিক থেকে পৃথিবীর কোনো বিপদ ঘটতে পারে কিনা।

সূর্যের দিক থেকে বিপদ বলতে একটি মাত্র বিপদই আছে। জ্বলন্ত বস্তুপিণ্ডের স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য হয়তো নিভে যেতে পারে।

কিছুকাল আগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, সূর্যের তেজ তৈরি হয় সূর্যের বস্তুপিণ্ডের সংকোচনের ফলে। কথাটা ঠিক নয়। আধুনিক বিজ্ঞান সূর্যের তেজ তৈরি হবার রহস্যটা পুরোপুরি জেনে ফেলেছে। এক কথায় বলা চলে, সূর্যের তেজ তৈরি হয় পারমাণবিক রূপান্তরের ফলে। অনেকটা হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের মতো। খবরের কাগজের কল্যাণে হাইড্রোজেন বোমার তেজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা আমাদের সকলেরই আছে। যদি কল্পনা করা যায় যে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি হাইড্রোজেন বোমা একসঙ্গে ফাটছে তাহলে সূর্যের তেজ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হতে পারে। সূর্যের বস্তুপিণ্ডে আছে হাইড্রেজেন; সেই হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়াম-এ। চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে একটি হিলিয়াম পরমাণু তৈরি হতে পারে। কিন্তু একটি হিলিয়াম পরমাণুর ওজন চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের চেয়ে কম। হিসেব করে দেখা গেছে চার পাউণ্ড হাইড্রোজেন থেকে তিন পাউণ্ড সাড়ে-পনেরো আউন্স হিলিয়াম তৈরি হতে পারে। বাকি আধ আউন্স বস্তু কোথায় যায়? বিজ্ঞানীরা বলেন, এই হারিয়ে যাওয়া বস্তুই রূপান্তরিত হয়

তেজে। অর্থাৎ সূর্য প্রতি মুহূর্তে নিজের বস্তুর সঞ্চয়কে ক্ষয় করে করে তেজ বিকীরণ করছে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, সূর্যের তেজের ভাণ্ডার প্রায় অনন্তকাল ধরে অফুরন্ত থাকে। অন্তত আগামী কয়েক হাজার-কোটি বছরে সূর্যের তেজ কমে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা একমত।

অনেক সময় দেখা যায়, মহাকাশের কোনো নক্ষত্র আচমকা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে—যেন ভেতরকার আগুন উগরে বার করে দিতে চায়। অনেকটা শিমুল ফুল ফেটে তুলো বেরিয়ে আসার মতো। তারপরেই নিভে যায় নক্ষত্রটি। প্রদীপ নিভে যাবার আগে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে—এও তেমনি। অনেকে বলেন আমাদের সূর্যেরও এই পরিণতি হতে পারে। কিন্তু তা যদি হয়ও তো সেটা এত সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার যে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের দিক থেকে পৃথিবীর কোনো বিপদ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্র সম্পর্কে আরেকবার কিছুটা আলোচনা করে নেওয়া চলে। পৃথিবী বা মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে চন্দ্র অপরিহার্য নয়। কিন্তু চন্দ্রের আলো আর কিছু না হোক পৃথিবীর সৌন্দর্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে তোলে।

আগে বলেছি, পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হওয়ার দরুন পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ আস্তে আস্তে কমছে এবং চন্দ্র পৃথিবী থেকে একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে।

পৃথিবী আগে চার ঘণ্টায় একবার পাক খেত, এখন খাচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার এবং আজ থেকে দু-হাজার কি তিন-হাজার কোটি বছর পরে পাক খাবে এখনকার হিসেবে সাতচল্লিশ দিনে একবার।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন, প্রতি ১,২০,০০০ বছরে পৃথিবীর দিন একসেকেণ্ড হিসেবে বড়ো হচ্ছে।

আর চন্দ্র দূরে সরছে প্রতি বছরে পাঁচ ইঞ্চি হিসেবে। এই

হিসেবে দূরে সরতে সরতে চন্দ্রও দু-হাজার কি তিন-হাজার কোটি বছর পরে আরো পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে সরবে এবং তখন পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে সময় নেবে এখনকার হিসেবে সাতচল্লিশ দিন।

পৃথিবীর পাক খাওয়া এবং চন্দ্রের ঘোরা যদি একই মাপে এসে যায় তাহলে পৃথিবীর বিশেষ একটা দিকই সব সময় থেকে যায় চন্দ্রের দিকে। সেক্ষেত্রে চন্দ্রের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাঁটা হবার সম্ভাবনা থাকে না।

কিন্তু চন্দ্রের টান না থাকলেও সূর্যের টান আছে। সূর্যের টানে তখনো জোয়ার-ভাঁটা হয়ে চলে। এবং চলবে যতোদিন না পৃথিবীর পাক খাওয়ার বেগ কমতে কমতে পৃথিবীর দিনের মাপ এখনকার মাপে পুরো একবছরের সমান হয়।

কিন্তু চন্দ্রের অবস্থাটা তখন কী হবে? বিজ্ঞানীরা আঁক কষে প্রমাণ করেছেন, চন্দ্র তখন আবার কাছে সরে আসতে শুরু করবে। আমরা জানি, সূর্যের টানে পৃথিবীর সমুদ্রে যে জোয়ার-ভাঁটা ওঠে, তা চন্দ্রের টানের মতো প্রবল নয়। কাজেই চন্দ্র এগিয়ে আসবে আরো অনেক আস্তে—হয়তো প্রতি একশো বছরে আধ ইঞ্চি হিসেবে। কিন্তু যতো আস্তেই আসুক একদিন না একদিন চন্দ্র পৃথিবীর এত কাছে সরে আসবে যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টানে।

তারপর? তারপর সেই বস্তুকণাগুলো একটি বলয়ের মতো পৃথিবীকে ঘিরে পাক খেয়ে চলবে—যেমন পাক খেয়ে চলেছে শনিগ্রহের বলয়।

কিন্তু এসব অনেক পরের ব্যাপার। আপাতত কয়েক হাজার কোটি বছর চন্দ্র সম্পর্কে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, সব দিক দিয়েই পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব বেশ কিছুকালের জন্যে নিরাপদ।

তাছাড়া, মানুষের পক্ষে সবচেয়ে কৃতিত্বের কথা এই যে, অন্যান্য

জীবের মতো সে পরিবেশের ওপরে নির্ভরশীল নয়, বরং পরিবেশকে নিজের খুশিমতো বদলে দেবার ক্ষমতা রাখে। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি, ভূপৃষ্ঠ থেকে বহু জীব জাতি হিসেবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কারণ তারা পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেনি। অর্থাৎ, যতো তাড়াতাড়ি পরিবেশ বদলিয়েছে, ততো তাড়াতাড়ি সেই বদলে-যাওয়া পরিবেশকে সহ্য করার মনো অদল-বদল শরীরের মধ্যে আসেনি। কিন্তু মানুষই একমাত্র জীব যারা নিজেদের শরীরের অদল-বদল ঘটাবার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না। পরিবেশকেই এমনভাবে বদলে ফেলে যেন এখনকার শরীর নিয়েই তা সহ্য করা চলে। জীব হিসেবে অসম্ভবকে সম্ভব করেছে মানুষ। হিমালয়ে উঠেছে, মহাকাশে অভিযান শুরু করেছে, অতলান্তিক মহাসাগরে ডুব দিয়েছে, মেরু অঞ্চলে অভিযান করেছে। আর এখন চলেছে গ্রহান্তরে যাত্রার তোড়জোড়। পৃথিবীর অন্য কোনো জীবের পক্ষে এমন সব বিপরীত পরিবেশের মধ্যে এমন অনায়াসে জীবন কাটানো সম্ভব নয়। প্লাইস্টোসিন পর্বে ভূপৃষ্ঠে যখন হিমযুগ এসেছিল তখন বহু জীব বিলুপ্ত হয়েছে এই কারণে যে যতো তাড়াতাড়ি হিমযুগ এসেছে ততো তাড়াতাড়ি তাদের শরীরের চামড়ার ওপরে পুরু পশম গজিয়ে ওঠেনি। আজ যদি রাতারাতি একটা হিমযুগ শুরু হয়ে যায় তাহলে অন্য সমস্ত জীব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে—কিন্তু টিকে থাকবে একমাত্র মানুষ। কারণ, মানুষ কখনো এই সাধনা করবে না যে তার শরীরের চামড়ার ওপরে পুরু পশম গজিয়ে উঠুক। সে করবে কি, পুরু পশমের পোশাক দিয়ে শরীরের চামড়াকে ঢেকে রাখবে।

অর্থাৎ অন্যান্য জীব হাজার বা লক্ষ বছরের চেষ্টায় নিজেদের শরীরের মধ্যে যেটুকু পরিবর্তন আনতে পারে এবং আনতে পারে বলে টিকে যায়—মানুষ তার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকে না। তার এই ক্ষমতা আছে যে তার এখনকার এই শরীরটাই টিকে থাকতে পারে এমনভাবে গোটা পরিবেশকেই পালটে দেয়।

কাজেই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে মানুষই হচ্ছে একমাত্র জীব যারা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারিত করছে, বিবর্তনের অন্ধ নিয়মের কাছে খেলার পুতুল কিছুতেই নয়। মানুষের বিবর্তন মানুষের হাতের মুঠোয় এসে গেছে। এতখানি ক্ষমতা এই পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কালে কোনো জীব আয়ত্ত করতে পারেনি।

আবার এখানেই মানুষ সম্পর্কে ভয়। মানুষ তার এই বিপুল ক্ষমতার অপব্যবহার করবে, এমন সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। দৃষ্টান্তের অভাব নেই। যেমন, পারমাণবিক শক্তিকে আয়ত্ত করতে পারা মানুষের পক্ষে মস্ত একটা কৃতিত্ব; কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই পারমাণবিক শক্তির অপব্যবহার হয়; এতবেশি অপব্যবহার যে মানুষজাতির ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন অনেকে।

আরও গোড়ার কথায় যাওয়া যাক। মানুষের এই বিপুল ক্ষমতার উৎস কী? উৎস—পৃথিবীর বিপুল সম্পদকে নিজের ঠিক ঠিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারার মতো কলাকৌশল আবিষ্কার করতে পারা। মাটির ভাঁজে ভাঁজে আছে খনিজ পদার্থ—যেমন, লোহা, কয়লা, পেট্রোলিয়াম, তামা, সীসে, এবং আরো অনেক কিছু। একমাত্র মানুষ জানে, এসব খনিজ ঠিক কি-ভাবে কাজে লাগাতে হয়। শুধু কি খনিজ পদার্থ? গাছের ফল, মাটির ফসল, পশুর গায়ের লোম—সব কিছুকে সে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করতে জানে। এমন কি নদীর স্রোতকে বন্দী করে সে তৈরি করেছে মস্ত মস্ত পাওয়ার স্টেশন। জলে-স্থলে-আকাশে অবাধ তার গতি। এতকাল পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠের সমস্ত জীব প্রকৃতির দাসত্ব করে এসেছে; কিন্তু মানুষ হচ্ছে একমাত্র জীব যে প্রভুত্ব করছে প্রকৃতির ওপরে।

অনেকের মতে, মানুষের এই প্রভুত্ব খুব বেশি দিন থাকবে না। প্রকৃতি একদিন না একদিন নির্মম প্রতিশোধ নেবেই। সেদিন পৃথিবীর সমস্ত খনিজ সম্পদ যাবে ফুরিয়ে, পৃথিবীর জমিতে এত

প্রচুর ফসল হবে না যে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের খাদ্যের যোগান হতে পারে—এবং এমনি আরো সব ভয়ংকর সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছেন, মানুষের ভবিষ্যৎ এতটা ভয়াবহ নয়। খনিজ সম্পদ হয়তো ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু মানুষ সেজন্যে হা-হুতাশ করতে বসবে না। পেট্রোলিয়াম ফুরিয়ে গেলে গ্যাসোলিন দিয়ে গাড়ি চালাবে, গ্যাসোলিন না থাকে তো অন্য কোনো তেল দিয়ে। তাও যদি না থাকে তো পারমাণবিক শক্তিকে গাড়ি ঠেলবার কাজে ব্যবহার করতে বাধা দিচ্ছে কে? লোহা ফুরিয়ে যায় তো প্ল্যাস্টিক আছে, সীসে ফুরিয়ে যায় তো পুকুরের কচুরিপানাকে বা দুধের ননীকে জমাট করে এমন একটা কিছু শক্ত পদার্থ তৈরি করা যাবে যা সীসের বদলে ব্যবহার করা যায়। মানুষের উদ্ভাবনী প্রতিভা বাধাবিপত্তির সামনেই সবচেয়ে বেশি বিকশিত হয়ে ওঠে—একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে।

খাদ্য সম্পর্কে এই একই কথা। আরো বহুকাল পর্যন্ত পৃথিবীর এই সীমাবদ্ধ মাটি থেকেই সমস্ত মানুষেব খাদ্যের যোগান হওয়া সম্ভব—মানুষের সংখ্যা যতোই বাড়ুক না কেন। যেমন, আমাদের দেশে এক বিঘে জমিতে বড়ো জোর দশ-বারো মন ধান হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, উন্নত প্রণালীতে চাষ করতে পারলে এই এক বিঘে জমি থেকেই পঞ্চাশ মন ধান পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া আছে পোড়ো জমি, যেখানে কোনো চাষ হয় না। ভূপৃষ্ঠের সমস্ত, পোড়ো জমিকে অনায়াসে চাষের উপযুক্ত করে তোলা যায়—অন্তত, না করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানুষ যদি ক্ষমতার অপব্যবহার না করে, মানুষ যদি তার জীবনের ক্ষেত্রে একটা বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন গড়ে তুলতে পারে—তবে মানুষের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।
